অজীর্ণতা

প্রতিকার ও ব্যবস্থা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র মন্থন করিয়া আমাদের দেশে
প্রচলিত সমুদয় প্রকার খাদ্য ও পানীয় এবং মাদক
দ্রব্যাদির সুবিজ্ঞান সম্মত বিচার সহ
পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা সমন্বিত।

কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক এবং
হোমিওপ্যাথিক মতে "স্ত্রী-চিকিৎসা" "শিশু-চিকিৎসা"
"ওলাউঠাদি চিকিৎসা" "স্বাস্থ্য ও পীড়ার কারণ-
তত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—

ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র কর্ত্তৃক
প্রণীত।

INDIGESTION

ITS PREVENTION AND CURE.

(On an easy and Sure Method)

BY

DR. J. K. MAITRA.

Lecturer Calcutta Homœopathic College
and Author of treatiese on Women
& children diseases &. &.

মূল্য ১।০ মাত্র।

PUBLISHED FROM

MAITRA & SONS.

Homœo. Chemists. Simla. P.O.

84 Balaram Day Street.

CALCUTTA.

BY

A. K. MAITRA.

Printed by

K. C. Dav,

5. Chidam moodi's Lane,

CALCUTTA.

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। স্ত্রী-চিকিৎসা—(২য় সংস্করণ) মূল্য ২॥• টাকা।

২। শিশু-চিকিৎসা—(২য় সংস্করণ) মূল্য ১॥• টাকা।

৩। ওলাউঠা-রক্তামাশায় চিকিৎসা—বা ডাক্তার বেলের গ্রন্থ—মূল্য ১৸• আনা।

৪। স্বাস্থ্য ও পীড়ার কারণ তত্ত্ব—মূল্য ॥• টাকা।

আধুনিক তথ্যে পরিপূর্ণ উপরোক্ত হোমিওপ্যাথিক মতে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

মৈত্র এণ্ড সন্স।
সিমলা পোঃ।
সন ১৩৩৭ সাল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, ম্যানেজার
৮৪ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

এ পুস্তকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা উপক্রমণিকা মধ্যে বলা হইয়াছে ; সুতরাং এখানে পদ্ধতি অনুসারে তাহা বলিবার আবশ্যকতা আর নাই ; কিন্তু পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করি। খাদ্য (Food) বিশেষতঃ দেশীয় খাদ্য পানীয়াদির সমালোচনা সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক না থাকায়—গ্রন্থকার আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিকন্তু সাময়িক ইংরাজী ও বাংলা পত্রাদিতে এই সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত কিছু তথ্য, বিভিন্নদেশীয় মনিষীগণ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে তাহারও সমালোচনা ইহাতে পাইবেন।

যে অজীর্ণতার ভীষণ প্রকোপে আবালবৃদ্ধবনিতা আজকাল গৃহে সুখশান্তি হারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার উপর মূল লক্ষ্য রাখিয়াই—আমাদের দেশে নিত্য ব্যবহার্য্য সমুদয় খাদ্য পানীয় ও মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার বিশেষ প্রকারে ইহাতে সমালোচিত হইয়াছে, সুতরাং মূল বিষয় অনুযায়ীই ইহার নামকরণ করা গেল। ঔষধ সেবনে সাময়িক উপশম ভিন্ন এই অজীর্ণতা দূরীকরণের কোনই সহায়তা পাওয়া যায় না, কিন্তু খাদ্য পানীয়াদি বিচারে সাবধানতা অবলম্বন করিলে যে, উহা স্থায়ী ফলদান করিতে পারে, তাহা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। খাদ্য পানীয়াদির বিচার করিয়া চলিতে পারিলে যে অন্যান্য ব্যাধি ও সহজে আক্রমণ করিতে পারে না তাহারও পরিচয় ইহাতে পাইবেন।

বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রে সকল বিষয়ে উহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদে খাদ্যপদার্থের রাসায়নিক উপাদান সমূহ এবং কোন্ কোন্ উপাদান, স্বল্প বা অধিক মাত্রায় আহারে, শরীরের সম্পুষ্টি সাধন বা জীর্ণক্রিয়ার পক্ষে বাধা জন্মাইয়া থাকে তাহাই ইহাতে দেখান হইয়াছে। পরিশেষে যে আমিষ ও নিরামিষ আহার লইয়া সমুদয় জগৎ আজি ঘোর আন্দোলনে নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহারও উভয়দিকের সামঞ্জস্য বিচার করিয়া, কোন্ আহার এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে আমাদিগের পক্ষে উপযুক্ত তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা ইহাতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যবস্থা এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে নূতন প্রকার আলোচনা ইহাতে দেখিতে পাইবেন। খাদ্য, পানীয় এবং বায়ু বিষয়ে সাবধানতা লইলেই যে প্রকৃত স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এ পুস্তকে ঐ সমুদয়েরও বিশদ বর্ণনা থাকায় স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার পক্ষেও ইহা আপনাকে সাহায্য করিবে।

এখন এই পুস্তক পাঠে যদি একজন অজীর্ণরোগীও উপকার লাভ করিতে পারেন, তবেই আমাদের ৪ বৎসরের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

সূচীপত্র।

রাসায়নিক ও মেক্যানিক্যাল উপায়ে পরিপাক ক্রিয়া।

খাদ্য ও পানীয় এবং মাদকদ্রব্য সমুদয়ের বিচার।

বিবিধ।

পরম স্নেহভাজন

৺শীতাংশুশেখর কালীর প্রীতি-মধুর স্ফুটকোরক

সুকম-স্মৃতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।

খোকা ভাই !

সতের বৎসর পূর্ব্বে এক নিদাঘের প্রারম্ভে তোমার সুকুমার স্নিগ্ধ মুখখানি প্রথম দেখিয়াছিলাম; তখন তুমি নিতান্ত শিশু ছিলে, সুতরাং তোমার বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহকারে তোমার গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তোমাকে কনিষ্ঠ সহোদর ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না! শৈশবে আমি একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাইয়াছিলাম, তখন তাহার জন্য প্রাণে কিরূপ বেদনা পাইয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, কনিষ্ঠের ভালবাসা ও ভক্তি পাইবার জন্য, প্রাণে একটি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতাম! জানিনা ভগবাণ আমার সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভালবাসার আস্বাদ প্রাপ্তি, তোমাকে দিয়া মিটাইয়া দিলেন কি না! তুমি আমার উপর যেরূপ শ্রদ্ধা,ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতে, সহোদর কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের প্রতি ততদূর রাখিতে পারে কিনা সন্দেহ! তোমার সত্যনিষ্ঠতা, জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা, ধর্ম্মপ্রবণতা ও গুরুজনে ভক্তির কথা আদর্শস্থানীয় হইলেও এখানে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক দেখি না। কিন্তু তোমার জীবন ও দেহ পরিবর্ত্তনে আমার যে শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহাই আজ বলিব।

"মানুষ জড়দেহ ত্যাগ করিয়া কোথায় যায়?" এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের বহু মীমাংসা থাকা সত্ত্বেও, সাধারণের ন্যায়

আমিও এতদিন উহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারি নাই! কিন্তু পরমারাধ্যা জননীসমা স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনী ৺ সোহাগী দেবী এবং পরম স্নেহভাজন সারল্যপ্রতিম সহোদরোপম ৺ শীতাংশুশেখর কালী—তোমাদের উভয়ের, স্বল্পদিবস ব্যবধানে, নশ্বর জড়দেহ ত্যাগ দেখিয়া প্রকৃতই বুঝিলাম যে, জীবাত্মা দেহ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া, কোন এক অজ্ঞাত দেশে—যথা-কার সংবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ এ ধরায় আনিয়া দিতে পারে নাই—বেড়াইতে যায় মাত্র! তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না!! কারণ যখনই তোমাদের আলেখ্য-চিত্র প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই মনে হয় যেন তোমরা কোথায়—দূরে—বহুদূরে ভ্রমণে গিয়াছ! তোমাদের এ ভ্রমণ, আমাদের স্থায় পার্থিব জনের ভ্রমণ সহ তুলনীয় হয় না, যে হেতু এ পৃথিবীর ভ্রমণে ফিরিয়া আসিবার একটা আশা—নিজের ও আত্মীয় স্বজনের—মনে সদা জাগরূক থাকে; কিন্তু জড়দেহ পরিত্যাগের পর উভয় পক্ষ হইতেই উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়! এই অভিনব শিক্ষালাভ করিয়া আমি প্রাণে যে কি শান্তি পাইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। যখনই তোমাদের কথা মনে হয়, তখনই একবার স্থিরনেত্রে আলেখ্যচিত্র দেখিলেই, কেমন আপনা হইতে শান্তি আসিয়া প্রাণ শীতল করিয়া দেয়! তোমাদেরই অদৃশ্যশক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া এই প্রাণ-শীতলকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে কিনা জানিনা! তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, সন্তপ্তহৃদয়ী যদি কেহ আত্মীয় স্বজনের দেহান্তর ধারণ ভাবটী, আমার স্থায় এইরূপে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অনায়াসে প্রাণে শান্তি পাইতে পারিবেন।

ভাই! সংসারের মায়া কাটাইয়া মহাপ্রয়াণ করিবার সময়, তুমি আমাদের সকলের নিকট হইতেই বিদায় লইয়া গিয়াছ! কিন্তু আমরা—সংসারের দগ্ধজীব—প্রতিনিয়ত জ্বালাযন্ত্রণা ভোগে নিযুক্ত থাকায়, আমাদেরই ন্যায় রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট তোমাকে উহা এড়াইতে দেখিয়া, স্বার্থবশে তোমার মুক্তির পথে বাধা দিবার জন্য, কাঁদিতে ব্যস্ত থাকায় তখন তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে পারি নাই! তাই মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদচ্ছলে তোমার স্নেহময় নামের মধুর স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম। ইহার কিয়দংশ তোমার জীবদ্দশাতেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু হায়! তখন ভাবি নাই যে, এই ভাবে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে!! আমার সম্পর্কীয় সমুদয় জিনিষই জীবিতকালে তুমি সুনয়নে দেখিতে! তুমি এখন সুদূর দেবলোকে থাকিলেও যে,ইহা পূর্ব্বের ন্যায় তোমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে তাহা আমি জানি, তাই অন্য কাহাকেও না দিয়া তোমার উদ্দেশেই ইহা প্রদান করিলাম।

তোমার আত্মার চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র।

অজীর্ণতা

প্রতিকার ও ব্যবস্থা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা ও উদ্দেশ্য।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য পানীয়াদি অবস্থান্তরিত হইয়া অবচুষণ (absorption) এবং সমীকরণের (assimilation) উপযুক্ত হয় এবং যাহার দ্বারা আমাদের শরীরের পরিপোষণ কার্য্য সাধিত হয়, তাহাকে আমরা পরিপাক বা জীর্ণক্রিয়া কহি; এই কার্য্য সাধনের জন্যই ক্ষুধা—খাদ্য এবং পানীয়ের আকাঙ্ক্ষা - আমরা অনুভব করিয়া থাকি।

পরিপাক বা জীর্ণক্রিয়া

পরিপাক কার্য্যের ব্যতিক্রমই অপরিপাক বা অজীর্ণতা;

পরিমাণে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকি, একারণ সম্যকরূপে ইহার লক্ষণাদি আমাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহা আমাদের নিকট নানাভাবে উপস্থিত হইতে পারে এবং ইহা হইতেই নানা পীড়া আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বেদনা, পেট ফাঁপা, ক্ষুধামান্দ্য মুখে মন্দাস্বাদ, দুর্গন্ধী উদ্গার উঠা, মুখদিয়া জল উঠা (সময়ে সময়ে প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেই), ক্লেদযুক্ত জিহ্বা—কখন থল্ থলে অথবা কাটা বা শুষ্ক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি অনুভূত হয়; অনেকে আবার সাধারণ অলসতা, হতাশভাব, পৃষ্ঠে বেদনা, নিদ্রাশূন্যতা, বদমেজাজভাব অথবা চিন্তা শক্তিবিহীনতা মাত্র এবং (সাংঘাতিক স্থলে) শীর্ণতাও অনুভব করিয়া থাকেন।

অজীর্ণতার লক্ষণ

এই অজীর্ণতা—যাহাকে আজকাল আমরা সকলে বিলাতী কথায় ডিস্পেপ্সিয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকি—হইতে যে কতপ্রকার রোগের উৎপত্তি হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা আক্রান্ত রোগী যে কতপ্রকার অসুখের কথাই বলিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। মোটের উপর এই জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহাই সর্ব্বরোগের আকর। আমরা এখানে ইহার লক্ষণাদি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। মোটা মুটি যাহা সদা দৃষ্ট হয় তাহা সংক্ষেপে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাবতীয় শারীরিক বেদনা ও অসুখের সহিতই, মুখ্য বা গৌণভাবে, পাকস্থলীর গোলযোগের সম্বন্ধ ঘনিষ্টভাবে বর্ত্তমান,

থাকে। অবশ্য সকলের নিকট ইহা সমীচীন বলিয়া হয়ত বোধ হইবেনা, কিন্তু এটি যে ধ্রুবসত্য তাহা জানিয়া রাখিবে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে (we must eat to live and not live to eat) অর্থাৎ আমরা আহার করিব জীবন ধারণের জন্য কিন্তু জীবনধারণ করিব না শুদ্ধ খাইবার জন্য। শরীরের পোষণের জন্য যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই আমরা আহার করিব মাত্র এবং যাহাতে তাহা সমপ্রকৃতিভবনের (assimilation, পূর্ব্বেই জীর্ণ হইয়া যায় এবং এই সমপ্রকৃতিভবন কার্য্যটি, শরীরের স্বাস্থ্য এবং পরিপোষণের পক্ষে, সুসম্পন্ন ভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য সবিশেষ যত্নবান হইতে হইবে; নতুবা শুধু আহার করিয়া পাকস্থলী পূর্ণ করিলেই চলিবেনা। পরিপাক ক্রিয়া যদি কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ ভাবেও হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমরা সুস্থতার লক্ষণ বলিতে পারিব না।

এই পুস্তক কোন প্রকার "পেটেণ্ট ঔষধের" এই পুস্তকের —যাহা আজকাল বাজারে সংখ্যাতিরিক্তরূপে উদ্দেশ্য শনৈঃ শনৈঃ পরিচালিত হইতেছে—গুণ-গরিমা বিস্তার জন্য অথবা কোন খেয়ালের বশে লিখিত হইতেছে না; কিম্বা ইহা দ্বারা যে চিকিৎসকের অভাব কোন প্রকারে পূরণ হইতে পারিবে তাহাও আমরা বলি না। তবে এই অজ্ঞানতা দূরীকরণ জন্য বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ সময় সময়, যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং সর্ব্ব সাধারণের মানস পটে যাহাতে সদা অঙ্কিত থাকিতে পারে, তাহার জন্যই এই প্রয়াস। এই পুস্তক পাঠে তুমি তোমার নিজের অসুখ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারিবে এবং কেন যে, ইহা বা,

উহা করিতে চিকিৎসক ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাহার উত্তর পাইবে। ইহা তোমাকে সুপথে চালিত করিয়া ঔষধাদির সদ্ব্যবহার করিতে এবং সর্ব্বোপরি, কোন প্রকারে পাকস্থলী, পীড়ার হাত হইতে একবার নিস্তার পাইলে আর যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় তৎবিষয়ে যত্নবান্ হইতে শিক্ষা দিবে।

আমরা যে সমুদয় পীড়া বহিদৃষ্টিতে দেখিতে পাই—যেমন কোনপ্রকার চর্ম্মরোগ, বাতব্যাধী ইত্যাদি—তাহারই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত হই; কিন্তু পাকস্থলীটি চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে থাকায় উহার গোলযোগের বিষয়ে আমরা প্রথমে কোনই প্রতিকার করিতে চেষ্টা আমাদেরই হাতে করি না। কিন্তু দেহস্থ সকল যন্ত্রের অপেক্ষা প্রতিকার ইহার কার্য্য প্রণালীতেই আমরা, একটু যত্ন করিলেই, বিশেষ সাহায্য করিয়া সুফল উৎপাদন করাইতে পারি; কারণ এই পাকস্থলীতে জীর্ণ হইবার জন্য, যে প্রকার এবং পরিমাণ খাদ্য উহাতে নিপতিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ আমাদিগেরই হস্তে নিহিত। ঐ দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে জীর্ণ না হইলেই রোগের উৎপত্তি হয়, সুতরাং যাবতীয় পাকাশয়িক গোলযোগাদির প্রতিকার যে আমাদের হাতে তাহা আর বলিতে হইবে কি?

তোমার অজীর্ণ রোগ আছে—তাহার প্রতিকারার্থে তুমি পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট যাইলে তিনি ঔষধ ও ব্যবস্থা বিধান করিলেন; তুমি ঔষধ ব্যবহার করিলে বটে, কিন্তু যে উপদেশাদি পালন করিতে বলিয়াছিলেন, হয় তাহা তাচ্ছিল্য করিলে অথবা ভুলিয়া গেলে, কিংবা হয়ত তাহার সমুদয়ই

তোমার নিকট গোলমাল হইয়া গেল। ঔষধের জোরে তুমি কতক শান্তি পাইলে বটে, কিন্তু অজীর্ণতা বা ডিস্পেপ্সিয়া পুনরায় দেখা দিল। উপরি উপরি কয়েকবার এইরূপ হইতে হইতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, চিকিৎসকের আদেশাদি সম্পূর্ণ পালন না করিলে, আর শুধু ঔষধে পাকাশয়িক গোলযোগ নিবৃত্ত হইবে না! চিকিৎসকের আদেশগত উপদেশাদি সঠিক ভাবে পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা তোমার রোগ সারিবে না; অথচ চিকিৎসকের উপদেশাদি নীরস হওয়ায় তোমার তাহা মনেও থাকে না। এই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য জন্যই আমরা পুস্তকাকারে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ রাখিলাম। চিকিৎসক শুধুই উপদেশ দিবেন, কিন্তু তাহার (Reason) কোন কারণ দেখাইবেন না; এখানে উপদেশের সহ বিস্তারিত ভাবে কারণগুলি Reason দেওয়া হইল। ইহা পাঠ করিয়া, ঠিক নিয়মে চলিতে আরম্ভ করিয়া সেই সঙ্গে ঔষধ সেবন করিতে থাক, দেখিবে অচিরমধ্যে নিজে কত অধিক সুস্থতা বোধ করিবে এবং সেই সঙ্গে আপনার চিকিৎসক ও ঔষধ সকলের (তৎ প্রদত্ত) রোগ সারাইবার অক্ষমতা সম্বন্ধে নিজে সন্দেহচ্যুত হইবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—————•:*:•—————

পাকস্থলী ও পরিপাক প্রণালী।

জীর্ণক্রিয়া অংশত রাসায়নিক এবং অংশত mechanical উপায়ে নিহিত। আমাদিগের জীর্ণ প্রণালী শরীরের তিনটি পৃথক্ বিভাগে এই mechanical উপায়ের যন্ত্র ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রাসায়নিক দ্রব্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে। বিভাগ তিনটি, যথা, (১) মুখগহ্বর (২) পাকস্থলী, (৩) অন্ত্রপথ। অজীর্ণরোগ এই কয় বিভাগেরই একক বা তৎ সমষ্টির কোন প্রকার দোষ হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি একটি মাত্র বিভাগের গোলযোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা মেক্যানিক্যাল অথবা রাসায়নিক গোলযোগের (defect) একক অথবা উভয়তঃ দোষেও হইতে পারে।

আমরা প্রত্যেক বিভাগই পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়া যাইব। প্রথমতঃ মুখগহ্বর ধরা যাউক :—মুখগহ্বর- মুখগহ্বরের কার্য্য হইতেছে যে, আমরা যে দ্রব্য ভক্ষণ করি তাহা খণ্ড বিখণ্ডিত ও লালাস্রাবের সহ সংমিশ্রণ করা। এই কার্য্যকে চর্ব্বণ-ক্রিয়া বলে এবং ইহাই mechanical উপায়। চর্ব্বিত দ্রব্যের উপর লালাস্রাবের যে রাসায়নিক কার্য্য সংসাধিত হয়, উহাই মুখগহ্বরের রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া জানিবে।

খাদ্য দ্রব্য আমরা যে রন্ধনাদি করিয়া আহার করি, তাহা শুষ্ক

রসনা ও চক্ষুর তৃপ্তিকর হইবে বলিয়া নহে; উহা দ্বারা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া থাকে জানিবে।

রন্ধনের উদ্দেশ্য

রন্ধনের দ্বারা ঐ দ্রব্য সকল সাধারণতঃ পরিপাকের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া থাকে। কেমন করিয়া যে রন্ধন আমাদের হজম হওয়ার পক্ষে সুবিধা করিয়া দেয়, তাহা একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক রন্ধন দ্বারা খাদ্য দ্রব্য নরম হইয়া, চর্ব্বণের [illegible] বেশ সহায়তা ক[illegible] ইহা মেক্যানিক্যাল উ[illegible]); আরও মৎস্য, মাংস, শাক, সবজী প্রভৃতির তন্তু সকল (fibres) রন্ধনে শিথিলিত হইয়া যায়। সুতরাং আমাদিগের শরীর নিঃসৃত পরিপাককারক রস সমুদয়—মুখের লালাস্রাব, পাকাশয়ের গ্যাষ্ট্রিক্ রস, পিত্ত প্রভৃতি—যাহাতে অন্ত্রপথে (intestines) উহাদের মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং পরে ভক্ষিত পদার্থের উপর নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক কার্য্য সাধিত করিতে পারে, তাহাও রন্ধনে সাধিত হইয়া থাকে (ইহাই রাসায়নিক প্রক্রিয়া)। ইহাত গেল রন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য; এখন দেখা যাউক—গৌণভাবে ইহার কোন কার্য্য আছে কিনা? রন্ধনে দ্রব্যাদি সুগন্ধি, সুস্বাদু এবং নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক হওয়ায় আহারের ইচ্ছা—ক্ষুধা—উদ্রিক্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিপাককারক গণ্ডসকল (Glands) প্রচুর রস নিঃস্রবে উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইরূপেই ঐ সমুদয় রসাদি পর্য্যাপ্ত ক্ষরণ হওয়াতে ভুক্ত দ্রব্যের উপর উত্তমরূপে রাসায়নিক কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হয়।

রন্ধন করা দ্রব্য যে, কাঁচা দ্রব্যাদি অপেক্ষা সহজে হজম হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিতে পারি-

লেন। তবে রন্ধনটা কিরূপের হওয়া চাই তাহাও জানা আবশ্যক—রন্ধনে দ্রব্যাদি বেশ সুসিদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন; শুধু পোড়াইয়া কঠিন করিয়া লইলে হইবেনা, সুসিদ্ধ হওয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্যকে অপরিপাচ্য করা হয় চাই। জানিবে; আবার তৈল বা ঘৃত (চর্ব্বি) দ্বারা অর্দ্ধপক (আধসিদ্ধ) করিলেও চলিবেনা; ইহাতে বিবমিষা, ঘৃণা এবং ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হইতে পারে। যদি উত্তমরূপে পরিপাক করাইতে চাহ, বা হজম শক্তি বজায় রাখিতে চাহ, তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্যাদি যাহাতে উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হয়, তাহার উপায় নিশ্চয়ই করিবে।

আমাদিগের খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—রন্ধন প্রণালী সুবিজ্ঞান সম্মত এবং আমরা উহা সুসিদ্ধ না করিয়া ভোজনই করি না, সুতরাং এসম্বন্ধে আমাদের অধিক না বলিলেও চলে; কিন্তু সময় প্রভাবে আজকাল আমরাও সমুদয় বিলাতী (পাশ্চাত্য!) প্রথা অনুকরণ করিতে যাইয়া, আমাদিগের নিজস্ব চিরন্তন রন্ধন প্রথাও পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অল্প সিদ্ধ বা অসিদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন আমাদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কোন মতেই উপযোগী নহে, তাহা আমরা আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি! সুতরাং বিলাতী হোটেলের রন্ধন করা উক্ত দ্রব্যাদিও অম্লানবদনে আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদিগের দেশের কাহাকেও বোধ হয় একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে, আমাদিগের রন্ধন প্রক্রিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শতগুণে উত্তম!! কিন্তু ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।

মুখগহ্বরের Mechanical দোষ অর্থাৎ চর্ব্বণ ক্রিয়া পর্য্যাপ্তরূপে না হওয়ায়, অজীর্ণতা জন্মিতে পারে; কারণ গলনালী

মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হওয়ার জন্য, ভুক্ত দ্রব্যাদি বিশেষভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা হওয়া প্রয়োজন এবং টুক্‌রা টুক্‌রা করিবার জন্য দন্তের সাহায্য নিতান্তই প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মুখ-গহ্বর, পাকাশয় প্রভৃতির নিঃসৃত রস ভক্ষিত দ্রব্যের প্রতি অণু পরমাণুর সহ সুসম্মিশ্রিত হইলে তবে পরিপাক কার্য্য উত্তম ভাবে হইতে পারে। সকলেই জানেন যে মিছরী অপেক্ষা চিনি অল্প সময়ের মধ্যে জলে মিশ্রিত হইয়া থাকে; সুতরাং চর্ব্বণ দ্বারা দ্রব্যাদি যত টুক্‌রা হইবে তত সত্বর যে উহা পূর্ব্বোক্ত নিঃসৃত রসাদি সহ মিশিয়া যাইবে, ইহা বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে চর্ব্বণ ক্রিয়া যত পর্য্যাপ্তরূপে হইতে থাকিবে, তোমার পরিপাক ক্রিয়াও তত উত্তম ভাবে হইবে; এখনও কি বলিতে হইবে যে চর্ব্বণ ক্রিয়া যতদূর সম্ভব পর্য্যাপ্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়? যদি তোমার দন্ত সকল উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন না হয়, অথবা অন্য কোন দন্তপীড়া থাকে, যে জন্য চর্ব্বণে বাধা জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে কোন দন্তচিকিৎসকের উপদেশমত উহার সবিশেষ প্রতিকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে দন্তের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লইয়া, আহারের সময় তাড়াতাড়ি করিয়া খাদ্য বস্তু গিলিয়া না খাইয়া, জগদীশ্বর যে জন্য দন্ত দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করিবে; অর্থাৎ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে খাদ্য বস্তু চর্ব্বণ করিবে। কারণ তাহা হইলেই উহা খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া লালাস্রাবের সহিত বেশ মিশিয়া যাইবে এবং ভক্ষিত বস্তুর উপর নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে।

একজন কৃতবিদ্য পাশ্চাত্য মনিষী চিকিৎসক তাঁহার অজীর্ণ রোগীগণকে আদেশ করিতেন যে, "কতবার চর্ব্বণ কর তাহা গণিয়া রাখিবে।" স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তকেও আমরা উহার অনুমোদন দেখিতে পাই। গণনা করিয়া খাইতে বলার অর্থ আর কিছুই নহে, যত অধিক সময় চর্ব্বণে নিয়োগ করিতে পারা যায়, তাহাই আদেশ করা মাত্র জানিবে।

"বার্দ্ধক্যে অথবা যখন কৃত্রিম দন্ত সাহায্যে চর্ব্বণ করিতে অসমর্থ হইবে, তখন ভোজন পদার্থ কোন যন্ত্র সাহায্যে উত্তমরূপে ছেঁচিয়া লইয়া, তবে আহার করা কর্ত্তব্য। অনেকে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, পতিতদন্তক বৃদ্ধগণ অথবা চর্ব্বণাশক্ত লোকেরা তাম্বুলাদি ছেঁচিয়া লইয়া আহার করেন। এ প্রথা অতি উত্তম জানিবে, তবে উহা শুধু তাম্বুলাদিতেই নিহিত না রাখিয়া, সকল কঠিন দ্রব্যের জন্যই ঐ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বৃদ্ধবয়সে দন্তের মাড়ী অন্য সময়াপেক্ষা কঠিনতর হয় বটে, কিন্তু দন্ত দ্বারা যে কার্য্য পূর্ব্বে সাধিত হইত তাহা সম্যকরূপে সাধিতে সমর্থ হয় না। এই জন্যই "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম বুঝা যায় না" প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে জানিবে।

ভক্ষিত পদার্থ মুখপথে চালিত হইবার সময় উষ্ণ বরফ ও হইয়া উঠে; এ সময় বরফ অথবা বরফবৎ শীতল বরফ জল কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য, (যাহা পাকাশয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, মুখ পথে উষ্ণ হইবার পর্য্যাপ্ত সুযোগ পাইবে না) সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। এ প্রকার শীতল দ্রব্য খাইলে পাকাশয়ে ঠাণ্ডা লাগিবে, আর উহাকে নিজ কর্ত্তব্য সাধনে বাধাও দিয়া অজীর্ণতা উৎপাদন করিবে। এই কারণে আহার কালে

কোন প্রকার অধিক উষ্ণ পানীয় বা খাদ্য দ্রব্যও সেবন করা উচিৎ নহে। যদি তুমি সদা স্মরণ রাখিতে পার যে, অত্যধিক শীতল বা উষ্ণ পানীয় অথবা খাদ্যদ্রব্য খাওয়া উচিৎ নহে এবং আহারের সময়, অযথা ব্যস্ততা প্রদর্শন না করিয়া, ধীরে ধীরে ও পর্য্যাপ্তরূপে চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য (কারণ তাহাতে খাদ্য দ্রব্যের উপর লালাস্রাব সুনিয়োজিত কার্য্য করিতে সামর্থ্য ও সুযোগ পায়), তাহা হইলেই জানিবে যে মুখগহ্বরের কার্য্য সম্পাদনে, তোমার যাহা অধিকার তাহা উপযুক্ত রূপেই করা হইল। মুখ নিঃসৃত লালারসের পরিমাণ বা Quality গুণ সম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে, তাহার সংশোধন জন্য যে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার চিকিৎসক করিবেন। কিন্তু যদি চিকিৎসকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে শুদ্ধ ঔষধে চিকিৎসক তোমার রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হইবেন না! নিজের চেষ্টা নিজে না করিলে অন্যের চেষ্টায় তাহা ভালরূপে সাধিত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখিবে।

পরিপাক সম্বন্ধে মুখ গহ্বরের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বর্ণনা করার পর, এইবার আমরা (পূর্ব্ব বিভাগ মত) দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে, অর্থাৎ পাকাশয়ে উহার কার্য্যাকার্য্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পাকাশয়ে পরিপাক ক্রিয়া

মুখগহ্বরে ভক্ষিত পদার্থ পর্য্যাপ্তরূপে চর্ব্বিত এবং লালারসে মিশ্রিত হইয়া, জিহ্বা দ্বারা গলদেশের পশ্চাৎভাগে নীত হয়; এই স্থানে উহা গল-গহ্বরের মুখের (Gullet) মাংসপেশী দ্বারা আঁকড়াইয়া

ধৃত, গিলিত এবং অন্ননলী (œsofagus.) মধ্যে চালিত হয়। এই অন্ননলীর সমুদয় গাত্র মাংসপেশী দ্বারা গঠিত থাকায়, উহা ভক্ষিত দ্রব্যকে এমত ভাবে চালনা করিতে থাকে যে, উহা ঐ নলপথে (২৬ ফিট), সহজেই ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। খাদ্য বস্তর এই ভ্রমণ পথের প্রথম বিরাম স্থানটি আমাদের পাকাশয়। এই স্থানে আসিতে হইলে অন্ননলী ও পাকযন্ত্রের সন্ধিস্থলস্থ (lock-gate) রুদ্ধ-কবাট যুক্ত রন্ধ্রপথ পার হইয়া উহাকে আসিতে হয়। পাকাশয়ে পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে, ভক্ষিত পদার্থ এখন ক্ষুদান্ত্রে (Small intestines) নীত হয়, পরে বৃহদন্ত্রে আসিয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় এবং যখন পাকাশয় শূন্য (empty) থাকে, তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত রন্ধ্রপথ—অন্ননলী ও পাকাশয়ের সন্ধিস্থল—অন্ননলী হইতে পাকাশয়ে ভক্ষিত পদার্থ প্রবিষ্ট হইলেই তৎক্ষণাৎ আপনা হইতে (automatically) রুদ্ধ হইয়া যায়; আবার কোন পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে উহা আপনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া যায়।

এই ত গেল ভগবানের ইঞ্জিনিয়ারী কার্য্যের একটা নিদর্শন মাত্র; এখন দেখা যাউক পাকাশয়ে ভক্ষিত পদার্থ উপনীত হইলে উহাতে আবার meckanical process কি উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে; সুস্থাবস্থায় ভক্ষিত পাকাশয়ের পদার্থ পাকাশয়ে আসিলেই উহার রক্তাধার মেক্যানিকাল সকল বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠে। কাজে উপায় কাজেই ঐ সময়ে পাকাশয়ে রক্ত অধিক সঞ্চারিত হইতে থাকে। পাকাশয়ের গাত্রে যে সমুদয় গ্ল্যাণ্ড আছে, উহা হইতে সেই সময় রস (Gastric juice)নিঃসৃত হইয়া পাকাশয়ক

খাদ্য পদার্থে মিশ্রিত হয় এবং উহা জীর্ণ করিতে চেষ্টা করে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ চেষ্টা কি প্রকারে সাধিত হইয়া উঠে? পাকাশয়ের গাত্র সমুদয়ই বেশীর ভাগ, পেশী দ্বারা গঠিত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; খাদ্য দ্রব্য পাকাশয়ে যে মাত্র উপস্থিত হয়, তখনই উহা সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং অনবরত ঐ পেশী সকলের আকুঞ্চন জনিত একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়া ভক্ষিত পদার্থকে মন্থন করিতে থাকে। মাখন প্রস্তুত জন্য নবনীত যে প্রকারে মথিত হইয়া থাকে, তাহা যদি কেহ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে যে প্রকারে ঐ ভক্ষিত পদার্থ পাকাশয়ে মথিত হইয়া যায় তাহার কতকটা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে। পাকাশয়ের এই আলোড়ন, পরিপাক সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যকীয় জানিবে; ইহা দ্বারাই খাদ্য বস্তু, গ্যাষ্ট্রিক গণ্ড সম্ভূত রসাদি সহ প্রকৃষ্টরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং ঐ রসাদিও খাদ্য বস্তুর অণু পরমাণুর উপর নিজ রাসায়নিক কার্য্য সম্পাদনে অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই মন্থন দ্বারা খাদ্য বস্তু আরও (pulpy) তরল দলা যুক্ত হইয়া পড়ে এবং অন্ননলীপথে পরিভ্রমণ করিবার সময়, জীর্ণক্রিয়া যতই অগ্রগামী হইতে থাকে, পাকাশয়ের আলোড়ন পাইয়া ভক্ষিত পদার্থ ততই পাকাশয় হইতে অন্ত্রপথে চালিত হইতে থাকে, এবং অন্যান্য পরিপাক সম্বন্ধীয় রসাদি সহ সুভাবে মিশ্রিত হইবার উপযুক্ত হয়। পাকাশয় অভ্যন্তরে এই মন্থন ক্রিয়াই —পাকাশয়ের পর্য্যাপ্ত আকুঞ্চন—উহার পরিপাক সংক্রান্ত মেক্যানিকাল পন্থা এবং খাদ্য বস্তুর উপরে পূর্ব্বোক্ত রসাদির

পাকযন্ত্রের পরিপাক প্রক্রিয়া বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সুস্থাবস্থায় উহার কার্য্য নিয়মিতরূপেই চলিয়া থাকে, সুতরাং অজীর্ণতা অর্থাৎ পাকাশয়ের অসুস্থতা দেখা দিলেই অনুমান করিতে হইবে যে, উহা পাকাশয়েরই মেক্যানিকাল বা রাসায়নিক অথবা উভয়েরই একত্র সংযোগে সমুদ্ভূত হইয়াছে। দোষী ব্যক্তি নিজদোষ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে, অনুতাপজনিত যে প্রকার অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ পাকাশয়ও নিজদোষ বুঝিতে পারিয়া যে অনুতাপাগ্নি সহ্য করিয়া থাকে, তাহাই অজীর্ণতারূপে আমাদের অনুভূত হয় এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, এই পীড়া মুখগহ্বরের দোষজনিতও উদ্ভূত হইতে পারে এবং পরে আরও দেখাইব যে, অন্ত্রপথীয় দোষ হইতেও উহা দেখা যাইতে পারে ; সুতরাং একমাত্র পাকাশয়কেই ইহার জন্য অনুযোগ দেওয়া বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য হয় না।

পাকাশয়ে অজীর্ণতা

প্রথমতঃ এখন দেখা যাউক যে, পাকাশয়ের মেক্যানিক্যাল দোষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্থন প্রক্রিয়া কি প্রকারে দোষান্বিত হইতে পারে এবং সামান্য সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা কি পরিমাণে তাহার প্রতিকার সাধিত হইতে পারে। পাকাশয়ের মেক্যানিক্যাল দোষের অর্থে আমরা এই বুঝি যে, উহার পেশী সকল খাদ্যবস্তুকে সম্যক প্রকারে আঁকড়াইয়া ধরা, মন্থন এবং বহিঃনিসারণ কার্য্য সম্পন্ন করে না। এখন কথা এই যে কেন উহা করে না ? পাকাশয়ের পেশী সমুদয় দুর্ব্বল এবং

থল্‌থলে ও আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকরণের উপযুক্ত শক্তিহীন হওয়ায় ইহা ঘটিতে পারে। পাকাশয়টি আমাদের শরীরের একটি অংশবিশেষ; যদি কোন কারণে সমুদয় শরীরটি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অংশবিশেষও যে উহাতে আক্রান্ত হইবে ইহা নিশ্চয়। এখন যদি মনে করা যায় যে শরীরের সমুদয় পেশী দুর্ব্বল এবং থল্‌থলে হইয়াছে তাহা হইলে পাকাশয়ের পেশীগুলিও যে সেইরূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? পেশী সমুদয়ের এই দুর্ব্বলাবস্থা অনেক সময় মুক্ত বাতাস ও ব্যায়ামের অভাব দ্বারা আনীত হইয়া থাকে; কিন্তু দুএকটি কঠিন পীড়ার স্থল ব্যতিরেকে, ইহা কখনই স্বল্প দিবস অথবা সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত হয় না। ঐ ক্ষয়প্রক্রিয়া বহুদিবস পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ অগ্রগামী হইতে থাকে। আমাদের জীবনীশক্তি যতক্ষণ সামর্থ্য উহাকে উপেক্ষা করিয়া যায়, কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না; কাজেই তখন আমরা বাহ্যতঃ অসুস্থ হইয়া পড়ি। রোগের বিকাশ হইতেও যেমন দীর্ঘ সময় লাগিতে দেখা যায়, উহার উপশম বা নিরাময় হইতেও যে সেই পরিমাণে সময় লাগিবে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। অনেকে এই বিষয় সম্যক অবগত না থাকায় রোগারোগ্য সম্বন্ধে অযথা হতাশ হইয়া পড়েন, এবং চিকিৎসকের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন। এই কথা জ্ঞাত থাকিলে সম্ভবতঃ তাঁহারা আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরিপাক ক্রিয়া, উত্তমরূপে হইবার জন্য উন্মুক্ত সুবাতাস আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। **উন্মুক্ত বায়ুর**

প্রয়োজনীয়। অনুভবোপযুক্ত সামান্য পরিমাণ অক্‌সিজেন (oxygen) যদি আমরা না পাই, তাহা হইলে অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারি না। উন্মুক্ত সুবাতাস বলিতে আমরা এই বুঝি যে, যাহাতে অধিক পরিমাণ অক্‌সিজেন আছে, এবং যে বাতাসে উহার পরিমাণ স্বল্প থাকিয়া কার্ব্বানক আসিড্‌ গ্যাসের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহাকেই আমরা মন্দ অথবা দূষিত বাতাস বলিয়া থাকি।

সর্ব্বাধিক অক্‌সিজেন না পাইলে আমরা অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারিনা, কিন্তু না খাইয়াও আমরা কয়েক দিবস কাটাইয়া দিতে পারি। মনে রাখিবে যে, সমুদয় দিবস ও রাত্রি তুমি স্বল্পাধিক পরিমাণে দূষিত অথবা শোধিত বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করিতেছ এবং এই যে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দিবারাত্র অব্যাহতভাবে চলিতেছে, উহা তোমার সুস্থতার (সুতরাং জীর্ণক্রিয়ার) উপরও বিশেষ প্রভাবযুক্ত হইয়া আছে। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন অথবা অন্যান্য সময়, তুমি সুবাতাস সেবন করিয়া থাক বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না; তোমার শয়ন কক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক লোকেই দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে,মোটের উপর অধিকাংশ সময় শয়ন কক্ষে কাটাইয়া থাকে; একারণ প্রত্যেকের শয়ন কক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা উৎ-

বায়ু চলাচল সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্বিপরীতে লোকে প্রায়ই মনে করিয়া থাকে যে, যেমন তেমন—আলোক ও বায়ু চলাচল থাক বা না থাক—ছোট বা বড় ঘর হউক না কেন শয়নের কার্য্য তাহাতেই চলিতে পারে; কিন্তু বৈঠকখানা বা

অভ্যর্থনা গৃহ উৎকৃষ্টতম হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ অভ্যাগত সকলে যেন তাহা দেখিয়া সুখ্যাতি করিতে পারে! বাহ্য পারিপাট্য দেখাইয়া সর্ব্ব সাধারণের প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের এতই অধিক!! আমাদিগের মনে হয় যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই জীবনের এক তৃতীয়াংশ কাল শয়ন কক্ষেই যাপন করিয়া থাকেন; সুতরাং দেখা উচিৎ যে শয়ন গৃহ যেন বেশ বড় উচ্চ, উন্মুক্ত বায়ু চলাচল পূর্ণ, দক্ষিণ দিক খোলা এবং অতিরিক্ত মোটা পর্দ্দাদি দ্বারা আবরিত না থাকে। শয়ন গৃহে অপ্রয়োজনীয় কোন প্রকার বড় বড় আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি রাখাও উচিৎ নহে; যদি খাট বা পালঙ্ক রাখা প্রয়োজন হয়, তবে একখানি বড় না রাখিয়া, দুই শয়ন কক্ষ খানি ছোট ছোট রাখা কর্ত্তব্য এবং তাহাই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী জানিবে। গৃহে বায়ু চলাচল সুভাবে চলিবার বন্দোবস্ত করিয়া সুখে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য; আমাদিগের দেশে গৃহস্থেরা প্রায়ই সকলে অথবা অনেকে একত্রে একই গৃহে শয়ন করিয়া থাকেন; এ প্রথা ভাল নহে—অবশ্য যাহার সামর্থ্য আছে তাহাদের পক্ষে। সহরে বাস করিতে হইলেই, স্থানাভাব বশতঃ ঐরূপে জীবনযাপন করিতে হয়, একারণ সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামের কোন শান্ত শীতল শ্যামল ছায়ায় যাইয়া অপারগগনের থাকা উচিত। শয়ন গৃহের সমুদয় জানালাই উন্মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য—বিশেষতঃ যদি একগৃহে অধিক লোকে শয়ন করিতে বাধ্য হয়—অবশ্য শীতকাল উহার ব্যতিক্রম করা প্রয়োজন। কিন্তু তখনও একেবারে সমুদয় রন্ধ্রাদি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া, গহে ঠাণ্ডা আসিবার আশঙ্কা নিবারণ করা

কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু যাহাতে বাহিরের মুক্ত বায়ু কক্ষমধ্যে যাইয়া, তন্মধ্যস্থ দূষিত বায়ু শোধন করিতে পারে, সদা তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ই থাকে, তবে ঠিক মাথার দিকের জানালা উন্মুক্ত না রাখিয়া, পায়ের ধারে উহা মুক্ত রাখা দরকার এবং গৃহ অধিক শীতল হইতে থাকিলে, সেই উন্মুক্ত জানালার গায়ে একখানি বড় পাতলা পর্দ্দা অথবা বস্ত্র ঝুলাইয়া দিলেই উভয় কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—গাত্রের উপর একখানি সময়োপযোগী বস্ত্র দিয়া উহা আবৃত করিয়া রাখা উচিত। এই প্রকারে গাত্রও exposed থাকিয়া হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা লাগায় ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না এবং গৃহও যথোপযুক্ত সুবাতাস পূর্ণ থাকিয়া, স্বাস্থ্য এবং জীর্ণ ক্রিয়া পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আমাদিগের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শয়ন গৃহের বাতায়ন উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন একথা কি বলিয়া দিতে হইবে? বাতাসের ঝাপটা (draught) গাত্রে লাগিতে দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আলোক ও বাতাস চলা-চলের পথ মুক্ত রাখিয়া, আমরা যদি বাস করিতে পারি, তবে দেখিবে যে অর্দ্ধেক সংখ্যা রোগ নিজেই সারিয়া গিয়াছে অথবা উহা আমাদের ত্রিসীমানায় আসিতেও পারে নাই!

দেহ দুর্ব্বল এবং অসুস্থ থাকিলে—মুক্ত সুবাতাসের অভাবে যাহা প্রায়ই উপস্থিত হইয়া পড়ে—শরীরের সমুদয় অংশের সহ পাকাশয়ের পেশী সমুদয়ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সম্যকরূপে

পাকাশয়িক পেশীর দুর্ব্বলতা

স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। পাকাশয়িক পেশী গাত্র দুর্ব্বল হওয়ায় ক্রমে পাকাশয় বিবৃদ্ধ হইয়া পড়ে; আবার পাকাশয় বড় এবং বিবৃদ্ধ হওয়ায়, ভক্ষিত পদার্থ তন্মধ্যে উত্তম প্রকারে মথিত হয় না। এই কারণে ভুক্ত বস্তু তথায় দুই, তিন অথবা চারি ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণরূপে জীর্ণ হইতে না পারিয়া বহু বিলম্বে হইতে থাকে; সুতরাং ঐ ভুক্ত বস্তু যত সত্বর অন্ত্রমধ্যে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে পারে না। পাকাশয় প্রায়ই একেবারে শূন্যাবস্থায় থাকে না, খাদ্য বস্তুর কিছু অংশ সদাই তন্মধ্যে থাকিয়া যায়, এবং অধিকক্ষণ যাবৎ তথায় থাকার জন্য উহা গাঁজলাইয়া (fermentation) উঠে, নানাপ্রকার গ্যাসের উদ্ভব করিতে থাকে এবং তজ্জন্য রোগী শরীর মধ্যে বায়ু-জমা (flatulence) (অতীব কষ্টদায়ক বেদনা-জনিত ক্লেশ) অনুভব করে। এই অবস্থা অধিক দিবস স্থায়ী হইলেই, ভুক্ত পদার্থ ফেণাযুক্ত গাঁজলান ভাবের হইয়া, বমিত হইতে থাকে।

আমরা অবশ্য এ কথা বলি না যে, অজীর্ণ রোগী মাত্রেরই পাকাশয় বর্দ্ধিতায়তন হইয়া থাকে; কিন্তু পাকাশয়িক mechanical কার্য্য সুভাবে না চলিলে যে উহা বর্দ্ধিতায়তন, ময়লা এবং দোষযুক্ত হইয়া পড়ে ইহা নিশ্চয়। তবে সকল রোগের ন্যায় ইহারও অবস্থাবিশেষের তারতম্য হইয়া থাকে। চিকিৎসকের উপদেশাদি মানিয়া না চলা হেতু যে অজীর্ণতা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধানতঃ পাকাশয়িক mechanical কার্য্যের অসম্পূর্ণতা

মেক্যানিকাল কার্য্যের সম্যক সাধন

হইতেই উদ্ভূত। শরীরের সাধারণ সুস্থতা, এবং দিবসে ও রাত্রিতে উন্মুক্ত সুবাতাস সেবন করা ব্যতীতও, আরও কয়েকটি বিষয় পরিচর্য্যা করিলে, তবে পাকাশয়িক পেশী সমুদয়ের কার্য্যাক্ষমতা নিবারণ করা যাইতে পারে। ব্যায়ামে এ বিষয়ের উপকারীতা বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়; একারণ ব্যায়াম করা আবশ্যক, কিন্তু ইহা যেন মাত্রায় অত্যধিক অথবা অত্যল্প না হয়। পাত্রবিশেষে যে একই বিষয় অমৃত ও বিষতুল্য হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, এই ব্যায়াম বিষয়েও উহা সম প্রযোজ্য :—একের পক্ষে যাহা পরিশ্রম বলিয়া মনেই হয় না, অন্যের পক্ষে হয়ত তাহাই সবিশেষ শ্রমসাধ্য হইয়া পড়ে। অশ্বারোহণে ভ্রমণ বড়ই সুখসাধ্য ব্যায়াম, কিন্তু যাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়া আছে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিষতুল্য পরিত্যাজ্য।

ব্যায়াম

আমাদিগের মতে পাদ-ভ্রমণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকারের ব্যায়াম বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া ধীর মন্থর গমনে শতপদ মাত্র ভ্রমণ করিলেই যে কাজ হইবে তাহা নহে। বেড়াইবার সময় দৃঢ়চিত্তে এমত পরিমাণ পথ অতিক্রম করা প্রয়োজন, যাহাতে তোমার সর্ব্বশরীর উপযুক্ত চালিত হইয়া, শ্রম উপলব্ধি করিতে পারে। তোমার শরীরের পক্ষে কতখানি পরিশ্রম সহ্য হইবে, তাহা চিকিৎসক দ্বারা নিরূপণ করাইয়া লইলেই ভাল হয়, কারণ অনেক সময় নিজের বিবেচনা শক্তি উহা নিরূপণে সমর্থ হয় না। রোগবিশেষে দেখিয়াছি যে, রোগী কেমন একপ্রকার জড়ত্বভাবাপন্ন হইয়া পড়ে যে, স্বেচ্ছায়

সামর্থ্য সত্বেও, অন্য কোন পরিশ্রম করিতে চেষ্টা করা দূরে থাক, সামান্য বেড়াইতেও চাহে না ! এরূপ স্থলে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যে একরূপ জোর করিয়াই, তাহাকে পরিমাণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক, পাদ-ভ্রমণে নিযুক্ত করা এবং তাহা সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় কিনা দেখিবার জন্য তাহার কোন আত্মীয়ের উপরে ভার অর্পণ করা। পাকাশয় ও হৃৎপিণ্ড, উভয়ের পক্ষেই ব্যায়ামাধিক্য হানি-কারক। দুর্ব্বল রোগীগণের আরোগ্যাবস্থায় (invalid) যখন কোন প্রকার শ্রমই করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন massage practice অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী জানিবে।

আহারের পূর্ব্বে বিশ্রাম

শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া কখনও আহারে প্রবৃত্ত হইবে না। মনে রাখিবে যে, যদি নিজে নিরতিশয় শ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পাকাশয়ের পেশী সমুদয় সম্যক্‌ কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে, যদি তুমি শ্রান্তি ও ক্লান্তি অনুভব করিতে থাক, তাহা হইলে অন্ততঃ ১৫ মিনিট (নিয়ম মত অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলেই ভাল হয়) উপবেশন করিয়া, শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম উপভোগ করিয়া লইবে। পাকাশয়ে খাদ্য বস্তু চাপাইবার পূর্ব্বে, সাধারণতঃ শরীরবিধানকে শান্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য; কারণ জীর্ণক্রিয়ার জন্য ঐ শরীর বিধানের, কোন অংশকেই ত আবার শ্রম করিতে হইবে ? যদি পূর্ব্ব হইতেই শ্রান্ত থাকে, তবে কেমন করিয়া আবার পূর্ণ উদ্যমে উহা কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারে ?

আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বের কার্য্য বর্ণনা করিয়া, এখন উহার পরে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই আলোচনা করা প্রয়োজন। পাকাশয় গাত্র অতিশয় পাতলা—২।৩ খানি ব্রাউন কাগজ একত্রিত করিলে যতটা পুরু হয় মাত্র ততটা—এবং এই যন্ত্র তোমার আজীবন সঙ্গী থাকিবে। ইচ্ছা করিলেই যে তুমি উহা বদলাইয়া দিবে তাহা পারিবে না; চিকিৎসকের নিকট যাইলেও তিনি বড়জোড় না হয়, উহা জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন একটি তৈয়ারী করিয়া বসাইয়া দিতে পারিবেন না! হৃৎপিণ্ডের অতি সন্নিকটেই যে পাকাশয় অবস্থিত এবং এই পাকাশয়স্থ কার্য্য যে বড়ই delicate অর্থাৎ সহজেই বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভব, তাহা সকলেরই জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। ইহা হইতে যে গ্যাষ্ট্রিক রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড হইতেই হয় এবং তাহা তেজশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শুদ্ধ চর্ম্মচক্ষে দেখিতেও পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় সম্যক জ্ঞাত থাকিলে বোধ হয়, কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, আহারের পর অন্ততঃ ২০।৩০ মিনিট উপবেশন ও বিশ্রাম লাভ করা প্রয়োজন, নতুবা পাকাশয় নিজ যান্ত্রিক কার্য্য আরম্ভ করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয় না। কোন একটি বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিবার সময়, যদি তোমার মস্তিষ্ক স্থির না থাকিয়া, অনবরত চাঞ্চল্য অনুভব করিতে থাকে, তাহা হইলে যেমন সেই চিন্তার কোনরূপ সুমীমাংসা করা কঠিন হইয়া পড়ে, সেইরূপ পাকাশয়ও কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়,

যদি উপযুক্ত স্থৈর্য্য ও ধীরতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সুভাবে চলিতে পারে না জানিবে। বিশেষতঃ যাহাদের হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল অথবা উহার কোন প্রকার যান্ত্রিক পীড়া বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের পক্ষে আহারের পর বিশ্রাম অতি আবশ্যক। কারণ খাদ্যদ্রব্য ও বায়ু দ্বারা, যখন পাকাশয় স্ফীত হইয়া উঠে, তখন উহা হৃৎপিণ্ডের উপর চাপিয়া পড়ে। (পাকাশয়িক এই স্ফীতিপ্রযুক্ত হৃৎপিণ্ড যে কি ভাবে চাপগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রতিকৃতি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে)।

পূর্ণ আহারের পর, যদি কোন কারণে জীর্ণক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভক্ষিত পদার্থ অন্ত্র মধ্যে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই হৃৎপিণ্ড গোলযোগযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং হৃৎস্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। ইহার উপর আবার যদি আকস্মিক অথবা কোন অতিরিক্ত শ্রম হেতু হৃৎযন্ত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা আরও সমধিক বিপদজনকভাবে গোলযোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহারই পরিণাম স্বরূপ দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ পূর্ণ আহারের অব্যবহিত পরেই, ব্যস্ততা প্রযুক্ত রেলগাড়ী ধরিবার জন্য, অথবা অন্য কোন বিশেষ কার্য্যসাধন জন্য, চেষ্টা করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও, আমরা প্রতিনিয়তই দেখিয়া থাকি যে, কতলোক আহারের পরই—এমন কি নাকে মুখে গুঁজিয়াই—বিশ্রাম না করিয়াই

আহারের পরেই পরিশ্রমে বিপদ

দেখাইয়া থাকেন! জীবনযাত্রা ও সংসার পরিপোষণ জন্য, অনেক সময় এসব করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সদাই মনে রাখা দরকার যে, সময়ে সকলই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃৎযন্ত্রের কার্য্য যদি কোন প্রকারে স্থগিত অথবা বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও উহা আর সচল করা যাইতে পারে না!! সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উহার কার্য্যে বাধা না দিয়া, সহায়তা করাই যুক্তিসঙ্গত। পাকাশয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশালী যন্ত্রেরও যে, একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে, তাহা তাঁহারা মানিতে চাহেন না! সুতরাং অনতিবিলম্বে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, এই পাকাশয়ই—শান্ত, শিষ্ট অশ্বও যেমন অতিরিক্ত ত্যক্তবিরক্ত হইলে, উত্যক্তকারীকে পদাঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না—সহ্যাতিরিক্ত বিরক্ত হওয়ার পর বাধ্য হইয়া, উত্যক্তকারীকে তাহার অবিমৃষ্যকারীতার ফলভোগ করাইতে থাকে। ইহার ফলে তিনি বেদনা, পেটফাঁপা, অথবা অসুস্থভাব অনুভব করিয়া, পাকাশয়কে পুনর্ব্বার ঠিক পথে আনিবার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া থাকেন এবং এই উপায়েই ঔষধ দ্বারা তাহার বিকৃতভাবের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পান! কিন্তু মনেও একবার ভাবেন না যে, অন্যের সাহায্য না লইয়াও তিনি নিজেই উহার প্রতিকারে সমর্থ হইতে পারেন। সকল বিষয়েই দেখা যায় যে, যাহার যাহা প্রাপ্য যদি, তাহা দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর বিসম্বাদের কোনই কারণ থাকে না। যদি পাকাশয়ের সহ বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিতে হয়—তাহা হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার

[illegible]

সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগের প্রতিবিধান করা যে তাহার আরোগ্য সাধন অপেক্ষা শ্রেয়, তাহা সকলে মনে রাখিতে পারেন না, কাজেই রোগ আরোগ্য করিবার জন্যই লোক অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকৃতির মানবদিগের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যতবারই রোগ আরোগ্য করাইবে ততবার, যে যন্ত্রই আক্রান্ত হউক কেন না, একটু করিয়া ক্ষত তাহাতে থাকিয়াই যায়। এইরূপে একটি যন্ত্র (পাকাশয়ই ধরা যাউক) বারেবারে আক্রান্ত ও আরোগ্য হইতে থাকিলেও, ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে, রোগ তখন চিরস্থায়ী ভাবেই থাকিয়া যায়। প্রতিকারার্থ ঔষধ ব্যবহারে মাত্র সাময়িক উপশম বোধ হইয়া থাকে; একেবারে আরোগ্য হইয়া যায় না। এই দৃশ্য সম্পূর্ণ অবিচলিত সত্য হইলেও, লোকচক্ষে বিশেষ কালিমাময় বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সচরাচর যে আমরা ইহা সমধিক ভাবে দেখিতে পাই না, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে যে, আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে নব নব আবিষ্কৃত ঔষধে বিস্ময়কর ফলোদয় হইয়া থাকে। তবে রোগের উদ্ভব কারণ ও উদ্রেক কারণ বিনষ্ট না হইলে, শুদ্ধ ঔষধ ব্যবহারে প্রকৃত স্থায়ী ফলপ্রাপ্তির আশা করিলে নিশ্চয়ই প্রতারিত হইতে হইবে।

পাকাশয়ের রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত অর্থাৎ গ্যাষ্ট্রিক রসের সম্বন্ধে বক্তব্য বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, এই মেক্যানিকাল অর্থাৎ মাংসপেশীর কার্য্যাদির গোলযোগ সম্বন্ধে আরও ২।১ কথা বলা

প্রয়োজন মনে করি । দহনীয় পদার্থ না পাইলে, অগ্নি যেরূপ তেজহীন হইয়া পরিশেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরা যদি পাকাশয়ে আহার্য্য বস্তু প্রদান না করি, তাহা হইলে তন্নিহিত পাচকাগ্নিও ক্রমশঃ তেজশূন্য হইয়া, এমন কি আমাদিগের জীবনদীপ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ করিয়া দিতে পারে। আমাদের জীবন ধারণের জন্য আহার যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা অবশ্য সকলেই জানেন, কিন্তু কত বার আহার করা প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ অতরল ও তরল পদার্থ ভোজন করা প্রয়োজন তাহাও অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। সুস্থ শরীরেও পাকাশয়ের পেশীর কার্য্য অনাবশ্যকীয়ভাবে বারেবারে উত্যক্ত হইলে বিকৃত হইবার সম্ভব। অনবধান প্রযুক্ত অনেকেই বহুবার, না হয় বহু পরিমাণে, অথবা বহু সময় অন্তর, আহার করিয়া থাকেন দেখা যায়; আমরা যখন সাদাসিধে সহজ পাচ্য দ্রব্য আহার করি, তখন দুই ঘণ্টা হইতে চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় জীর্ণ কার্য্যে আবশ্যক হইয়া থাকে। গুরু দ্রব্য ভোজন করিলে আরও অধিক সময় জীর্ণক্রিয়ায় অতিবাহিত হয় জানিবে। একবার আহারের পর, উহা জীর্ণ করিবার জন্য পাকাশয়কে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামের জন্য সময় ও সুযোগ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা উহা পরবর্ত্তী আহারীয় দ্রব্যাদিকে জীর্ণ করিবার শক্তি হারাইয়া বসিবে। পাকাশয় যখনই শূন্য থাকিতে পায় তখনই মাত্র যে উহা বিশ্রাম ভোগ করিয়া থাকে তাহা সকলে জানা থাকা

কতবার আহার করা প্রয়োজন

আবশ্যক। আহার দ্বারা প্রীতি, সত্ত্ব বল-সঞ্চার, দেহরক্ষা, স্মরণশক্তি প্রভৃতির কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, অতএব দিবসে ও রাত্রিতে উপযুক্ত আহার করা প্রয়োজন। ইউরোপীয়েরা এবং তৎপ্রথাপ্রণোদিত বিলাতপ্রত্যাগত আমাদিগের বাঙ্গালী সাহেবেরা, সর্ব্ব সমেত দিবারাত্রিতে ৫।৬ বার আহার করিয়া থাকেন। আমাদের পক্ষে দুইবার আহারই (ও দুইবার কিঞ্চিৎ জলযোগ—ইহাও সাধারণের জন্য নহে) যথেষ্ট জানিবে; কিন্তু এইরূপ আহার ও জলযোগের একটি নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির থাকা প্রয়োজন, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া সেই সময়ের মধ্যেই আহার করা প্রয়োজন, নতুবা ভোজ্য পদার্থাদি প্রস্তুত হইয়া অধিকক্ষণ যাবৎ রক্ষিত হইলে ঠাণ্ডা হওয়ায়, অথবা গরম অবস্থায় রাখার জন্য, কঠিন ও শুষ্ক হওয়ায়, সহজে পরিপাক হইতে পারে না। অত্যুষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে বলনাশ হইয়া থাকে এবং শীতল ও শুষ্ক অন্ন সহজে জীর্ণ হয় না। যদি প্রাতে জলযোগ করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে উহার সময় এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে মধ্যাহ্নিক আহারের জন্য প্রস্তুত হইবার পক্ষে, পাকাশয়কে কিঞ্চিৎ সময় দিতে পারা যায়। একারণ এই জলযোগ কার্য্য প্রাতে ৮।৯টার মধ্যে হইলেই ভাল হয় এবং তাহাতে মধ্যাহ্নিক আহারের জন্য প্রস্তুত হইবারও বেশ সময় থাকে। সাত্বিক ভাবাপন্ন হিন্দু স্নানাহ্নিক সমাপন না করিয়া, অপনার ইষ্ট দেবের আরাধনা না করিয়া, কখনই জলপান করেন না! সুতরাং তাঁহাদের

আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন

পক্ষে প্রাতঃকালীন আহারের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না। কিন্তু দুর্দম ও অবিরাম জীবনগতি, বৈষয়িক উদ্দাম উত্তেজনা এবং গোলযাল, যশঃ, অর্থ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য আজকাল আমরা যেরূপ অতৃপ্ত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, জীবন সংঘর্ষে প্রতিনিয়তই অগ্রসর হইতে থাকি, তাহাতে অনেক সময় বাধ্য হইয়া, নির্দ্দিষ্ট মধ্যাহ্নিক আহার সময়ে করিতে পারি না, সুতরাং স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য তৎপূর্ব্বে যাহা হয় কিছু আহার করা প্রয়োজন। যাঁহারা ১০টার মধ্যেই আহারাদি সমাধা করিয়া অফিসাদি যাইয়া থাকেন, নিতান্ত ক্ষুধার আগ্রহ না হইলে, তাঁহাদিগের পক্ষে আহারের পূর্ব্বে জলযোগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। (প্রাতর্ভোজন বা মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সময়, কি কি আহার করা প্রয়োজন তাহা অন্য অধ্যায়ে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা না থাকায়, এখানে তাহার অবতারনা করা গেল না।)

প্রাতঃ ভোজন

প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ না করিয়াই, কিছু সেবন করা অর্থাৎ এক বাটি চা সেবন করা প্রয়োজন কিনা, অথবা শয্যায় থাকা কালীনই, প্রাতরাশ সমাধা করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ মনে করেন। আমরা যখন আহারাদি ও তাহার জীর্ণাজীর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধেই পুস্তক লিখিতে বসিয়াছি, তখন উহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে যত মতামত আছে, সমুদয়ই বর্ণনা করিতে বাধ্য। পরে

শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে চা খাওয়া

আমাদের মতে উহা অনুমোদনীয় কিনা তাহাই বলিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাকযন্ত্রাদি দ্বারা জীর্ণক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদন করাইতে হইলে, শরীর বেশ সবল থাকা প্রয়োজন। এই সবলভাব ব্যক্তি বিশেষের শরীর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে জানিবে। মোট কথায় ইহা সদা মনে রাখিতে হইবে, যে দুর্ব্বল অথবা ক্লান্ত শরীরে ভোজনাদি করা কর্ত্তব্য নহে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, দুর্ব্বলতা বশতঃ শয্যাত্যাগের পর, শৌচাদি সমাপন ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন কার্য্য সারিয়া, প্রাতর্ভোজনের সময় অতিশয় শ্রান্তি অনুভব করিয়া থাকেন; হয়ত বা পূর্ব্বরাত্রি অনাহারে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এমত স্থলে আরও অধিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করিতেছেন! এখন জলযোগে প্রবৃত্ত হইলে ভাল করিয়া খাইতে ও পারেন না, অথবা যদি বা ভোজন করেন, তাহা হইলে সর্ব্ব শরীরের ন্যায়, সেই শরীরেরই অংশ বিশেষ পাকাশয়টি অতি শ্রান্ত থাকায়, খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়; সুতরাং তাহার ফলে বেদনা বমন অথবা উদরে বায়ুজমা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

সুস্থ ও স্বচ্ছন্দতাহীন শরীরবিশিষ্ট নরনারীর পক্ষে প্রাতঃ ভোজনের পূর্ব্বে, শয্যা ত্যাগ না করিয়াই,

এক পেয়ালা চা সেবন করা কর্ত্তব্য; আবার অনুগ্র চা

এই চা, যেমন তেমন হইলে হইবে না!

গরম জলে চায়ের পাতা ২মিনিটের অধিক না রাখিয়া এবং তাহাতে সামান্য চিনি ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, সেই চা সেবন করিতে দিবে। ইহার সহ সামান্য দুই এক খানি

বিস্কুট ও মাখন হইলেও চলিতে পারে। পাশ্চত্য লেখকগণ বলেন যে,ইহা করিলে অ[illegible] শৌচাদি সমাপন ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক,প্রাতর্ভোজনের সময় দুর্ব্বলতা বা শ্রান্তি অনুভূত হইবে না; সুতরাং হৃষ্টচিত্তে ভোজন ও তাহা সহজেই জীর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। অনেক সময় চা এর পরিবর্তে, অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; সেই স্থলে উহার পরিবর্তে এক গ্লাস দুগ্ধ ও গরম জল, সমান অর্দ্ধাংশে মিশ্রিত করিয়া, অথবা শুদ্ধ গরম জল এক পেয়ালা, কিংবা কোন প্রকার নির্ঝর (Spring) নিঃসৃত জল (সীতাকুণ্ড জল অথবা ঘাটশিলার জলই প্রশস্ত) পান করিলেও চলিতে পারে। এক পেয়ালা মেলিন্‌স ফুড অথবা বেঙ্গার্‌স ফুড সেবন করিতে দিলেও ভাল হয়। এই সকল বিষয় পারিবারিক চিকিৎসক দ্বারা নিরূপণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। এখানে আমাদের এসব উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভোজনের পূর্ব্বে, যখনকার নির্দ্দিষ্ট ভোজনকার্য্য হউক না কেন, শরীর যেন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও বলবান্ থাকে। শরীরগতিকে যদি উহার কোন বিপরীত ভাব বুঝিতে পার তবে, তাহার প্রতিকার কল্পে যে যে বিধান ব্যবস্থা করা হইল, তাহার যেটি পছন্দমত হয় তাহাই করিতে পার। প্রত্যহ প্রাতেই যে ইহা করিতে হইবে তাহাও মনে করিওনা। যদি নিতান্ত আবশ্যক বোধ না কর, তাহা হইলে প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এমনও হইতে পারে যে, প্রাতে

চা পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থা

অনাবশ্যকে খাইও না

তুমি কোন প্রকার দুর্ব্বলতা বোধই করিলেনা, অথবা ক্রমশঃ শরীরে বলাধান সহ যখন দেখিবে যে, মোটেই তুমি ক্লেশ বোধ করিতেছ না তখন উহা একেবারে পরিবর্জ্জন করিবে। অবস্থা বুঝিয়া যাহা উত্তম ব্যবস্থা হইবে তাহাই করিবে, অযথা কোন নিয়মেরই বশীভূত হওয়া উচিত নহে। হিন্দুমাত্রেই প্রাতঃকালে শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়া, (স্নানাহ্নিক ছাড়িয়া দিলেও) কোন প্রকার আহারাদি করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে উপরি উক্ত ব্যবস্থা নিরতিশয় বিসদৃশ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দুর দিনচর্য্যা ও রাত্রিচর্য্যা, সমুদয়ই ধর্ম্ম সহ সংসৃষ্ট। ধর্ম্মের সহিত উহা যে কেন ঘনীভূত সম্বন্ধীভূত তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। এখানে কেবলমাত্র এই বলিতেছি যে, পাশ্চাত্য হিসাবে আমাদের আহার বিহারাদি করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সকলেই তৎ প্রথা প্রণোদিত ভাবে চালিত হইয়াই যত উৎকট ব্যাধির সৃজন করিতেছেন। সহজ শরীরে শয্যাতেই ভোজন ক্রিয়া, প্রাতকৃত্যাদি সমাপনের পূর্ব্বেই,করা যে অকর্ত্তব্য তাহা পাশ্চাত্য লেখকগণও বলিয়াছেন দেখিতে পাইবেন।

হিন্দুর আহার

যাহাদিগের হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, অথবা কোন প্রকার পীড়াগ্রস্থ, কিংবা যাহারা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, কোন প্রকার রোগাক্রান্তির পর তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই হাত মুখ ধৌত করতঃ, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর, শয্যায় থাকাকালীনই কিঞ্চিৎ জলযোগ করা; নতুবা অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্লান্তি

দুর্ব্বলের ব্যবস্থা।

জন্মাইয়া, বিলম্বে জলযোগ কার্য্য সমাধার ফলে, সত্বর ক্ষুধালোপ এবং জীর্ণকার্য্য ব্যাঘাতযুক্ত হইতে পারে। শয্যা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই জলযোগ করিতে বাধ্য হইলে, ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, ঐ আহারের পরই আরও কিছুক্ষণ সেই শয্যাতেই থাকিয়া বিশ্রাম করা প্রয়োজন। কোন প্রকার কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকিলে, ইহার ঠিক অব্যবহিত পরেই করা কর্ত্তব্য নহে।

ক্লান্ত হইয়া আহার করিও না

দিবস অথবা রাত্রি, যে কোন সময়েই হউক না কেন, অতিশয় শ্রান্তি বা ক্লান্তি অনুভব করিলে, তাহা দূরীকরণ না করিয়া কখনই আহারে প্রবৃত্ত হইবেনা। অন্ততঃ পক্ষে ১০।১৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া, হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবে, পরে আবশ্যক বোধ করিলে একটু শীতল জল পানান্তে তবে আহারে বসিবে। ইহার আর একটি উপকারীতা এই যে, শরীরের রক্ত মধ্যে সম্পূর্ব্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তরল পদার্থ গৃহীত হওয়ায়, আহার কালে বিশেষ তৃষ্ণা পাইবে না; সুতরাং ভক্ষিত পদার্থ সহ তরল পদার্থ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইতে না পারায়, জীর্ণক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিতে পারিবে না। যাহাদিগের জীর্ণশক্তি স্বল্প তাহাদিগের পক্ষে অন্ততঃ এই নিয়মাধীন হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হিন্দু,স্নানাহ্নিক না করিয়া আহারাদি দূরের

হিন্দুর ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য
নিয়মাদি

কথা জলযোগ করাও অকর্ত্তব্য মনে করেন। আমরা পূর্ব্বেই একস্থানে বলিয়াছি যে, হিন্দুর আচার বিচার, আহার বিহার, সমুদয়ই ধর্ম্মের সহিত সূত্রাকারে গ্রথিত। উহা যে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা আমরা এখন দেখাইব। আজকাল যেমন কাহাকেও স্বাস্থ্যতত্ত্বের সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি "সব জান্তা" ভাব দেখাইয়া উহা তাচ্ছিল্যের সহ উড়াইয়া দেন, এবং তাহা প্রতিপালন করিতে চাহেন না, সেইরূপ পাছে সে কালের লোকেরাও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সমুদয় পালনে অবহেলা করে, তাই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে বাধ্য করিবার জন্য, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহা ধর্ম্মাচরণের মধ্যে গ্রথিত হইয়া নৈমিত্তিক করণীয় বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। এতকাল উহা অন্ধভাবে প্রতিপালিত হইত বলিয়াই ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবান ও বলবান লোকের অভাব ছিল না! আজকাল আমরা ধর্ম্মে যতই শৈথিল্য দেখাইতেছি এবং হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্য প্রতিপাল্য কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হইতেছি, ততই স্বাস্থ্য হারাইয়া, তৎসহ সুখসম্পদ সকলই নষ্ট করিতে বসিয়াছি! এই ধর্ম্ম শিথিলতাই যে আমাদিগের একমাত্র অধঃপতন কারণ তাহা আমরা বলিনা, তবে উহা যে একটি প্রধানতম কারণ তাহার সন্দেহ নাই! হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান স্বাস্থ্যের সহিত কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত তাহা আমরা এইবার দেখাইব। আহারাদি বর্ণনাকালে অন্য বিষয় বিচারের

স্নানাহ্নিক ক্রিয়া

কথার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উহাতে বিরত থাকিয়া এই স্থান হইতেই আমাদের সূত্র ধরা যাউক। স্নানাহ্নিক না করিয়া ভোজন অকর্ত্তব্য হিন্দু কেন বলেন দেখা যাউক :—স্নান দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, তেজোবৃদ্ধি, আয়ু প্রতিপালন, বলোৎপত্তি এবং কচ্ছুরোগ, মল, শ্রান্তি, স্বেদ, তন্দ্রা, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে। শীতল জলাদি দ্বারা শরীরের বাহ্যভাগ সিক্ত হইলে, শরীরজাত উত্তাপ প্রতিহত হইয়া,দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত করে। এই কারণেই স্নানের অব্যবহিত পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। সুস্থ ও বলবান ব্যক্তির পক্ষে নিত্যস্নান বিধেয় জানিবে। স্নানের অব্যবহিত পরেই যে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন—স্নানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও উদর ভারযুক্ত থাকিলে তুমি স্নানের পরই দেখিবে যে তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তবেই দেখ উহার সহ স্বাস্থ্যের কত অধিক সম্বন্ধ !!

স্নান ও ক্ষুধা

এইবার দেখা যাউক আহারের পূর্ব্বে আহ্নিকের আবশ্যকতা আছে কি না ? সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, আহার কালে শান্তচিত্তে সুখোপবিষ্ট হইয়া উপবেশন করা প্রয়োজন। নিজ ইষ্টদেব ও ভগবানকে ডাকিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করায়, চিত্তে ধৈর্য্য ও শান্তি আসিয়া থাকে কিনা তাহাও কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? সুতরাং সাত্ত্বিক হিন্দুর জন্য ঋষিগণ যে ব্যবস্থা প্রণোদন করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা পালনীয় জানিবে।

মধ্যাহ্ন ভোজন

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদিগের দুটি প্রধান আহারই যথেষ্ট, একটি দিবসে ও অন্যটি রাত্রিকালে। অবস্থাবিশেষে যে কিঞ্চিৎ ২ জলযোগের ব্যবস্থাও হওয়া কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি—তবে উহা দরিদ্রের জন্য নহে। আবশ্যক স্থলে স্বল্পব্যয়ে, অথবা দৃশ্যতঃ কোন ব্যয় না করিয়াও যে, সাধারণে তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা আমরা উপযুক্ত স্থলে পরে দেখাইয়া দিব। এখন শুদ্ধ ভোজনের সময় গুলিই দেখাইয়া যাইব। মধ্যাহ্ন ভোজন, বেলা এক প্রহরের মধ্যে ও দুই প্রহর অতীত হইলে পর, করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ১০।১১ টার মধ্যেই উহা সমাধা করা প্রয়োজন। এক প্রহরের মধ্যে আহারে রসের উৎপত্তি ও দুই প্রহরের পরে করিলে বলক্ষয় হয় জানিবে। আহার সম্বন্ধে সাধারণ একটি নিয়ম মানিয়া চলিলেও যথেষ্ট হয় যথা :—সুস্থাবস্থায় যখনই ক্ষুধার উদয় হইবে, তখনই আহার কাল জানিয়া তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত সময়ে এবং স্বল্প বা অধিক মাত্রায় ভোজন করা অকর্ত্তব্য। ক্ষুধা না হইতেই আহার করিলে, দেহের অসামর্থ্য শিরোবেদনা, অজীর্ণ, পেটবেদনা প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। সময় অতীত হইয়া যাওয়ার পর, ভোজনে বায়ু-

স্বল্প বা অধিক ভোজন

দ্বারা পাচকাগ্নি উপহত হওয়াতে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে জীর্ণ হয় এবং পুনর্ব্বার ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। ন্যূন পরিমাণে আহারে গ্লানি ও বলক্ষয় হয় এবং অতিমাত্রায় ভোজনে আলস্য, শরীর

ভার ও উদরে গড়্ গুড়্ শব্দ ও অবসন্নতা উপস্থিত হয়। অতএব উক্ত দোষ সমস্ত রহিত, সুসংস্কৃত ও উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন আহার করা প্রয়োজন।

বৈকালিক খাবার

অনেকেই দিবসে ও রাত্রিতে দুই বার মাত্র আহার করিয়া থাকেন এবং তাহাতে কোন প্রকারই ক্লেশ বা গ্লানি অনুভব করেন না দেখা গিয়াছে; কিন্তু যত বয়স অধিক হইতে থাকিবে এবং বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িবে, অথবা কোন প্রকার পীড়া হইতে আরোগ্যের পর, তাঁহারাও উহার অতিরিক্ত ২।১ বার আহারের অভাবসূচক ক্লেশ ক্রমশঃ বোধ করিয়া থাকেন। পাকাশয়কে অযথা অধিকক্ষণ যাবৎ নিষ্ক্রিয় ভাবে রাখিতে নাই। এই জলযোগ কার্য্য—পাঠাধ্যায়ী ছাত্রদের জন্য বেলা ৪।৫ টার মধ্যে এবং অফিসাদি কার্য্যরত বাবুদের জন্য ৫।৬ টার মধ্যে হওয়া কর্ত্তব্য। এ সময় কিরূপ আহারাদি করা প্রয়োজন তাহাও পরে বর্ণনা করিব। এখানে পুনরায় আর একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

বৈকালিক অথবা সান্ধ্য চা সেবন

আজকাল চা খাওয়া আবালবৃদ্ধবনিতার সখের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে! অনেকে প্রাতে ও বৈকালে চা সেবনে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, না হইলে আর চলেনা! উহাও অন্যান্য নেশার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেবিত না হইলে, অতি দুর্ব্বলতা, হাত পা আড়ামোড়া করা, হাইতোলা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিয়া উহার অভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যাঁহাদের আদেশে আমরা চা খাইতে শিখিয়াছি, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে উহা সেবন করিতে

হইলে অধিক মাত্রায় দুগ্ধ এবং স্বল্পমাত্রায় চিনি দিয়া অনুগ্র (Weak) চা, অর্থাৎ—২ মিনিটের অধিক ঐ পত্র গরম জলে সিদ্ধ না করিয়া, সেবন করিবে। কিন্তু তাহার স্থলে আমরা করিয়া থাকি কি? ঠিক উহার বিপরীত, অতি উগ্র চা (হয়ত বা দুইবার সিদ্ধ করা) দুগ্ধের অংশ নাম মাত্র দিয়া অথবা অনেক সময় উহা না দিয়াও, অত্যধিক চিনির সহ সেবন করাই আমরা বিলাসপ্রিয়তা মনে করিয়া থাকি! এই প্রকার চা সেবন করায় যে, কত অপকার সাধিত হয় তাহা সকলে জানেন না—ইহা পাকাশয় এবং স্নায়বিক বিধানের বিশেষ অনিষ্টকারী জানিবে। অতিরিক্ত চিনি অথবা মিষ্টি সংযোগে চা প্রস্তুত হইলে, উহা পরিপাকের পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। (চা সেবনের অপকারীতা আমরা অন্য স্থলে দেখাইব ইচ্ছা আছে এখানে কেবল অবতারণা মাত্র করা গেল।) অনেকে অন্য কোন প্রকার জলযোগ না করিয়া, শুধুই চা সেবন করিয়া থাকেন—তা শরীরের জন্য আবশ্যক উহা হউক বা না হউক! ইহা ফ্যেসনের Fashion দোহাই দিয়া অথবা বন্ধুত্বের খাতিরে কিংবা নেশার বশে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য নহে। চা এর পরিবর্ত্তে অনেকে কাফি পান করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা ব্যক্তি বিশেষের শরীরপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই এক কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, চা অপেক্ষা কাফিসেবনে স্নায়বীয় বিধান অধিক গোলযোগযুক্ত

চা ও কাফি

হইয়া থাকে। কাফি যদি সেবন করিতে হয় তবে, অর্দ্ধেক পরিমাণে গরম দুগ্ধ ও অর্দ্ধেক পরিমাণ কাফি এই অনুপাতে সেবন করা প্রয়োজন।

নৈশ ভোজন

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ঠিক সন্ধ্যার সময় আহার, মৈথুন, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও পথ পর্য্যটন এই পাঁচটি কর্ম্ম নিষিদ্ধ। সেই সময়ে শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তিপরায়ণ চিত্তে ভগবৎ চিন্তায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। রাত্রি ১ প্রহর অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই আহার করা প্রয়োজন। ৮।৯ টার পরে আহার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে। খালি পেটে নিদ্রা যাওয়াও যেমন উচিৎ নহে, সেইরূপ আহারের ঠিক পরেও আবার নিদ্রা যাওয়া উচিৎ নহে। আহারের পরই নিদ্রা যাইলে খাদ্যবস্তু সহজে হজম হয় না, এ কারণ আহারের পর এবং নিদ্রা যাওয়ার মধ্যে, এরূপ সময়ের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন যাহাতে নিদ্রার জন্য পরিপাক ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। দেহ ও মন সুস্থ রাখিবার জন্য প্রকৃতি রাত্রিতেই নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। নিদ্রা আমাদের প্রকৃতই আরামদায়িনী! যদি রাত্রিতে সুস্থভাবে ইহা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে শরীর যাহাতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই বেশ পরিপুষ্ট হইতে পারে তাহা করা প্রয়োজন এবং তাহা করিতে হইলেই এমন সময় নৈশ আহার করা কর্ত্তব্য যে নিদ্রার সময় উহা জী

অনিদ্রা

হইতে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, সুনিদ্রার পক্ষে গোলযোগ ঘটা-ইতে না পারে। এই জন্য ৯।৯॥ টার মধ্যে আহার সম্পন্ন করিয়া ১১টার মধ্যেই নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যকালে আমরা পাঠ্য পুস্তকেও পাঠ করিয়াছি যে, রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রা যাইবে ও ৫টার সময় গাত্রোত্থান করিবে। এখন কিন্তু কার্য্যানুরোধে প্রায় সকলকেই উহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাই আমরা রাত্রিতে নিদ্রার সময় ১১টাই সাব্যস্ত করি-লাম। (রাত্রিতে ভোজনাদি কি প্রকারে হওয়া কর্ত্তব্য তাহা পরে বিবৃত হইবে।)

অতরল খাদ্য পরিমাণ

বর্ত্তমান অধ্যায় সমাপনের পূর্ব্বেই আমাদের আর একটি বিষয়ের আলো-চনা করা প্রয়োজন হইতেছে। কি পরিমাণে অতরল (Solid) পদার্থ ও তরল পদার্থ আমাদের ভোজন করা উচিৎ, এ অধ্যায়ে তাহা দেখাইয়া পরে কোন্ কোন্ দ্রব্য খাওয়া আবশ্যক তাহা দেখাইয়া দেওয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বাপর বরাবর শ্রবণ করিয়া আসিতেছি যে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। ইহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ক্ষুধার নিবৃত্তি না করিয়াই আহার শেষ করিতে হইবে! শরীরের পক্ষে যে পরিমাণ তোমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, যাহা তুমি সহজে পরিপাক করিতে পারিবে, তাহাই তুমি ভোজন করিবে; মোট কথা এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন, আহারের পর উহার গুরুত্ব হেতু অসুখ বোধ, পেট ফাঁপা ইত্যাদি অনুভব করিতে না হয়। পাকাশয়া-ভ্যন্তর চারি প্রকোষ্ঠে যদি বিভাগ করা যায় তাহা হইলে, উহার

দুই প্রকোষ্ঠ খাদ্য দ্রব্যাদি দ্বারা এবং এক প্রকোষ্ঠ জলীয় পদার্থ দ্বারা পরিপূরণ করা কর্ত্তব্য। অন্য যে আর একটি প্রকোষ্ঠ শূন্য থাকিবে উহা বায়ুস্থান বলিয়া অপূর্ণ রাখিতে হয়। এই পরিমাণে আহার করিলে, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীর গহ্বর মধ্যে জীর্ণ জন্য, যখন মন্থন প্রক্রিয়ায় পেষিত হইতে থাকে তখন আর স্থানাভাব ঘটিতে পারে না। সুতরাং সহজেই ঐ প্রক্রিয়া সাধিত হইতে পারায় জীর্ণ হইতে ব্যাঘাত পায় না। অযথা অধিক পরিমাণে আহার করিলে, উহা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় অজীর্ণ জনিত নানা ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় আহার বা পান করিতে থাকিলে, শরীরের চর্ম্ম শুষ্কতর হইয়া যায়,—স্বল্প (পর্যাপ্ত) আহারে গাত্র বর্ণ এবং চক্ষু উজ্জলতর হয় জানিবে। অবশ্য প্রয়োজনমত পূর্ণ মাত্রাতেই খাইবে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় কদাচ খাইবে না। স্বল্লাহার জনিত কখনও অজীর্ণতা উৎপন্ন হইতে শুনা যায় নাই, কিন্তু অতিরিক্ত ভোজন জন্য যে উহা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার প্রমাণ বোধ হয় সকলেই নিজে নিজে অনুভব করিয়াছেন। মাংসাদি অধিক মাত্রায় সেবন করিলেই যে, অপরিপাক হইবে তাহা যেন কেহ মনে না করেন; রুটি, আলু, ও অন্যান্য ষ্টার্চি দ্রব্য অধিক মাত্রায় ভোজনেও উহা অনেক সময় দৃষ্ট হইতে পারে; কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় উহা সেবন করিলে উদর মধ্যে সহজেই উহা গাঁজলাইয়া (Fermented) উঠে ও অজীর্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে।

যদি তুমি সুস্থদেহী হও, তাহা হইলে তোমার তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত অনায়াসে উত্তম বলকারক খাদ্যাদি খাইতে পার, কিংবা

যদি অতিরিক্ত শ্রমজনক কার্য্যাদি তোমায় সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যের পরিমাণ একটু অধিক করিয়া লইতে পার। স্বাস্থ্যকর স্থানে জলবায়ুর গুণে স্বভাবতঃ একটু অধিক ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে, সুতরাং অন্য সময়াপেক্ষা খাওয়ার মাত্রাও বেশী হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় যদি কোন-রূপ ব্যায়ামাদি করা অভ্যাস না থাকে, যেমন বেড়ান ইত্যাদি, তাহা হইলে উহা ভালরূপে জীর্ণ না হওয়ায়, যকৃত ও পাকাশয়ের রক্তাধিক্যতা উৎপাদন করে ও তাহা হইতেই নানা প্রকার অসুখ উৎপন্ন হইয়া পড়ে।

দৈহিক ও মানসিক শ্রমে আহার

মানসিক পরিশ্রমও যদি অতিশয় করা অভ্যাস থাকে, তাহা হইলেও পুষ্টিকর খাদ্য একটু সাধারণাপেক্ষা অধিক ভোজন করা প্রয়োজন। যাহারা অজীর্ণজনিত ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের জীর্ণশক্তি অনুযায়ী আহার্য্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য এবং ধীরে ধীরে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভোজন সময় তাহারা যেন বৈষয়িক অথবা অন্য কোন প্রকার আলোচনায় মগ্ন থাকিয়া, মাত্রায় অধিক আহার না করেন। মাত্রায় অধিক বা অল্প দুইই তাহাদের পক্ষে দোষাবহ।

বাল্য বয়সের আহার

যে দিবস স্কুলে যাইতে না হয় সেই দিবস বালকবালিকাগণ একটু অধিক আহার করিয়া থাকে, নতুবা প্রায়ই স্কুলে যাইবার ব্যগ্রতায় তাহারা অল্পাহার করিয়া থাকে; এই সময়ে তাহাদের আহারের উপর পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই শিশুবয়সে তাহাদের খাদ্যাদি

বিশেষ পুষ্টিকর এবং উপযুক্ত পরিমাণে হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ পাঠাদি ও ব্যায়ামাদি জন্য যে টুকু পরিপোষণের প্রয়োজন, তাহা ব্যতীতও অস্থি, পেশী ও মস্তিষ্ক পরিবর্দ্ধন জন্য আরও পুষ্টিকর পদার্থ তাহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করান আবশ্যক।

জলীয় পদার্থের পরিমাণ

অতরল Solid পদার্থের পরিমাণ নিরূপণ সহ, জলীয় পদার্থের পরিমাণ স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন জানিবে। জলীয় পদার্থের প্রকার ও পরিমাণ সহ, কখন্ কখন্ উহা সেবন করা প্রয়োজন, তাহাও অবগত থাকা কর্ত্তব্য। সুস্থ শরীরে জলীয় পদার্থ সেবনের সম্বন্ধে যে একটা বাঁধা-বাধি করা আবশ্যক তাহা মনে করি না, সুতরাং তৃষ্ণার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা যখনই কেন হউক না, পরিমাণের বিচার না করিয়াই, উহা পান করিয়া থাকি। এই জলীয় পদার্থ এত সহজে আমাদের গলাধঃকরণ হইতে থাকে যে, সে সময়ে উহার পরিমাণ বা পাকাশয়ে যে, কতটা স্থান অধিকার করিবে, তাহা স্থিরীকৃত করিতে পারা যায় না। পূর্ণ মাত্রায় আহারের পর, অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ, যাহাই কেন হউক না, পান করা উচিৎ নহে। উহাতে পাকাশয় অযথা আয়তনে বড় হইয়া পড়ে এবং তাহারই ফলে, দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড চাপ প্রাপ্ত হওয়ায়, হৃৎস্পন্দন হইতে দেখা যায়। আবার এই বৃহদায়তন পাকাশয় ভুক্তদ্রব্যও ভালরূপে ধৃত ও মথিত করিতে সমর্থ হয় না। জলীয় পদার্থ অধিক সেবন করিলে, গ্যাষ্ট্রিক রস অস্বাভাবিক রূপে উহার সহ মিশ্রিত হইয়া, শক্তিহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং উহার

রাসায়নিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অসম্পূর্ণভাবে সাধিত হইয়া থাকে। যাহারা অজীর্ণ পীড়ায় ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহাদের কর্ত্তব্য যে কি পরিমাণে এবং কখন্ কখন্ জলীয় পদার্থ সেবন করা প্রয়োজন, তাহা জানিয়া রাখা! এই জল পান করা, আমাদের শরীর পোষণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং উহা প্রায় একেবারে বর্জ্জন করা অথবা স্বল্পমাত্রায় খাওয়ায় পরিপোষণের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। ডাঃ আই, এন, লোই (Dr. I. N. Lowe) বলেন যে কৃশ ব্যক্তিরাই স্বল্প পরিমাণে জল পান করিয়া থাকে এবং ঐ অভ্যাস পরিবর্ত্তনে, তাহাদের শরীরেও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে দেখা গিয়াছে। মোটা এবং হৃষ্টপুষ্ট লোকেরাই সহজভাবে নিয়মিত জল পান করে দেখিবে। জলীয় পদার্থের মধ্যে কি কি সেবন করা আবশ্যক তাহা আমরা পরে বলিব। আমাদের সমুদয় অন্ত্রপথ এবং কিড্‌নী অর্থাৎ মূত্রোৎপাদক যন্ত্র যে, জলীয় পদার্থ সেবন দ্বারা সুপরিস্কৃত (flushed) ও বিধৌত হইয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অজীর্ণ রোগী, আহারাদি সময়ে সম্পূর্ণ নিয়মাধীন হইয়া, পরিমিত পরিমাণে জলীয় পদার্থ যেন সেবন করেন।

আহারের সময় পানীয় সেবন

স্বভাবতঃই দেখা যায় যে, কোন কোন ব্যক্তি, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে জলীয় পদার্থ আহার করিয়া থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আহার কালে পানীয় অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে, তাহা জীর্ণক্রিয়ার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই অন্তরায় দূরীকরণ চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। আমরা

এমনও অনেক দেখিয়াছি যে, কেহ কেহ আহার কালে প্রায়ই জলপান করিয়া থাকেন, এই অভ্যাস বড়ই দোষা-বহ। বিশেষ চেষ্টা করিয়া উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আহার কালে যাহাতে তৃষ্ণাবোধ না হয়, তাহার প্রতি-কারের জন্য, ভোজনের ২০।২৫ মিনিট পূর্ব্বে, অর্দ্ধ গ্লাস শীতল জল, অথবা সম পরিমাণে দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া, সেবন করা অভ্যাস কর, দেখিবে যে ভোজনের সময় তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আর তৃষ্ণাবোধ করিবে না। সুতরাং জলীয় পদার্থও অধিক আর সেবন করিতে হইবে না। আমর আহারের পর পূর্ণ এক গ্ল্যাস জলপান করিয়া থাকি, ইহার উপকারিতা এই বুঝি যে, আহার কালে ত জল তৃষ্ণা বোধ করিই না, উপরন্তু সারাদিনের মধ্যে (গ্রীষ্মকালেও) উহা বুঝিতে তেমন পারিনা, অথচ জীর্ণক্রিয়ার অন্তরায় না হইয়া উহার সাপেক্ষেই কার্য্য করিয়া থাকে। এই কারণেই আমরা আহারের পরই জলপান প্রশস্ত মনে করি। অনেকে আবার ব্যবস্থা দেন যে, আহারের ১।২ ঘণ্টা পর উহা পান করা কর্ত্তব্য; আমরা তাহা মনে করি না। এইভাবে আহারের পরই সকলের জলপান করা কর্ত্তব্য, আহারকালীন জলপানে অভ্যস্ত থাকিলে, উহা পরিবর্ত্তন করিতে কয়েক দিবস সময় লাগিবে অবশ্য, কিন্তু পরে এমনি অভ্যাস হইয়া যাইবে যে, আর জলপান করিতে ইচ্ছাই হইবেনা। দুই বেলাই আহারের পর জলপান

আহারের পর জলপান কর্ত্তব্য

করা কর্ত্তব্য। পাশ্চত্য লেখকগণ মদ্যপানের বড়ই পক্ষপাতী, কারণ তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার আমোদ প্রমোদ, সমুদয়ই উহার সহ ঘনিষ্ট সম্বন্ধসূচক। সুতরাং উহাঁরা বলিয়া থাকেন যে, আহারের পর রাত্রিতে একটু মদ্য জলের সহ মিশ্রিত করিয়া, পান করিলে সহজে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া যায় ও স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। বয়োবৃদ্ধ, অনিদ্রা-জনিত ক্লেশভাজন ও ধীর অলস রক্তাবর্ত্তনযুক্ত ব্যক্তিগণেই উহা অধিক কার্য্যকারক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থামতেও যে, উক্ত প্রকার স্বাস্থ্যলাভ ঘটিতে পারে তাহা আমরা উপযুক্ত স্থলে দেখাইয়া দিব, এবং আরও দেখাইব যে, মদ্যপান যেরূপ রোগের মূলীভূত কারণ আমাদের প্রদর্শিত ব্যবস্থা তাহা নহে! সুতরাং আমাদের ব্যবস্থাই সর্ব্বথা আচরনীয়।

রাত্রিতে মদ্যপান

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বেই পাকাশয়ের রাসায়নিক কার্য্য অর্থাৎ গ্যাষ্ট্রিক রস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। পাকাশয়ে অজীর্ণতা, এই গ্যাষ্ট্রিক রসের পরিমাণ অথবা Quality গুণবত্বার উপযুক্ততার অভাবেই উৎপন্ন হয় জানিবে, তোমার অজীর্ণতা এই কারণেই উদ্ভুত কিনা, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার আদেশমত ঔষধ সেবন ও নিয়মাদি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। মোটের উপর তোমার ইহা জানিয়া রাখা উচিৎ যে, এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তক্ষীণতা হইলে

পাকাশয় ও গ্যাষ্ট্রিক রস

অথবা কোন প্রকার কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলে, কিংবা সাধারণ শরীরপ্রকৃতি সুস্থ না থাকিলে, ও স্বাস্থ্যের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া না চলিলে, তুমি কখনই আশা করিতে পার না যে, পাকাশয়ের গ্যাষ্ট্রীক গণ্ড সমুদয় সবল ও সুস্থভাবে কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং পরিমাণে ও প্রকারে উত্তম রস নিঃস্রব করিতে থাকিবে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজীর্ণতাই শরীরের স্বাস্থ্যহানির প্রথম লক্ষণ সূচীত করে—হয়ত বা ইহা কোন সংঘাতিক পীড়ার আগমন সম্ভাবনা জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে মনে করিয়া প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অযথা স্বাস্থ্যহানি কদাচ করিওনা। যখনই দেখিবে যে পাকাশয় কিংবা অন্য কোন শারীরযন্ত্র বিকৃতি লক্ষণ দেখাইতেছে, তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া,

তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইবে। পেটেণ্ট ঔষধ

পাকাশয়িক বিকৃতি লক্ষণ যেমন, বেদনা,

পেট কাঁপা ইত্যাদি দেখা দিলেই, আত্মবুদ্ধির প্ররোচনায় সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া, বিজ্ঞাপন—দাতার প্রলোভনে আত্মহারা হইও না!! চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতিরেকে কোন ঔষধই সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞাপনের কুহকে মজিলে দেখিবে যে, তোমার অর্থ ও স্বাস্থ্য, দুইই লইয়া টানাটানি পড়িবে, কিন্তু সুচিকিৎসকের নিকট যাইলে অর্থ যথোচিত খরচ হইবে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য—যাহা অর্থেরও মূল—ফিরিয়া পাইবে!!! পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার এখনও বলিতেছি যে, চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধ সহ

তাঁহার উপদেশানুযায়ী নিয়মাদি সম্পূর্ণ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা আশানুরূপ ফল পাইবেনা। এই পুস্তক মধ্যে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সকল দেশের চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত, সুতরাং ইহা ভালরূপে অধীত করিলে এবং এই মতে চলিলেই দেখিবে যে, অনেক সময় ঔষধের ব্যবহার না করিয়াও—তোমার রোগ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে! তবে রোগ একবার ভাল করিয়া দেখা দিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাদি পালনের সহিত চিকিৎসক নির্দ্দেশিত ঔষধ সেবন করা বিশেষ আবশ্যক। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগেই এ সমুদয় কথা উক্ত হইয়াছে, তথাপি গুরুত্ববোধে ইহার পুনরুল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ত্রমধ্যে পরিপাক ক্রিয়ার সমাধা এবং যকৃত ও পিত্তের কার্য্য।

পাকাশয় পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্রমধ্যে জীর্ণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই, কেমন করিয়া পাকশয় ও জিহ্বা পাকাশয় পরিষ্কৃতভাবে রাখিতে হয়, বলা প্রয়োজন বোধ করি। যে সকল নরনারী বহুদিবস ধরিয়া অজীর্ণ পীড়ায় কষ্ট পাই-

তেছেন, তাঁহারা নিদ্রা হইতে প্রাতে উঠিয়াই, কেমন এক প্রকার শরীর অসুস্থ অনুভব করিয়া থাকেন—ক্ষুধা বোধ হয় না, মুখগহ্বর চট্‌চটে, প্রায়ই বিস্বাদযুক্ত আস্বাদ, দর্পণে জিহ্বা দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, উহা বড়ই লেপাবৃত, হয় পুরু ধূসরাভ সাদা অথবা বাদামী বর্ণের ফাটা ফাটা চিহ্ন, এবং ধন্‌থলে ও উভয় পার্শ্বে দন্তের ছাপযুক্ত রহিয়াছে। অজীর্ণরোগী মাত্রেরই এতাদৃশ জিহ্বা প্রতিকৃতি দৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে, তবে কখনও কম কখনও অধিক ভাবে দেখা যায়; কিন্তু যখনই উহা লক্ষ্যে পড়িবে তখনই প্রতিকার করিতে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ হয়ত ইহা দেখিয়াও দেখেন না, আবার কেহ বা কৃত্রিম উপায়ে জিবছোলা দিয়া পূর্ব্বোক্ত লেপ উঠাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, এবং সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত হয়েন! কিন্তু তাহারও অধিক যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহা মনে ভাবেন না, সুতরাং এক প্রকার অক্ষুধার উপরই আবার দৈনিক নিয়মিত আহারাদি করিয়া থাকেন। এ অভ্যাস বড়ই মন্দ, তোমার জিহ্বার অবস্থা চিকিৎসককে দেখাইয়া ব্যবস্থা করান প্রয়োজন এবং কেন যে জিহ্বা ঐ প্রকার লেপাবৃত হয়, তাহাও অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। জিহ্বাতেও যেমন বিদীর্ণতা ও লেপ দেখিতে পাইলে জানিও যে, তোমার পাকাশয়েও উহার ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে!! আসল কথা, পাকাশয়ের অবস্থারই প্রতিকৃতি জিহ্বায় প্রতিফলিত হইয়াছে জানিবে, সুতরাং শুধু জিহ্বা চাঁচিলে চলিবে না, পাকাশয়টি আগে পরিষ্কার কর, দেখিবে যে জিহ্বায় আর দাগ নাই।

পাকাশয় পরিস্কৃতি করণ কর্ত্তব্য

আমরা দেখিতে পাই যে, প্রায় সকলেই প্রাতে উঠিয়া হস্ত মুখ ধৌত করেন, মল-মূত্রাদি পরিত্যাগান্তে শৌচাদি, স্নান, এবং দন্ত ধাবনাদি দ্বারা সমুদয় শরীর পরিস্কৃত করিয়া থাকেন। এমন কি জিহ্বা অপরিস্কৃত দেখিয়া তাহাও চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা যে দর্পণবৎ অন্যের ছায়া প্রতিফলিত করিতেছে তাহা জ্ঞাত না থাকায়, প্রকৃত স্থান পরিষ্কার করিতে সমর্থ হন না! সুতরাং পাকাশয়—প্রকৃত লেপাবৃত স্থান—অপরিস্কৃত থাকিয়া, সমুদয়ই বিফল করিয়া দেয়। জিহ্বা ময়লা হইলেই যখন পাকাশয়ও ময়লা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখন জিহ্বার ন্যায় উহাও যে প্রত্যহ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য তাহা এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে উহা সম্পাদিত হইতে পারে? এক গ্লাস শীতল অথবা গরম জল, প্রাতে উঠিয়াই

পরিষ্করণ পন্থা

(যখন পাকাশয় শূন্য থাকে), সেবন করিলে অতি সহজেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে জানিবে। এই এক গেলাস জল একেবারে ঢক্ ঢক্ করিয়া পান না করিয়া ২।৩ বারে পান করায় বিশেষ ফল হইয়া থাকে। এলোপাথিক মতে অনেকে ইহার সহ, বাই-কার্ব্বনেট্ অফ সোডা Bicarbonate of Soda (সামান্য ম্যাগ্-নেশিয়া কার্ব্বের সহিত অথবা উহা না দিয়া) স্বল্প লবণ সংযোগ করিয়া সেবন করিতে বলেন। কিন্তু আমরা তাহার কোন বিশেষ উপকারীতা দেখিনা; বরং প্রত্যহ ম্যাগ্নি-

শিয়াদি সেবন করিতে থাকিলে, উহা ব্যতীত আর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার উপায়ই থাকিবে না। সোডা কিম্বা ম্যাগ্‌নেশিয়া কদাচ অভ্যাসমত প্রত্যহ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আয়ুর্ব্বেদ

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে অর্দ্ধ-সের বাসি জল পান করিলে—বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তি হইয়া আয়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার জলপান ক্রিয়া নাসিকা দ্বারাও সাধিত হইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; আমাদের পূর্ব্বতন যোগী ঋষিগণ এই প্রকারে—নাসা ও মুখ দিয়া জলপান করিয়া (শ্বাস লইয়া) মলদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিতেন। এইরূপ দেহের সমুদয় অভ্যন্তর ভাগ যে পরিশোধিত করিতে পারা যায়, তাহা একমাত্র হিন্দুর পূজনীয় দেবকল্প ঋষিগণই বিজ্ঞাত ছিলেন !!! দেহ শুদ্ধ থাকিলেই চিত্তশুদ্ধি থাকিবে এবং

যোগ ও শরীর সাধন

তাহা হইলেই ভগবৎ সাধনায় আত্মমুক্তির পথ প্রশস্ত হইতে পারিবে, বলিয়াই তাঁহারা যাহাতে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার সদুপায় স্থির করিয়া ধর্ম্মের আবরণ দিয়া পালনীয় বলিয়া গিয়াছেন। আমরা যতই "ঘরের জিনিষ" অনুসন্ধান করিতেছি, ততই উহার মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি! কিন্তু হায়! কয়জন আমরা শিক্ষিত হইয়া উহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া থাকি! এখন যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহাই আমরা আদর করিয়া লইতেছি,

কিন্তু প্রাচ্যভূমি—পাশ্চত্য সভ্যতার বহু-পূর্ব্বসঞ্জাত—ভারতের নিজস্ব যাহা ছিল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তাহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতেছি। জলের

গ্যাস লইয়া শরীর শোধনের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতানুযায়ী পাশ্চাত্য মনীষিগণের উপদেশাদি হইতেও নিম্নে দেখাইয়া দিতেছি।

প্রাত্যহিক স্নানের দ্বারা চর্ম্মের পরিস্কৃতি ও শরীর সুস্থ হওয়ার ন্যায়, "খালি পেটে" এক গেলাস জলপানেও পাকাশয় পরিশোধিত ও সুস্থ হয় জানিবে; কারণ ঐ পানীয় জল পাকাশয়ে উপনীত হইয়া, মাংসপেশীর কার্য্যাবলী দ্বারা তত্রস্থ সমুদয় স্থানে আলোড়িত হইতে থাকে। এই আলোড়নের ফলে, উহার গাত্র পরিস্কৃত ও গ্যাষ্ট্রিক গণ্ড সমূহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রান্ত সকল বদ্ধাবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা হইতে উদ্ভূত রস অবাধে নিঃসৃত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পাকাশয়ের স্নায়ু সকলকে তীক্ষ্ণ এবং তেজবন্ত করিয়া, উহার স্বকর্ত্তব্য পালনেও উত্তেজিত করা ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে জানিবে। পাকাশয়ে থাকা অবস্থাতেই জল আংশিক পরিমাণে শরীরবিধান মধ্যে অবচুষিত (absorbed)
হইয়া যায়,কিন্তু বেশীর ভাগই অন্ত্রমধ্যে সেবিত জলের কার্য্য
পরিচালিত হইয়া পড়ে এবং নিম্ন অন্ত্রে
অবস্থিত বস্তু সকলকে অধিকতর তরল প্রকৃতিবিশিষ্ট ও অন্ত্রের গাত্রসংলগ্ন মাংসপেশী উত্তেজিত করিয়া, স্বভাবকে (nature) সাহায্য করিতে থাকে। এই সাহায্য কার্য্যের জন্যই কোষ্ঠবদ্ধ প্রকৃতি দূরীভূত হইয়া যায়।

প্রাতে উঠিয়া সর্ব্ব প্রথমেই পূর্ণ এক গ্লাস, শুদ্ধ জল পান

দ্বারা পাকাশয় পরিস্কৃতিকরণে যে এত অধিক উপকারীতা বর্ত্তমান আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন। তোমা-দের মধ্যে হয়ত অনেকেই এই সমান্য বিষয় পালন করিবার জন্য, নিজ নিজ চিকিৎসক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছ, কিন্তু তোমরা তাহা পালন করা আবশ্যক বলিয়া মনে কর নাই, অথবা হয়ত অর্দ্ধান্তঃকরণে ২।১ সপ্তাহ মাত্র সখের খাতিরে পালন করিয়া অকর্ত্তব্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছ!

এই স্থানে সহজ ভাষায়, উহার যুক্তিপূর্ণ ঔষধের সহকারিতা প্রয়োজনীয়তা সহ ব্যবস্থাপ্রণালী মুদ্রিত দেখিতে পাইবে; নিয়মিত ভাবে সর্ব্বান্তকরণে ইহা মানিয়া চলিতে থাক, তাহা হইলেই দেখিবে যে তোমার চিকিৎসক ব্যবস্থিত ঔষধ ব্যব-হারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাইতেছ ও যখন তখন আর উহা ব্যবহারেরও আবশ্যক হইবে না। উক্ত ব্যবস্থায় তোমার পাকা-শয় পরিস্কৃত হইয়া ময়লা বর্জ্জিত থাকিবে এবং তাহার ফলস্বরূপ তুমি ও তোমার চিকিৎসক উভয়েই আনন্দিত হইবে। তাই বলি যে, ডিস্পেপ্‌টিক অর্থাৎ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেন কদাচ এই প্রথা অবলম্বনে বিস্মৃত না হয়েন; নিত্য নৈমিত্তিক দন্তধাবণ, হস্তপদাদি প্রক্ষালন ও স্নানাদি যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞাত আছ, সেইরূপ ইহাও তোমার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য বোধে পালন করিয়া যাইবে।

সকলেই প্রায় বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, অজীর্ণতা শুদ্ধ পাকাশয়েরই কোন প্রকার দোষাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। ঐ দোষ যে মুখগহ্বরেরও হইতে পারে এবং পরি-

পাক যন্ত্রাদির সুস্থকার্য্য নির্ব্বাহ করে, শরীরবিধানের সাধারণ স্বাস্থ্যও যে সমধিক প্রয়োজনে আসিয়া থাকে তাহা আমরা দেখিয়াছি। জীর্ণক্রিয়া মুখগহ্বরে আরম্ভিত হইয়া পাকাশয়ে বিশেষরূপে অগ্রগামী হয়, কিন্তু তথায় উহা সম্পূর্ণ হয় না; যকৃত হইতে নিঃসৃত পিত্তরস, ক্লোম্ (pancreas) হইতে স্রাবিত ক্লোম-রস, এবং অন্ত্রের নিজ গণ্ডাদি glands হইতে নিঃসৃত এক প্রকার রস—এই সমুদয় জীর্ণ কারক রস, পাকাশয় হইতে বহির্গত ভুক্ত পদার্থের সহ, অন্ত্রপথে মিলিত হইয়া পড়ে এবং তথায় সকলের একত্র মিলিত শক্তি দ্বারা, জীর্ণকার্য্য সম্পন্ন করে। যখনই উক্ত রসের কোন একটি, পরিমাণে অথবা গুণ-বত্তায় (Quality), পর্য্যাপ্তহীন হইয়া পড়ে, তখনই চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিপালনে সেই সেই যন্ত্র গুলি পুনরায় সুস্থাবস্থায় আনয়ন চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুস্তকের ভূমিকায় আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহা জীর্ণ যন্ত্রাদির স্বচ্ছলতাবলম্বনের উপায় প্রদর্শক মাত্র; ইহার প্রদর্শিত পথে যদি কেহ অবহিতচিত্তে চলিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, ঐ যন্ত্রাদি বিপথগামী হইবার সম্ভা-বনা মোটেই পাইবে না।

জীর্ণক্রিয়া অন্ত্রমধ্যে পিত্তাদির দ্বারা সমাপ্ত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, পাকাশয়টি সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্বাধীন—দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদি যথা—যকৃৎ, ক্লোম (Pancreas), অন্ত্র প্রভৃতি কোনটিই উহার মত অনুগত নহে;

ইহাদের কার্য্যাবলী একটু জটিল। "পাকাশয়ে অজীর্ণতা" প্রস্তাবে পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, যদি তাহা সঠিকরূপে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে ভুক্ত পদার্থ অন্ত্রমধ্যে সুজীর্ণাবস্থায় প্রবেশ করিয়া, তথায় উহার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিতে পারিবে; সুতরাং অজীর্ণজনিত আর কোন প্রকার ক্লেশই পাইতে হইবে না। পাকাশয়ের সুস্থ কার্য্যাদি সম্পাদন উদ্দেশ্যে যে যে নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে উপদেশাদি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সমুদয়ই যকৃৎ ও অন্ত্রের ও পরিপোষক বলিয়া জানিবে। এজন্য পাকাশয়ে জীর্ণকার্য্যের সুফল উৎপাদন জন্য নিয়মাদি প্রতিপালনে, অন্ত্রমধ্যে জীর্ণকার্য্যেরও সহায়তা সাধিত হইতেছে দেখিতে পাইবে। তবেই দেখা যাইতেছে একের কার্য্য অন্যের উপর সমধিক ভাবে নির্ভর করিতেছে, সুতরাং একটির সুব্যবস্থা করিলেই অন্যটির সুব্যবস্থা আপনা হইতেই হইবে। অজীর্ণ রোগীর সংখ্যা আজকাল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিশেষতঃ সহরে (শতকরা ৮০।৯০ জন বলিলেও চলিতে পারে) সুতরাং এই বিষয়ের গুরুত্ববিধায় প্রতিবিধানকল্পে আমরা আবারও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই পুস্তক লিখিত পূর্ব্ববর্ণিত উপদেশাদি প্রতিপালন করা এবং পরে যে সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইবে অর্থাৎ কোন্ ২ আহারীয় বস্তু সহজ পরিপাচ্য এবং কোন্ গুলিই বা দুষ্পাচ্য, কোন্ জিনিস আহার করা আদবেই উচিত নহে, কোন্ দ্রব্য বা সুবিচার পূর্ব্বক (With discretion) আহার করা কর্ত্তব্য (অবশ্য সকল প্রকার খাদ্য এবং পানীয়ই discretion সহ ভোজন

পাকাশয় সহ যকৃতাদির সম্বন্ধ

করা উচিৎ) ইত্যাদি বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিয়া, তদ্রূপ কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই ক্লোম (Pancreas) এবং অন্ত্রের গণ্ডাদি হইতে রসাদি সুভাবে নিঃসৃত হইতে থাকিয়া, সমুদয় জীর্ণ-কার্য্য সুসাধিত হইতে থাকিবে এবং শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যও উত্তম থাকিবে।

জীর্ণকার্য্যে পিত্তের কার্য্য

জীর্ণকার্য্যে পিত্তের অর্থাৎ যকৃৎ হইতে নিঃসৃত—একটি ক্ষুদ্র নলি দিয়া উহা অন্ত্রমধ্যে পতিত হয়—রসের প্রাধান্য বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়; অন্ত্রমধ্যে ভুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ পরিপাক ও পরিপোষণ (assimilation) কার্য্য ইহার উপর সমধিক নির্ভর করিয়া থাকে জানিবে। সে জন্য যকৃতের কার্য্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে অবগত থাকা প্রয়োজন; উহা হইলেই পিত্তেরও স্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্য আপনিই সুভাবে চলিবে। সুতরাং যে প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যকৃৎ গোলমালযুক্ত হইতে না পারে তাহাই এখানে বিবৃত হইতেছে।

যকৃতকে গোলমাল-যুক্ত না হইতে দিবার উপায়

(১) আহারে বসিবার সময় উত্তেজিত অথবা রাগান্বিত অবস্থায় থাকিলে যকৃৎ গোলমাল-যুক্ত হইয়া মন্দ ফল উৎপাদন করিতে পারে; (২) draught অর্থাৎ ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা বাতাসে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকার জন্য বিশেষ ভাবে পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে, রক্ত যকৃৎ মধ্যে ধাবিত হইয়া উহাকে রক্তাধিক্যযুক্ত করিয়া দেয়, এবং পিত্ত নিঃসরণ বিষয়ে বাধা উৎপাদন করে; (৩) আহা-

য়ের সময় কোন প্রকার উত্তেজক পানীয় (Stimulants) সেবন করা কর্ত্তব্য নহে; দুর্ব্বলতা অথবা বার্দ্ধক্য কিংবা কঠিন পরিশ্রম বা রক্তাবর্ত্তনের (circulation) যে কোন প্রকার গোলযোগ উদ্ভবের কারণ জনিতই হউক না কেন, যদি তুমি উহা সেবন করিতে আবশ্যক বোধ কর, তাহা হইলেই যকৃত রক্তাধিক্যযুক্ত হইয়া পিত্তের কার্য্যে গোলযোগ উৎপাদন করিবে। মদ্যাদি অতিরিক্ত পান করিলেই—যে কোন সময়েই হউক না কেন—পাকাশয় ও যকৃতের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় জানিবে, এমন কি উহা হইতে জীবনেরও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। (৪) "পূর্ব্ব এবং উত্তর পূর্ব্ব" বাতাসে অনেক লোকের যকৃত গোলযোগাক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে; যখন এই বাতাস তীব্রভাবে বহিতে থাকে, তখন বহির্ভ্রমণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। শীতকালে সম্ভবমত গরম বস্ত্রাদিতে আবৃত থাকিয়া, অধিক সময় গৃহমধ্যেই কাটান আবশ্যক।

মদের গুণ !!

হস্ত পদাদি শীতল রহিয়াছে দেখিলেই বুঝিবে যে, শরীরের ঐ অঙ্গে রক্ত চলাচল ভালরূপে হইতেছে না। চর্ম্মের মধ্যে রক্ত সদাই সমধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে; উহাতে কাঁটা কাঁটা ভাব দেখা যাইলেই বুঝিবে যে, হয় শীত অথবা ভয় হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমুদয় শরীরই উষ্ণ না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিবে যে শীতল স্থানে রীতিমত রক্ত চলাচল হইতেছে না। সুতরাং শরীরের অন্য কোন অংশে

হস্ত পদাদি শীতল হইলেই জানিবে যকৃত রক্তাধিক্য হইয়াছে।

উহা সঞ্চাত হইয়া রক্তের আধিক্য জন্মাইতেছে। এইরূপে শরীরের অন্যাংশের অচলিত রক্ত ধাবিত হইয়া, শতকরা ৯০ স্থলে যকৃতেই সঞ্চাত হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলস্বরূপ যকৃত রক্তাধিক্য যুক্ত, পিত্তের স্বাভাবিক নিঃসরণ বাধা প্রাপ্ত ও পিত্তিয়ভাব (biliousness) এবং অজীর্ণতা দেখা যায়। মুখ—গহ্বর ও পাকযন্ত্রের পরিপাকক্রিয়ার ন্যায়, এই অন্ত্রপথের পরিপাক কার্য্যও, অংশত রাসায়নিক ও অংশত মেক্যানিক্যাল্ উপায়ে বিভক্ত জানিবে। পিত্ত, ক্লোম এবং অন্ত্রের নিজ গাত্র নিঃসৃত রসাদির মিলিতশক্তি দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পরিপাচিত এবং এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে, সহজেই শরীরে অবচুষিত (absorbed) হইয়া পরিপোষণ যোগ্য হইয়া থাকে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা সাধিত হয়, তাহাই অন্ত্রের রাসায়নিক পরিপাক উপায় বলিয়া জানিবে।

অন্ত্রমধ্যে পরিপাকের রাসায়নিক কার্য্য

পিত্তের নিঃসরণ ক্রিয়া, পরিমাণে—অতি স্বল্পও নহে অথবা অতি অধিকও নহে—ও গুণবত্তায় পর্য্যাপ্ত করাইতে হইলে, উপরে যে উপদেশাদি দেওয়া হইয়াছে, (অর্থাৎ কোন ক্রমেই যকৃতের কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া) তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে ; ইহা করিলেই দেখিবে যে যকৃতের কোন প্রকার গোলযোগ হেতু আর অপরিপাক জন্মিতে পারিবে না। ক্লোম ও অন্ত্রের নিঃসৃত রস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও উত্তম প্রকৃতির (Quality) বজায় রাখিতে হইলে, মুখগহ্বর ও পাকাশয়ের পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপে যাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা করিলেই চলিবে।

অন্ত্রমধ্যে পরিপাক কার্য্যের মেক্যানিক্যাল্ উপায় দ্বারা ভুক্ত পদার্থ ধীরে ধীরে, নিয়মিত ভাবে এবং নিঃশব্দে ২৫ পঁচিশ ফিট লম্বা অন্ত্রপথ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ ভুক্ত পদার্থ যদি অতি সত্বরে পরিচালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে উপযুক্ত রূপে পরিপাচিত এবং পরিপোষিত হইবার পূর্ব্বেই, উহার কতক অংশ শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়ে; সুতরাং উহার পরিণাম স্বরূপ ঐ ব্যক্তি পাতলা (thin) এবং মন্দরূপে পরিপুষ্ট (Mal-nutrition) হইতে থাকে। অথবা যদি ঐ ভুক্ত পদার্থ অন্ত্রমধ্যে অধিকক্ষণ যাবৎ রহিয়া যায়, তাহা হইলে উহা তথায় পচিয়া (decomp sed) উঠে ও বিষময় পদার্থ সকল সৃজন করে। এই প্রকারে উদ্ভূত কোষ্ঠবদ্ধতাই অপরিপাকের এবং স্বাস্থ্যহানির একটি প্রধান কারণ জানিয়া রাখিবে।

অন্ত্রমধ্যে পরিপাকের মেক্যানিক্যাল উপায়

অন্ত্রপথ দিয়া যদি ভুক্ত পদার্থ অতি সত্বরে অপসারিত হইয়া যায়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন; সেই সময়ে জল সাগু, জল বার্লি অথবা উহার সহিত সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করা প্রয়োজন। যে সকল দ্রব্য সহজে হজম হয় না বলিয়া তোমার জানা আছে, তাহা এই সময় পরিবর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ উহা অন্ত্রের উপদাহ (Irritation)—উদরাময়—উৎপাদন করাইয়া, তন্মধ্য হইতে যত সত্বর সম্ভব বহিঃনিঃসৃত

উদরাময়

হইতে থাকে ; যতক্ষণ উহার সহিত সমুদয় ভুক্ত পদার্থ বহির্গত হইয়া না যায়, ততক্ষণ উহা আপনার কার্য্য সাধনে বিরত হয় না। তবেই দেখ যে, কোন একটি অপরিপাচ্য বস্তু ভোজন করার জন্য, তুমি অন্য যাহা কিছুও খাইয়াছ তৎসমুদয়ই অপরিপাচিত অবস্থায় শরীর হইতে বহির্গত হইয়া গেল। অতএব ঐ প্রকার কোন দ্রব্যই আহার করা উচিৎ নহে। এখানে একটি কথা হইতেছে কেমন করিয়া জানিতে পারা যাইবে যে, ইহা হজম হইবে, উহা হইবে না! পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের এই বিষয়ক পুস্তক পাঠে আমরা বিশেষ লাভবান ইহাতে হইতে পারি না ; কারণ এক পক্ষে চিকিৎসা গ্রন্থ মাত্রেই শুদ্ধ লিখিত থাকে যে, সহজ পরিপাচ্য আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ
ও সাদাসিধা আহার করিবে, কিংবা হয়ত পাশ্চাত্য সুলভ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ থাকে। আমাদের দেশের আহার ও ব্যবহার সমুদয়ই পাশ্চাত্য হইতে বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের আহার্য্য দ্রব্যাদির গুণাগুণ অবগত হইয়া, আমরা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ভোজন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারি না। এই সমুদয় বিষয় জানিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় মতে "দ্রব্যগুণ" সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার ; কিন্তু আমরা তাহার দিকে লক্ষ্যও করি না।! আমাদের প্রতি গৃহেই কিঞ্চিদধিক ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও প্রবীণা গৃহিনীগণ এতৎ সম্বন্ধে, অন্ততঃ সাধারণ ভোজ্য বস্তু আদির বিষয়ে, সম্যক জ্ঞানবিশিষ্টা ছিলেন ; কিন্তু এই গৃহিনীগণই "নাটক নভেলাদি" পাঠ অথবা "উল বুনিতে" পারিতেন না বলিয়া, আধুনিক সমাজে অশিক্ষিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া

সেকাল ও একাল

থাকেন!! আজকাল যেমন আমরা একদেশীয় (one-sided) শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজস্ব রত্নাদি অন্বেষণ না করিয়াই, উহা যে আমাদের কখনও ছিল না বলিতে শিখিয়াছি— সেইরূপ আমাদের ছাঁচে ঢালা, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণও, পূর্ব্বতন প্রবীণাদের সংসারজ্ঞান লাভে বঞ্চিতা হইয়াও, তাঁহারা যে কিছুই জানিতেন না এইটিই মনে করিয়া থাকেন।!! আজ যদি আমাদের প্রতি ঘরে পূর্ব্বের ন্যায় প্রবীণাগণের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ঘরে ঘরে এত রোগ যাতনা সহিতে হইত না!! প্রতি গৃহেই এখন ঐ প্রাচীনাগণের স্থান আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; চিকিৎসক যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহাই পথ্যাপথ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে—কিন্তু কয়জন চিকিৎসক এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থে, একরূপ উহার বিশেষ উল্লেখ নাই বলিলেও চলে (বর্ত্তমানে খাদ্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাহা আমাদের দেশোপযোগী নহে, বলিয়া আমাদের এতকথা বলিবার উদ্যোগ জানিবে) সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে ইহার বিশেষ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া, নিত্য ব্যবহার্য্য কোন্ কোন্ দ্রব্য আমাদিগের সহজ পরিপাচ্য অথবা দুষ্পাচ্য, তাহা দেখাইয়া দিব। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, সকল রকম শাক সবজী, ফলাদি (বিশেষতঃ কুল, নারিকেল ইত্যাদি),

জাড়িত দ্রব্যাদি, গুড়, চর্ব্বি, মাংস, রুটি প্রভৃতি সাধারণ আহার্য্য দ্রব্যাদি অধিক ভোজন করিলে, মন্দকার্য্যকর পরিপাক ক্রিয়া-সম্পন্ন লোকের উদরাময় উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে ভুক্ত পদার্থ অন্ত্র মধ্যে অধিকক্ষণ যাবৎ রহিয়া গেলে [অর্থাৎ যদি তুমি কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু ক্লেশ পাইতে থাক, যাহা অনেকেরই সাধারণ অভিযোগ] উহা দূরীকরণ জন্য নানাপ্রকার উপায় আমরা দেখাইতে পারি। এই কোষ্ঠ-বদ্ধতা অপরিপাকের একটি সাধারণ কারণ এবং লোকসমাজে এতই সাধারণ ভাবে লক্ষিত হয় যে, আজকাল উহা একটি প্রধান উপসর্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং আমরা এই ও বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করায় এখানে আর উহার কোন প্রতিকার ব্যবস্থা লিখিত হইল না।

কোষ্ঠবদ্ধতা

চতুর্থ অধ্যায়।

পরিপাক ক্রিয়া ও অবচুষণের সংক্ষিপ্ত সার।

যাহা দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্যের অধিকাংশ ভাগ রাসায়নিক, প্রাকৃতিক এবং জৈবনিক কার্য্যানুসারে, নূতন আকৃতিতে অবস্থান্তরিত হইয়া, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং শরীরের প্রত্যেক টিসুকে সংশোধিত ও নবভাব ধারণ করাইয়া, উহার সংরক্ষণোপযোগী উত্তাপ আনীত হয় তাহাই পরিপাক ক্রিয়া।

আহার সময়ে খাদ্যবস্তু দন্তদ্বারা চর্ব্বিত ও লালারসের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ক্রমশঃ ইসোফেগাস্ (অন্ননলী), পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে বিচরণ করিবার সময়, ঐ সমুদয় নলপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (mucous-membrane) এপিথেলিয়ম কোষ ও উহাদের স্ব স্ব গ্রন্থি (glands) হইতে নিঃসৃত নানাবিধ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। পরিশেষে এই মিশ্রণ পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে (directly) শিরা দ্বারা চালিত হয় অথবা পরোক্ষভাবে (indirectly) ল্যাক্টিয়াল নলী সমুদয় দ্বারা অবচুষিত হইয়া পড়ে। সর্ব্বশেষে অল্প অসাড়-পদার্থ, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিভিন্ন নির্গমনের পথ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

এই পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিবার জন্য, ফারমেণ্ট (ferments) নামক এক শ্রেণীর পদার্থ আব-

শুকে আসিতে দেখা যায়। অন্নবহানলী মধ্যে পতিত, প্রায় সমুদয় প্রকার নিঃস্রবের (Secretion) মধ্যেই একটি করিয়া ফারমেণ্ট দৃষ্ট হয়, উহা ভক্ষিত খাদ্য পদার্থকে বিগলিত করিতে বিশেষ প্রকারে ফারমেণ্টস্ সাহায্য করিয়া থাকে। এই ফারমেণ্ট সকল, জলে দ্রবণীয় এবং জান্তব মেম্ব্রেনের ভিতর দিয়া শোষিত হইয়া যায়—যদিচ সহজে নহে। ৭০ ডিগ্রী সেণ্টি (১৬০ ফা) উত্তাপে ইহারা inert অকার্য্যকরী হয় (অর্থাৎ তখন উহাদের আর কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না) এবং তীব্র সুরাসারে অধঃস্থ (precipitate) হইয়া যায়।

মুখগহ্বরে :—খাদ্য পদার্থ চূর্ণীকৃত হইয়া লালারসের সহিত মিশ্রিত ও কোমল আকার প্রাপ্ত হয় ; শ্বেতসারের (starch) কতকাংশ মল্‌টোজ (maltose) নামক শর্করায় পরিবর্ত্তিত এবং ক্ষারধর্ম্মাক্রান্ত (alkaline) হইয়া যায়। চর্ব্বি এবং প্রোটিড্‌স্ (নাইট্রোজেনস্ পদার্থ) জাতীয় পদার্থের কোন অবস্থান্তর হয় না।

পাকস্থলীতে :— ভক্ষ্যদ্রব্য পতিত হইয়া অম্লযুক্ত হয়, শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের শর্করায় পরিণতি ক্রিয়া লোপ পায়, চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের সংযোজক তন্তু (connective tissue) গলিয়া যায় এবং প্রকৃত চর্ব্বি সকল পৃথক্ হইয়া পড়ে। প্রোটিড্‌স্ বিগলিত হইয়া পেপ্‌টোন (peptone) গঠন করে ; আল্‌বুমিনাস্ (albuminous) খাদ্য পদার্থের অধিকাংশ গলিয়া যায় এবং সমুদয় পেপ্‌টোন, তরল চর্ব্বি এবং শ্বেতসারীয় পদার্থ

একত্রে মিশ্রিত হইয়া কাইম (chyme) নামে পরিচিত হয়। এই কাইম পাইলোরসের (pylorus) মুখ দিয়া অন্ত্রমধ্যে পতিত হয়।

অন্ত্রমধ্যে :—পিত্ত, ক্লোম এবং আন্ত্রিক (intestinal) রসের সহিত কাইম্ মিশ্রিত হইয়া ক্ষারধর্ম্মাক্রান্ত হয়; শ্বেতসারীয় পদার্থের শর্করায় পরিণতি কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়; চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ বিগলিত (emulsifying) হইতে আরম্ভ হয় এবং অবিগলিত প্রোটিড্ পদার্থ সমুদয় পেপ্‌টোনে পরিণত হইতে থাকে। এক্ষণে এই মিশ্রগঠিত পদার্থকে আর কাইম না বলিয়া কাইল (chyle) বলা হয়। পেপ্‌টোন এবং লাবণিক পদার্থের সহজ ব্যাপ্ত (diffusible) অংশ সমুদয়, পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে এবং সূক্ষ্ম বিভাজ্য অবস্থায় চর্ব্বি ল্যাক্‌টিয়াল্ (lactial) নলির ভিতর শোষিত বা সঞ্চালিত হইয়া যায়। বৃহদন্ত্রে তরল কাইল্ ক্রমশঃ অতরলে পরিণত হয় এবং বিবিধ ফার্ম্মেন্‌টেটিভ্ (fermentative) অর্থাৎ ফার্ম্মেণ্ট ঘটিত পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা অম্লযুক্ত হয় ও মল পদার্থের গন্ধ প্রাপ্ত হয়; পরিশেষে মলদ্বার দিয়া সময়ে বহিঃনিসৃত হইয়া পড়ে।

পাচক রস ও ফারমেণ্ট সমূহের তালিকা।

পাচক রসের নাম	ফার্মেণ্টস্ এর নাম	ক্রিয়া
লালারস	টায়ালিন অথবা ডায়াষ্টেজ্	শ্বেতসারকে ডেক্স্ট্রিন ও শর্করায় পরিণত করে।
পাকাশয় রস	(ক) পেপ্‌সিন (খ) ছানাকারক ফারমেণ্ট (রানিন্)	(ক) অম্লরসে প্রোটিডকে এলবুমোজ পেপ্‌টোন করে। (খ) দুগ্ধের কেসিন্‌কে ছানাযুক্ত করে
ক্লোমরস	(ক) ট্রিপ্‌সিন (খ) ছানাকারক ফারমেণ্ট (গ) ডায়াষ্টেজ (ঘ) বিগলন কারক ফার্মেণ্ট	(ক) ক্ষাররসে প্রোটিডকে পেপ্‌টোন করে। (খ) দুগ্ধের কেসিনকে ছানা করে। (গ) শ্বেতসারকে শর্করা করে। (ঘ) চর্ব্বিকে বিগলন ও অংশত ছানাযুক্ত করে।
আন্ত্রিক রস	ইন্‌ভারট্রিন্	"কেন" নামক শর্করাকে ইন্‌ভার্ট নামক শর্করায় পরিণত করে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, এলিমেন্টারী নলপথ হইতে, ভক্ষিত দ্রব্যের অণ্ডলালীয়, চর্ব্বিজাতীয় এবং শর্করাজাতীয় পদার্থ সকল পোর্টাল শিরা ও ল্যাকৃটিয়াল নলীগণ দ্বারা অবচুষিত হইয়া,শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু উহা কি শরীর মধ্যেই থাকিয়া যায় ? না। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, উহারা আপন আপন কার্য্য সম্পাদনের পর, প্রধানতঃ কিড্নী (kidney) ও ফুস্ফুস্ দিয়া, ইউরিয়া (urea), লাবণিক পদার্থ এবং CO_2 কার্ব্বনিক আসিড গ্যাসরূপে বহির্গত হইয়া যায়। উক্ত পদার্থ সকলের শরীরাভ্যন্তরে গমন ও তথা হইতে বহির্গমন কার্য্যই পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, কিন্তু উহা তথায় থাকিয়া কি প্রকারে যে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করে, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য আজও অবগত হইতে পারা যায় নাই।

পোর্টাল শিরা ও ল্যাকৃটিয়াল নলী কি পরিমাণে ঐ সমুদয় দ্রব্যাদি অবচুষণ করে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

পোর্টাল শিরায় অবচুষিত	পেপ্টোন	(অধিকাংশ)
	শর্করা	”
	লাবণিক পদার্থ	”
	সাবান	”
	জল	”
	চর্ব্বি	(অতি স্বল্প)

ল্যাকটিয়াল্ দ্বারা অবচুষিত	চর্ব্বি	(অধিকাংশ)
	সাবান	(স্বল্প)
	পেপ্‌টোন	„
	শর্করা	(অতি স্বল্প)
	লাবণিক পদার্থ	„
	জল	(স্বল্প)

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য ও পানীয় পদার্থ বিচার।

শস্যাদি, শাকসব্জী এবং ফল মূল।

(GRAINS AND GREENS)

যে দ্রব্য আহার করিলে সত্বর জীর্ণ হইয়া যায়, তাহাই অজীর্ণ রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য ; সুতরাং কোন্ কোন্ আহার্য্য দ্রব্য—পানীয় অথবা ভোজ্য—সহজ পরিপাচ্য তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালীন ভোজন এবং প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক জলযোগের সময়, কি কি দ্রব্য আহার করা প্রয়োজন তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই, আমাদের নিত্য আহার্য্য দ্রব্যাদির পরিপাক সম্বন্ধীয় গুণাগুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে

নিত্য আহার্য্য দ্রব্যাদির গুণাগুণ।

করি। এই সমুদয় দ্রব্যাদির আলোচনায় সর্ব্ব প্রথমেই দুগ্ধের কথা আমাদের মনে পড়ে; ইহা পরিপোষণ (nutrition) পক্ষে পূর্ণ খাদ্যের সমগুণ বিশিষ্ট অথবা, কোন কোন স্থলে, তাহারও অধিক বলকারক ও পরিপোষক বলিয়া গণ্য হইলেও, উহা পানীয়ের অন্তর্গত হওয়ায় আমরা তাহার সহিতই উহার আলোচনা করিব। দুগ্ধের নিম্নেই আমাদের পক্ষে চাউল (অন্ন) বিশেষ বলকারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও অতি অল্প সময়ে পরিপোষিত হইয়া যায় বলিয়া কথিত। পৃথিবীর যাবতীয় অধিবাসীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রাণীর ইহাই প্রধান আহার; "অন্নং বৈ প্রাণীণাং প্রাণা ইতি শ্রুতি নিদেশতঃ" অর্থাৎ - অন্নই প্রাণীগণের প্রাণ, ইহা বেদে কথিত হইয়াছে; সুতরাং বিধিপূর্ব্বক—দোষবর্জ্জিত ও বলবর্দ্ধক অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। অন্ন হইতেই রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; অন্নই বল, অন্নই ওজঃ এবং অন্নই মন জানিবে। চাউলের মধ্যে শ্বেতসারের (starch) অংশই অধিক; ছানাজাতীয়, মাখনজাতীয়, এবং লবণজাতীয় উপাদান অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। শ্বেতসারের অংশ অধিক পরিমাণে থাকায়, ইহাতে শর্করাজাতীয় উপাদানই খুব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

অন্ন ও চাউল

আমাদের দেশে এই চাউল প্রধানতঃ দুই প্রকারে ব্যবহার

হইয়া থাকে (১) আতপ (২) সিদ্ধ; ধান্য হইতে চাউল বাহির করিবার সময়, যাহা সিদ্ধ করিয়া লইয়া বাহির করিতে হয়, তাহাই সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ অবস্থা হইতে যাহা বাহির করা হয় তাহাই আতপ নামে বিদিত। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ, গুরু, রুক্ষ ও একটু অধিক বলকারক; সুতরাং পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়। কতকটা এই জন্যই আমাদের দেশের বিধবা, হবিষ্যাশী অথবা একাহারী-গণ এই আতপ চাউলের অন্নই ভোজন করিয়া থাকেন; সিদ্ধ চাউল অন্য পক্ষে, রসবর্দ্ধক, লঘু এবং সকল প্রকার খাদ্য-দ্রব্যাপেক্ষা স্বল্প সময়ে হজম হইয়া যায়, এমন কি সাগু, বার্লি বা এরারোটও হজম হইতে, ইহার অপেক্ষা অধিক সময় লাগে দেখা গিয়াছে। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, রোগে ইহা পথ্য না দিয়া সাগু বার্লি দেওয়া হয় কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা রসবর্দ্ধক এবং আমাদিগের দেশে ইহা প্রধান খাদ্য—দুই বেলারই—সুতরাং অসুস্থাবস্থায় উহা আমাদিগের অনিষ্টকারক। শরীর অসুস্থ হইলে, যাহা নিত্য আহার করা যায়, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া, হয় লঙ্ঘণ অথবা অন্য কোন লঘু পথ্য আহার করা প্রয়োজন। ভাতের ফেণ, যাহা আমরা ফেলিয়া দেই, অতি-শয় বলকারক; কারণ চাউলের কাথই, (অর্থাৎ সিদ্ধ করিয়া উহার ভিতরের রস পদার্থ যাহা নির্গত হয়) উহার পুষ্টিকর পদার্থ। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ক্লাইব যখন দাক্ষিণাত্যের আর্কট নগরে

সিদ্ধ ও আতপ

ভাতের ফেণ

অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার রসদ ফুরাইয়া আসায় এদেশী সিপাহীগণ শুদ্ধ ভাতের ফেণ খাইয়া, গোরা সৈন্যগণকে অন্নগুলি ভোজন করিতে দিত; ঐ ভাতের ফেণ খাইয়াই তাহারা জীবনধারণে ও এমন কি ছোট খাট যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমাদের মনে আছে বাল্যকালে শুদ্ধ ফেণা ফেণা ভাত অর্থাৎ ফেণ সমেত ভাত খাইয়াই, আমরা মানুষ হইয়াছিলাম; অধুনাও পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় প্রতিঘরেই, ঐরূপ ফেণ সমেত ভাত খাওয়ার অভ্যাস বর্ত্তমান আছে দেখা যায়। আমাদের এই দক্ষিণ বঙ্গের লোকের ন্যায় ঐ দেশবাসীগণ, দোকানের তৈয়ারী "জলখাবার" রূপ বিষ, পয়সা দিয়া কিনিয়া ডিস্পেপ্‌সিয়া অথবা অজীর্ণতা পোষণ করেন না!

একটু লবণ সংযোগে সফেণ ভাত, খাইতে অতিশয় উপাদেয় লাগে এবং কোন প্রকার তরকারী না হইলেও, শুদ্ধ দুটি একটি "ভাতে পোড়া" দিয়াও উহা খাইতে পারা যায়। পান্তা অর্থাৎ বাসি ভাতের জল, বড়ই শীতল, মুখরোচক এবং শ্রান্তিহারক; কিঞ্চিৎ লেবু ও লবণ সহ সেবনে, প্রখর গ্রীষ্মের সময় প্রকৃতই ইহা আরাম দায়ক। অনভ্যস্তগণের
কিন্তু উহা প্রতিনিয়ত খাওয়া উচিৎ নহে। ভিজা ভাতের জল
টাট্‌কা ভিজা ভাত অর্থাৎ ৩।৪ ঘণ্টার
হইলেও তাহা বিশেষ উপকারক; অগ্নিমান্দ্য অথবা কোন কারণ বশতঃ "পেট গরম" হইয়া ৩।৪ বার অজীর্ণ দাস্ত হওয়ার পরে (দাস্ত বিশেষ আশঙ্কাজনক যদি না হয়) উদর খালি বোধ করিলে, লেবুর রসের সহিত ইহা সেবনে ঔষধের কার্য্য করে জানিবে।

নূতন ও পুরাতন চাউল

চাউলে আবার নূতন ও পুরাতন ভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে; নূতন ধান্ত স্বাদু, গুরু ও কফজনক। এক বৎসরের পুরাতন চাউল, লঘু ও পথ্য—এই চাউলের গুরুত্ব নাশ হয় বটে কিন্তু বীর্য্য নষ্ট হয় না। এই জন্ত রোগ হইতে উঠার পর, এবং অজীর্ণ রোগীর পক্ষে, নূতন অপেক্ষা পূরাতন চাউলই প্রশস্ত। যে সকল

খই চিড়া ও মুড়ি

ধান্তের চাউল হয়, তাহাই গোটা অবস্থায় ভাজিলে ফুটিয়া খই প্রস্তুত হয়; ইহা মধুর, শীতল, লঘু, বলকারক এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক। সুতরাং রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক; দুগ্ধের সহ গরম গরম ইহা সেবনে দাস্তও বেশ পরিস্কার থাকে; আমাদের মতে অজীর্ণ রোগীকে এই প্রকার "দুধ-খই" সেবন করিতে দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা। পিত্তপ্রধান হওয়াতেই প্রায় স্থলে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয় দেখা গিয়াছে এবং ইহার গুণও পিত্তনাশক, কাজেই অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা আহার ও ঔষধ।

ধান্ত জলে ভিজাইয়া এরূপে ভাজিয়া লওয়া দরকার যে উহা যেন ফুটিয়া না যায়, তাহার পর উহা কুটিয়া লইলেই চিঁড়া প্রস্তুত হয়; ইহা গুরু, বলকর ও মলরোধক। দুগ্ধের সহিত সেবনে ইহা অধিক পুষ্টিকর এবং বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে; অধিক সময় যাবৎ (১॥ অথবা ২ ঘণ্টা) জলে ভিজাইয়া রাখিলে, ইহা সেবনে শরীর শীতল ও উদরের গরম ভাব নষ্ট

হইতে দেখা গিয়াছে। আমরা আমাশয় রোগী মাত্রকেই এই প্রকার জলে ভিজান চিড়া, কিঞ্চিৎ লেবুর রস ও চিনি সহ খাইতে দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। অজীর্ণরোগীও যদি পর্য্যায় ক্রমে, খই এবং ইহা সেবন করিতে পারেন, আমাদের বিশ্বাস সহজেই তাহা হইলে রোগ বিদূরীত হইতে পারে। চাউল ভাজিয়া মুড়ি তৈয়ার করিতে হয়; খই এর ন্যায় ইহাও লঘু বটে, কিন্তু খই অপেক্ষাকৃত অধিক লঘু; তৈল লবণ ও লঙ্কা সংযোগে মুড়ি অতিশয় মুখরোচক হয় কিন্তু অতিশয় গুরুপাক হইয়া থাকে, এজন্য অজীর্ণ রোগাক্রান্তগণ ইহা এইভাবে কদাচ যেন সেবন না করেন। ডিস্পেপটিকগণ যদি বাজারের চলিত খাবার দ্রব্যাদি না খাইয়া, শুদ্ধ মুড়ি খাওয়া অভ্যাস করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অজীর্ণ রোগীর সংখ্যা মোটের উপর দুই তৃতীয়াংশ কম দেখা যাইতে পারে। মুড়ির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহার ভিজান জল হিক্কায় বিশেষ উপকারী।

চাউলের পরই আটা বা ময়দা আমাদের নিত্য আহার্য্যের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে। ময়দা ও আটা এই বঙ্গদেশে ইহা প্রধান খাদ্য না হইলেও, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম এবং বিহার প্রদেশবাসীগণের ইহাই প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে দেখা যায়। আজকাল আমাদের দেশেও—বিশেষতঃ সহরে—ইহা প্রায় সকলেরই একবেলাকার খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে দুইবেলা ভাত না খাইয়া, এক বেলা ভাত এবং অন্য বেলায় অর্থাৎ

রাত্রিতে আটা অথবা ময়দা দ্বারা প্রস্তুত রুটি অথবা লুচি বা পরোটা প্রভৃতি খাইয়া থাকেন। ময়দা ও আটার বা যবের ছাতুতে, ছানাজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান অধিক, কিন্তু মাখনজাতীয় পদার্থ অল্প থাকে। প্রধানতঃ আটা বা ময়দার গুণ এই যে, ইহা গুরু, রুক্ষ, কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং তৃষ্ণা উৎপাদক। ইহা দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণের সময়, যেমন পরিমাণে ঘৃত সংযোগ করা যাইবে, সেই পরিমাণে ইহা আরও গুরু হইবে। দেখা গিয়াছে যে, অজীর্ণরোগী মাত্রেরই, ময়দা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি সহজে হজম হয় না, উপরন্তু উহাতে অম্ল উৎপাদন করে—কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে কাহারও পক্ষে রুটি সহ্য হয় এবং কাহারও বা লুচি সহ্য হয়। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মধ্যে [illegible] হইয়া সহজপাচ্য হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা বা বাসি লুচি অপেক্ষা [illegible] সুপাচ্য। সাধারণতঃ তাতই (পুরাতন চাউলের [illegible]

এই রোগে পথ্য ব্যবহৃত হও[illegible]

এখন দেখা যাউক আটা ও ময়দার [illegible] কোন প্রভেদ আছে কিনা? প্রধানতঃ দেখিতে গেলে উহা একই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবহারে উহাদের পরস্পর গুণের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। আটা বাহ্যতঃ ময়দা অপেক্ষা একটু মোটা ও ময়লা দেখায়, কিন্তু উহা বড়ই মোলায়েম

এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। এই আটা যদি আবার হস্ত দ্বারা ঝাঁতায় ভাজা হয়, তাহা হইলে অধিক গুণবিশিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাবান্বিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য যে (যদি রুটি ইত্যাদি খাওয়াই অভ্যাস হয়). এই ঝাঁতায় ভাজা আটা ব্যবহার করা।

ঝাঁতায় ভাজা

কলে প্রস্তুত সাদা ধব্‌ধবে ময়দা ছাড়িয়া, ইহা অপেক্ষাকৃত ময়লা বলিয়া হয়ত আপনার প্রথমে খাইতে অনিচ্ছা হইবে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ১০।১৫ দিনের মধ্যেই ইহার উপকারীতা স্বয়ং অনুভব করিলে আর ইহার উপর ঘৃণা থাকিবে না। অনেকে কোষ্ঠবদ্ধতার বিদূরণ জন্য, গমের ভূষির রুটি প্রস্তুত করিয়া, আহার করিয়া থাকেন দেখা গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই হয়ত অবগত নহেন যে, "পালোট" বলিয়া ময়দা হইতেই উৎপন্ন এক প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়। ময়দার কলওয়ালাগণের নিকট হইতে উহা লইতে পারিলেই ভাল হয়, নতুবা বাজারে হয়ত ঠিক সে জিনিষ পাওয়া না যাইতেও পারে। এই পালোট ও ঝাঁতায় ভাজা আটা—সম পরিমাণ লইয়া, তাহার দ্বারা প্রস্তুত রুটি অতিশয় মোলায়েম এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বলিয়া জানিবে।

আটা ও কোষ্ঠবদ্ধতা

আমরা শুধুই এদেশী আহারীয় দ্রব্যাদির কথা বলিয়া যাইতেছি, কিন্তু আজকাল সময় উপযোগী যে সকল বিলাতী খাদ্যদ্রব্য চলতি হইয়া গিয়াছে, যথা সম্ভব তাহারও আলোচনা

পাঁউরুটি ও কেক

করা কর্ত্তব্য বলিয়া এখানে তাহার অবতারণা করা গেল। বিলাতী সমুদয় খাদ্য দ্রব্যাদিই প্রায় ময়দা হইতে প্রস্তুত এবং আমাদের অন্ন যেমন প্রধান খাদ্যাহার, সেইরূপ এই ময়দাই তাহাদিগের প্রধাণ খাদ্য দ্রব্য। বিলাতী সমুদয় খাদ্যদ্রব্যাদি প্রায়ই ডিম্বাদি ও চর্ব্বি সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাজেই তাহা সমুদয়ই অতিশয় গুরুপাক জানিবে। পাউরোটি, টাট্‌কা অপেক্ষা বাসি হইলেই তাহা সহজে পরিপাক হয়। এই রোটি যত হাল্‌কা এবং (porous) স্বচ্ছিদ্র হইবে, ততই ভাল হয়। রোটি প্রস্তুত সময় যাহাতে (fermentation) গাঁজলান উপযুক্ত মত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই প্রকারে প্রস্তুত পাঁউরোটি বেশ সহজে হজম হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেশীয় পাঁউরোটি প্রস্তুতকারকগণ, অশিক্ষিত হওয়ায়, এদিকে তেমন দৃষ্টি রাখে না, সুতরাং তাহাদের দোকানের রোটি বিশ্বাস করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রোগীর জন্য বিলাতী দোকানের দ্রব্য লইয়া আসাই

কর্ত্তব্য। যদি তোমার পাঁউরোটি উত্তম **টোষ্ট করা রোটি**

প্রকারের বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে উহা টোষ্ট toast অর্থাৎ অগ্নিতে, ঘৃত বা মাখন মাখাইয়া, উত্তপ্ত করিয়া লইবে এবং ধীরে ধীরে ভোজন করিবে। বাসি ও টোষ্ট করা রোটি উভয়ই শুষ্ক, সুতরাং একটু অধিক সময় চর্ব্বণ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে বলিয়া, উহা পাকাশয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই লালাস্রাবের সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই জন্যই (পর্য্যাপ্ত সময় লালাস্রাব সহ সংস্পৃষ্ট থাকায়) উহা সহজে তথায় পরিপাক

হইবার সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই বিলাতী খাদ্যাদির অতিরিক্ত পক্ষপাতী, তাঁহা- দিগের উদ্দেশে এখানে আমরা ২।১টি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সমুদয় দ্রব্যাদি অতিশয় গুরুপাক এবং স্বতন্ত্রভাবে অথবা মাখনাদি সংযোগেও উহারা নিজে নিজে প্রধান আহার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উহাদের দ্বারা কার্ব্বণ (carbon) পর্য্যাপ্তরূপে আমাদের শরীর মধ্যে গৃহীত হয়, কিন্তু নাইট্রোজেন (nitrogen) অতি সামান্য মাত্রাতেই পাওয়া যায় ; অথচ এই দুইটিই পর্য্যাপ্ত পাওয়া আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন *। ইহাদের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে "নাইট্রোজেন" লইতে হইলে, অতিরিক্ত মাত্রায় ঐ সব খাদ্যাদি ভোজন করিতে হয়, সুতরাং কার্ব্বণও অত্যধিক মাত্রায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই প্রকারে প্রত্যহ কার্ব্বোহাই- ড্রেট্স্ (carbohydrates) ভোজন করিতে হইলে (কেক্ প্রভৃতি দ্বারা) লালাস্রাবীয় পরিপাক শক্তির উপর বড়ই চাপ দেওয়া হয় এবং ঐ খাদ্যাদির গুরুত্ব ও গাঁজ্লান (fermen- tation) হইবার প্রবণতা জন্য, পাকাশয়কেও অতিরিক্ত ভারে ত করা হয়। এই সব খাদ্যাদি কালে ভদ্রে ২।১ দিন সেবনে সুস্থব্যক্তির পক্ষে কোনই অপকার দর্শে না, কিন্তু যদি প্রত্যহ খাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও অর্থাৎ সুস্থব্যক্তি- গণও অচিরে ইহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যখন

সাবধানতা

* কার্ব্বণ, নাইট্রোজেন, দানাজাতীয়, মাখনজাতীয় ইত্যাদি রাসায়নিক খাদ্য উপাদান সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে (অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে) দ্রষ্টব্য।

সুস্থশরীরীগণেরই এই পরিনাম, ... অজীর্ণাক্রান্তগণের পক্ষে ঐ সকল যে প্রকৃতই খাদ্যাকারে বিষ, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবেনা।

আটা বা ময়দা অপেক্ষা সুজি স্বল্প ভারযুক্ত এবং সমান বলকারক বটে, কিন্তু ইহা অম্ল উৎপাদক; সেই জন্ত ডিস্পেপ্‌টিকগণের পক্ষে ইহা সুজি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি তেমন উপকারক নহে। বলা বাহুল্য যে ইহা দ্বারা তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্যাদি সমুদয়ই ঘৃত সংযুক্ত, সুতরাং উহা যে গুরুভার হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! তবে অধিক সময় যাবৎ জলে সুজি ভিজাইয়া রাখিয়া, তৎপরে উহা দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলে অপেক্ষাকৃত সহজ পরিপাচ্য হইয়া থাকে। পেটের অসুখাদি না থাকিলে, কোন কোন পীড়ার আরোগ্যাবস্থায়, শুদ্ধমাত্র জলে সিদ্ধ করিয়া অথবা ইহা দ্বারা রুটি তৈয়ার করাইয়া, পথ্যরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জলখাবারের জন্ত, (প্রাতঃকালীন বা বৈকালিক) ইহা দ্বারা প্রস্তুত মোহনভোগাদি (সক্ষম লোকদিগের পক্ষে) বড়ই মুখপ্রিয় এবং উপাদেয় বলিয়া জানিবে। যাহাদিগের অজীর্ণতাদোষ নাই, অথচ স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে, তাহাদিগকে আমরা এই উপদেশ দিতে পারি যে, বাজারে প্রস্তুত মুখরোচক অখাদ্যাদি সেবন করিয়া, নানাবিধ রোগে আবাসস্থল না হইয়া, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা সুজির খাদ্যাদি ঘরে তৈয়ার করাইয়া খাওয়াই কর্ত্তব্য।

চাউলের পরই ডাইল আমাদিগের নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্য-

দ্রব্য; ভাতের সহ যে কোন প্রকার ডাইল হইলেই এক-প্রকার খাওয়া চলিয়া যাইতে পারে, অন্য কোন তরীতর-কারী না থাকিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। ডাইলে ছানাজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান অধিক, কিন্তু লবণ ও মাখনজাতীয় পদার্থ অল্প থাকে। ইহাতে ছানাজাতীয় পদার্থ এত অধিক যে, মৎস্য ও মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। এই জন্য নিরামিষভোজীর পক্ষে যথা পরিমাণ ডাইলের ব্যবহার সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদয় প্রকারের ডাইল সমগুণবিশিষ্ট নহে, সুতরাং ডাইল সকলের প্রকৃতিতে সকল সময় সর্ব্বপ্রকার ডাইল সহ্য হয় না।

ডাইলের মধ্যে মুগের ডাইলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব-প্রকৃতির লোকের পক্ষে সমান উপযোগী। ইহা লঘু, শীতল, স্বাদু এবং জরঘ্ন; শুশ্রুতের মতে হরিৎ অর্থাৎ সোণামুগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার যুস্ করিয়া রোগীকে পথ্যও দেওয়া চলিতে পারে। রোগীর পথ্যকালে, উহা অধিক মশলা সংযুক্ত যাহাতে না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রকার যুস্ করিতে শুদ্ধ মাত্র হলুদ এবং জীরা ও পাঁচফোরণ, সামান্য মাত্র দিলেই চলিতে পারে। মুগ ভাজিয়া তবে ডাইল প্রস্তুত হয়; না ভাজিয়াও মুগ আমাদিগের ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। কাঁচা মুগ ভিজাইয়া, তাহার খোসা ছাড়াইলে অতি স্নিগ্ধ জলখাবার হইতে পারে। এই প্রকার মুগ অতিশয় শীতল ও কথঞ্চিত গুরু হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তিগণের ইহা সেবন করা উচিৎ নহে।

মুগের পরই কলায় আমাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকে। রাঢ় প্রদেশেই ইহার চলন অত্যধিক দেখা যায়; ইহা শীতল, গুরু, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ও মলরোধনাশক। সুস্থ ও জীর্ণক্ষম ব্যক্তিগণেরই ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কলায় ডাইল সাহায্যে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা প্রস্তুতীত সমুদয় দ্রব্যাদিই গুরুপাকের হইয়া থাকে। অজীর্ণ-রোগী এবং কোন প্রকার রোগ হইতে আরোগ্য-মুখ কাহারও ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

মসূর :—ত্রিদোষনাশক বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহা সহজ পরিপাচ্য, লঘু, রক্তদোষ-নাশক এবং জ্বরঘ্ন; এই জন্যই অনেক সময় জ্বরে পথ্য রূপে ইহারও যূষ ব্যবহার হইয়া থাকে; উদরাময় প্রবণতা ও পেট-কাঁপা বর্ত্তমানে, ইহার ব্যবহার আরও যুক্তিযুক্ত জানিবে। মসূরের ডাইলে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে আছে এবং খেঁসারী ব্যতীত সকল ডাইল অপেক্ষা ইহা অধিক সার-বান। ছানাজাতীয় উপাদান অধিক থাকাতেই ইহা মাংসের ন্যায় বলকারক এবং সেইজন্য প্রায় আমিষ বলিয়া গণ্য হওয়ায় হিন্দু বিধবার পক্ষে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

অড়হর :—কষায়, মধুর, শীতল, লঘু, বর্ণকারক ও বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং রক্তদোষ নাশক বলিয়া খ্যাত; ইহা প্রত্যহ সেবন করা উচিৎ নহে এবং যাহাতে সুসিদ্ধ হইয়া যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

ছোলা :—শুষ্ক অথবা তৈলের সহিত ভাজিলে রুক্ষ,

কষায় ও বায়ুজনক হইয়া থাকে; ভিজাইয়া ভাজিলে বলকারক ও রোচক হয়; সিদ্ধ ছোলা কফপিত্তনাশক; ভিজা ছোলা অতি নরম, রোচক, লঘু, পিত্তনাশক এবং শীতল কিন্তু বায়ুবর্দ্ধক জানিবে। প্রত্যহ প্রাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও আদা সংযোগে, এক মুটা ছোলা ভিজা খাওয়া অভ্যাস করিলে, দৈহিক পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া, শরীরে বলসঞ্চয় হইয়া থাকে। ছোলার ডাইল একটু অধিক সিদ্ধ করা প্রয়োজন, নতুবা উহা সহজে হজম হয় না জানিবে।

মটর :—সুটি অবস্থায় কচি হইলে বড়ই মুখরোচক, মধুর ও শীতল; এই কচি মটর, কাঁচা অথবা ভাজা (তৈল বা ঘৃতে) বড়ই উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে ঔদরিক পীড়াদি জন্মাইতে পারে; মটর ডাইল খাইতে মন্দ নহে, কিন্তু গুরুপাক; এইজন্য হবিষ্যান্ন সহিত ইহার সেবন ব্যবস্থা দেখা যায়।

খেঁসারী :—অতিশয় রুক্ষ, কষায়, তিক্ত, কফ-পিত্তনাশক এবং রোচক; ইহা অতিশয় বায়ু প্রকোপক বলিয়া অধিক দিবস যাবৎ খাওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ পক্ষাঘাত অথবা খঞ্জাদি হইবার সম্ভাবনা; পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রচলন তেমন দেখা যায় না, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে সমধিকভাবেই প্রচলিত দেখা যায়।

আমরা মোটামুটি ভাবে সমুদয় ডাইল সম্বন্ধেই যথা-আলোচনা এখানে করিলাম এবং সুস্থদেহী মাত্রেই

ইহা অনুযায়ী চলিতে পারেন। কিন্তু অজীর্ণরোগীর জন্য কিছু পৃথক ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করি ; জীর্ণাক্ষম ব্যক্তি, মুগ ও মুসুর ডাইলের উপরই অধিক নির্ভর করিবেন, কদাচিৎ কলায় এবং অড়হরও খাইতে পারেন, কিন্তু ছোলা, মটর প্রভৃতির দিক দিয়াও যেন তাঁহারা না যান ! আর একটি কথা,—কোন এক প্রকার ডাইলই নিত্য ভোজন করা উচিৎ নহে ; প্রকৃতি স্বয়ং যখন আমাদের জন্য একজাতীয় দ্রব্যই নানাভাবে সৃজন করিয়াছেন, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নিত্য একই প্রকার ভোজন প্রকৃতির বাঞ্ছনীয় নহে, সুতরাং স্বাস্থ্যেরও অনুকূল নহে।

ডাইল ব্যবহারে সাবধানতা

চাউল এবং ডাইল হইল ভারতবাসীর, [বিশেষতঃ বাঙ্গালীর] প্রধান আহার্য্য পদার্থ ; শুদ্ধ ভারতবাসীরই বা কেন, এক প্রকার সমুদয় এসিয়াবাসীরই ইহা প্রধান খাদ্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাত, ডাইল খাইয়া খাইয়াই ভারতবাসীরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। এ সব যুক্তি যে কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা সহজেই অনুমেয়, কারণ জগতের মধ্যে আধুনিক ক্ষমতাশালী পাশ্চাত্য বীরাগ্রগন্তগণেরও সম্পূজিত জাপানীরা এই ভাতই নিত্য আহার করিয়া থাকে ; কই তাহারা ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ নহে !! চির পরাধীন জাতি ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াই থাকে, সুতরাং তাহাদের দুর্ব্বলতা ও নিস্তেজভাব দেখিয়া

ভাত ও ডালে শরীর দুর্ব্বল করে !

অজীর্ণতা।

আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত তাহাদের আহারীয় দ্রব্যাদির উপর দোষারোপ করা প্রকৃত জ্ঞানবানের কার্য্য নহে !! যদি পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালী দুই বেলা, দুই মুষ্টি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহা হইলেই দেখিবে যে এই বাঙ্গালীই পূর্ব্বের ন্যায় শৌর্য্যবীর্য্যশালী হইতে পারে। ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে যে, এই ডাল ভাত খাইয়াই বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্যের নেতৃত্বাধীনে সমুদয় মোগলবাহিনীকে তুচ্ছ করিতে সক্ষম হইয়াছিল! বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার জন্য তাহাদিগের চিরন্তন আহার, ডাইল ভাতের দোষ যাঁহারা দিয়া থাকেন তাঁহারা নিশ্চয়ই অবিবেচক। পূর্ব্বে বাঙ্গালী—ভারতবাসী মাত্রেই—স্বল্পায়াসে দুইবেলা পরি-তোষরূপে আহার করিতে পাইত, এখন নিত্য দুর্ভিক্ষ দেশে বিরাজিত থাকায়, এ দেশের কয়জন অধিবাসী প্রাণ ভরিয়া খাইতে পায়? উপযুক্ত আহার না পাইলে মাংসপেশী সকল কেমন করিয়া সবল হইবে? ইহার উপর "ম্যালেরিয়া" এবং "অজীর্ণতা" দুইটি করাল ব্যাধি লাগিয়াই আছে!! যদিও শেষোক্ত অজীর্ণতা ব্যাধিটি কতকটা আমরা নিজেরা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আনয়ন করিয়া থাকি; তথাপি ইহা নিশ্চয় যে রোগশোকে প্রপীড়িত, চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত, ভয়ঙ্করী অন্নচিন্তায় সত্ত্বাতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হওয়া এবং তদুপরি পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াই

খাদ্যাভাবই দুর্ব্বলতা কারণ।

ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণতা

এদেশ বাসীর শারীরিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ!!!

শুদ্ধ ভাত ও ডাইল হইলেই আমাদের আহার সম্পূর্ণ এবং তৃপ্তিকারক হয় না, কাজেই উহা তৃপ্তিকর করিবার জন্য, অন্য কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন; এই উপকরণগুলি যে একান্তই প্রয়োজন তাহাও নহে। স্বচ্ছন্দসুখাহারী,

তরী তরকারী

সদা পরিশ্রমী, কৃষাণ ও তদবস্থাপন্ন লোকদিগের এই উপকরণ না থাকিলেও চলিতে পারে। ডাইল ও ভাতই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট, যদি কোন দিন কিছু উপকরণ জুটে ভালই, না জুটে তাহাতেই বা কি! একটু লবণ ও তেঁতুল পাইলেও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদিগের পয়সা আছে অর্থাৎ "বড়-লোক" বলিয়া খ্যাতি আছে, তাঁহাদিগের আহারের জন্য নানা উপকরণ "পঞ্চাশ ব্যঞ্জন" চাইই চাই!! নতুবা তাঁহার আহার সম্পন্ন হইবে না। এই কথা বলায় যেন কেহ মনে না করেন, যে আমার মতে ডাইল ও ভাত ব্যতীত অন্য উপকরণের দরকার নাই। প্রকৃতির লীলা নিকেতন, আমাদের এই ভারতভূমী সদাই ফলফুলে বিকশিতা; বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন শাকসব্জী ও ফলমূলের ডালি লইয়া স্বয়ং আমাদের সম্মুখে হাস্যাননে দাঁড়াইতে-ছেন, আর আমরা তাহা লইয়া, উপভোগ করিব না! যে দেশে যাহা প্রচুর জন্মে, সেই দেশবাসীর যে তাহাই উপ-ভোগ্য ইহা ত সহজেই অনুমেয়। তবে ও কথার অব-তারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা মাত্রায় অধিকতর

খাওয়া কর্ত্তব্য নহে! আমাদের মতে এই উপকরণগুলি প্রত্যহ এক প্রকারের না করাইয়া, এটা ওটা করিয়া রুচি-ভেদে (কতকটা রুচি করিবার জন্যও বটে) পৃথক পৃথক বস্তু আহার করা প্রয়োজন। একেবারে অধিক উপকরণ ভোজনের বিরুদ্ধবাদী হইবার উদ্দেশ্য কি, বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহিবেন। তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে, এই সমুদয় তরী তরীকারী সহজে হজম হয় না।

আমরা পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, পরিপাক-ক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হওয়াইবার পক্ষে, রসনার তৃপ্তিকর ভোজ্যদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য ও এই জন্যই সুরন্ধনের বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যত ইচ্ছা বাসনা তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে চাপাইয়া দিলেও, উহা সহজেই হজম হইয়া যাইবে। ২।১টি রুচিকর উপকরণ থাকিলেই, আহার কার্য্য বেশ সুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে এবং নিয়মিত ভাবে এই রূপেই আহার করা কর্ত্তব্য।

এই উপকরণ বা তরী তরকারীতে লবণ জাতীয় উপাদান অধিক থাকে। ইহার মধ্যে আবার সিম, মটরসুটি, বরবটি প্রভৃতি সুটি জাতীয় পদার্থ অধিক পুষ্টিকর, কারণ উহাতে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক বিদ্যমান আছে। সাধারণতঃ তরী তরকারী বলিতে আমরা শাক, মূল ও ফলাদি বুঝিয়া থাকি। আয়ু-র্বেদীয় মতে শাক সমুদয় রোগের আকর বলিয়া কথিত থাকায়, উহা শাকাদি ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া

বিধিবদ্ধ আছে। সমুদয় প্রকার শাকই সাধারণতঃ গুরু, রুক্ষ, বহু মলজনক এবং পুরীষ ও বায়ু নিঃসারক। যাহাদের অজীর্ণতা দোষ বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা না খাওয়াই কর্ত্তব্য। যদিই খাইতে সেরূপ ইচ্ছা করে, তবে যে যে শাক বায়ু ও পিত্তনাশ করে, তাহাই মধ্যে মধ্যে ভোজন করিতে পারেন—কিন্তু তাহাও স্বল্প মাত্রায় জানিবে।

নিম্নে শাকাদির গুণ যথা সম্ভব বর্ণিত হইল :—

পুঁইশাক :—পুষ্টিকর, তৃপ্তিকারক, রোচক, পথ্য, বায়ুপিত্তনাশক, নিদ্রাকারক, শীতল ও স্নিগ্ধ; কিন্তু শ্লেষ্মা-জনক বলিয়া যাহাদিগের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, তাহাদিগের আহার করা উচিৎ নহে। নটেশাক :—রক্তদোষ নিবারক, মলমূত্র নিঃসারক, রোচক, অগ্নিকারক, পিত্তশ্লেষ্মানাশক এবং লঘু ও শীতল। কাঁটানটে :—দুই প্রকার লাল ও সাদা; সাদা অপেক্ষা লাল স্বল্প দোষকারক ও তেমন গুরু নহে; উভয়ই শ্লেষ্মা-জনক, কিন্তু সাদা কাঁটানটে পিত্তনাশক। কলমীশাক :—স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, মধুর ও শুক্রজনক। চুকাপালঙ্গ :—অতিশয় অম্ল, সুস্বাদু, বায়ুনাশক কিন্তু পিত্তকারক; রুচ্য এবং অতিশয় লঘু। পালঙ্গশাক :—বায়ুজনক, গুরু, কফবর্দ্ধক এবং ভেদক। শ্বেত পুনর্ণবা :—ঈষৎ কষায়, অতিশয় অগ্নিকারক, বায়ুনাশক। যকৃতের গোলযোগ, বায়ুবৃদ্ধি, শূল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগীর পক্ষে ইহা আহার ও ঔষধ। লাল পুনর্ণবা :— বায়ুজনক, লঘু, ও শীতল এবং রক্তপিত্ত শান্তিকারক।

নিমপাতা ঃ—চক্ষুর উপকারক, ক্রিমিনাশক, পিত্ত-নাশক, অরুচিনাশক কিন্তু বায়ুজনক ; নিমপাতা ভাজা অথবা শুক্ত করিয়া খাওয়ায় শরীরে রক্তদোষ বিদূরীত হইয়া থাকে। পাটশাক ঃ—(তিক্ত) নালৃতা শাক বায়ুজনক কিন্তু রুচিকারক ; বলকর, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, শীতল ও ক্রিমি প্রশমক। পাটশাক :—(মিষ্ট) বায়ু প্রকোপক, রক্তপিত্ত নাশক। হিঞ্চাশাক ;—পিত্তনাশক। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। কাহারও কাহারও মতে প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা দুগ্ধ ও হিঞ্চাশাকের রস পান করিলে, অজীর্ণতাদোষ দূর হইয়া থাকে। শুশুনিশাক ঃ—ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, রোচক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বৃষ্য।

মূলার শাক ঃ—পাচক, লঘু, রোচক, এবং তৈলের সহ সদ্ধ হইলে ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে, পটলের পাতা :—অগ্নিকারক, পিত্তনাশক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, ক্রিমিনাশক, ও শুক্রজনক। অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা আহার ও ঔষধ জানিবে। কচি আমের পাতা, রুচিকারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক। ছেলার শাক ঃ—সহজে জীর্ণ হয় না, কিন্তু লঘু, পিত্ত নাশক ও দন্তশোথ নিবারক। মটরশাক :—ত্রিদোষনাশক, তিক্ত, লঘু, ভেদক। গন্ধভাদালিয়া ঃ—বলকারক, বায়ুনাশক, তিক্ত ও কফনাশক ; উদরাময় প্রভৃতি পীড়ায় এবং জ্বররোগীকেও ইহার ঝোল খাইতে দেওয়া যাইতে পারে ; বিশেষতঃ উদরাময়প্রবণতা বর্ত্তমানে ইহার সুব্যবহার দেখা যায়।

উপরোক্ত শাকাদির কেবলমাত্র পত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে

বলিয়া উহাদিগকে পত্রশাক বলিয়া থাকে। সচরাচর আমরা পত্র-শাকের মধ্যে ঐ গুলিই ব্যবহার করিয়া থাকি। যাহাদের মাত্র ফুলই ব্যবহৃত হয়, এইবার তাহাদিগের বিষয় আলোচিত হইতেছে :—

বকফুল :—বায়ু ও পিত্তনাশক, রাত্র্যান্ধনিবারক, পালা-জ্বর নিবারক, শীতল, তিক্ত ও কষায়। ফুলকপি :—অতি সহজেই হজম হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া কর্ত্তব্য নহে; রন্ধন দ্বারা উহা রসনার বড়ই তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। ইহা শীতল, লঘু, রোচক এবং মধুর। বাঁধা কপি :—টাটকা ও কচি অবস্থায় সম্ভবমত সকলেই খাইতে পারেন, কিন্তু ইহার ব্যবহারে অজীর্ণরোগীর কতকটা সংযত ভাব ধারণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহা গুরুপাক। ওলকপি :—কোমল, মধুর, শীতল এবং লঘু। মোচা :—বায়ু, পিত্ত এবং বহুমূত্র উপশমকারক; বলকারক, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ এবং মধুর। সজিনার ফুল :—বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপনাশক, লঘু, রোচক, ক্রিমিঘ্ন এবং স্নায়ুশোথ, প্লীহা ও গুল্মরোগ দমন করে। ইহা চক্ষের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর।

যে সকল শাকের ফল ব্যবহৃত হয় এইবার তাহাদের বর্ণনা করা যাইতেছে :—

কুমড়া :—(দেশী) পুষ্টিকারক, গুরু, বায়ুনাশক। কচি অবস্থায় ইহা শীতল, পিত্তনাশক ও অগ্নিকারক, সুতরাং সকলেই খাইতে পারেন, কিন্তু আধপাকা কিংবা পাকা অবস্থায় উহার ব্যবহার কম করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এই দেশী পাকা কুমড়ার বিচি ও শাঁস সহ, ডাল বাটা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার

বড়ি প্রস্তুত করা হয়। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু গুরুপাক হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা যতই মুখপ্রিয় হউক না কেন, উপকারী নহে জানিবে। কুমড়া :—(বিলাতী) গুরু, স্বাদু এবং পিত্ত ও অক্ষুধাজনক; কতকটা বায়ুপ্রকোপকও বটে, কিন্তু শ্লেষ্মানাশক। লাউ :—রুচিকর, ধাতুপোষক, পুষ্টিকর এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা-নাশক, কিন্তু সহজ পরিপাচ্য নহে। কচি হইলে ইহা সহজ পরিপাচ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কলেরার পক্ষে এক প্রকার প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

কাঁকুড় :—কাঁচা অবস্থায় শীতল, মধুর, রোচক, পিত্ত-নাশক, কিন্তু গুরু বলিয়া কথিত; উহা পাকা অবস্থায় খাওয়া উচিৎ নহে, কারণ তখন ইহা পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধন করে, অপিচ তৃষ্ণাও বাড়াইয়া দেয়। চিচিঙ্গা :—বলকারক, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শোথরোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক। পটোলের সহ ইহা প্রায় তুল্য গুণদায়ক। উচ্ছা :—বড় জাতীয় হইলে তাহাকে করোলা বলে এবং ক্ষুদ্রজাতীয় হইলে শুধুই উচ্ছা কহিয়া থাকে। করোলা, শীতল, লঘু, ভেদক, তিক্ত ও বায়ুর শমতাকারক এবং পিত্ত-নাশক; উচ্ছাতে উপরোক্ত সমুদয় গুণই বিরাজিত, অথচ ইহা লঘু ও ক্ষুধাবর্দ্ধক।

ঝিঙ্গা :—শীতল, মধুর, আমানাশক ও বহুমূত্র নিবারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ধেঁাদল :—বায়ুনাশক। পটোল :—

লঘু, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পাচক, তৃপ্তিকারক। ইহা ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক। ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক।

সিম :—(সাদা) বায়ু ও পিত্তনাশক, বলকারক, গুরু এবং পাকে ও আস্বাদে মধুর। কৃষ্ণসিম বায়ুনাশক বটে, কিন্তু অক্ষুধা-জনক, মলরোধক, গুরু, পিত্তবর্দ্ধক, এবং রুচিপ্রদ।

সজিনার ডাঁটা :—পিত্তশ্লেষ্মানাশক ও অতিশয় অগ্নি-দীপ্তিকারক ; ইহা কচি অবস্থাতেই খাইতে ভাল এবং সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়, পাকা এবং শক্ত হইয়া গেলে আর সেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

বেগুন :—বায়ুনাশক, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক এবং লঘু ; কচি বেগুন খাওয়ায় কফ ও পিত্তনাশ হয় ; পাকা অবস্থায় উহা পিত্তকারক, লঘু ; বেগুন পোড়া খাইতে সুস্বাদু, অতিশয় লঘু এবং বায়ু ও আমনাশক হয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তকারক হইয়া থাকে জানিবে। লবণ ও তৈল এবং লঙ্কার সংযোগে এই বেগুন পোড়া গুরুপাক হয়, অজীর্ণরোগীরা যেন ইহা মনে রাখেন।

টেঁড়োশ :—রুচিকারক এবং কফপিত্তনাশক। কাঁক-ড়োল :—অগ্নিদীপ্তিকারক এবং অরুচি নিবারণ করে।

ওল :—রোচক, লঘু, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক, রুক্ষ এবং প্লীহা নাশক ; ইহা অর্শরোগের পক্ষে বিশেষতঃ, অতিশয় সুপথ্য।

আলু :—সাধারণতঃ, গোল, লাল, সাঁকআলু ও মেটে আলু প্রকারে প্রচলিত দেখা যায় ; সমুদয় প্রকার আলুই শীতল, মধুর, গুরু, বলকারক ও কিঞ্চিৎ ক্ষুধাহারক ; ক্ষুধামান্দ্য লোক-দিগের পক্ষে ইহাদের ব্যবহার একটু অল্প হওয়া উচিৎ ;

যদি হজমশক্তি থাকে, তবে সিদ্ধ গোল আলু লবণ সংযোগে নিত্য ব্যবহার করিতে পারিলে, সহজেই শরীরে পুষ্টিলাভ হইতে পারে; আলু ভাজা, অর্দ্ধপোড়া অথবা অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার না করিয়া, কেবল সুসিদ্ধ অবস্থায়, যাহা স্বল্প মসলাদি সংযোগে প্রস্তুত হয়, তাহাই ডিস্পেপ্টিকগণ ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু যখন অজীর্ণতা প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে, তখন নহে। পচা অথবা জাম্ড়াধরা কঠিন আলু কাহারও খাওয়া উচিৎ নহে। খোসা ছাড়াইয়া আলু সিদ্ধ করিলে, উহার পুষ্টি গুণের হ্রাস ও অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। খোসা সমেত সিদ্ধ আলু খোসাবিহীন আলু অপেক্ষা ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে পরিপাক হইয়া যায়। ইহা নূতন অপেক্ষা পুরাতনই ব্যবহার করা প্রশস্ত। সাঁক আলু কাঁচাই খাইতে হয় এবং মধুর, রসাল ও শীতল লাগে; প্রখর রৌদ্রের সময় আরও তৃপ্তিদায়ক বোধ হয়, কিন্তু অধিক মাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। লাল অথবা মিষ্ট আলুও কাঁচা খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা সহজে হজম হয় না জানিবে।

পেঁয়াজ ও রশুন:—শরীরের তেজোবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর; ইহার সহ মদ্য ও মাংস অল্প ব্যবহার করা প্রয়োজন। হিন্দুর আহার সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, কাজেই তাঁহাদের শাস্ত্রে ইহার নিষিদ্ধ ব্যবহার কথিত আছে; ইহাদের ব্যবহারে মুখে এরূপই দুর্গন্ধ হয় যে, নিকটে পর্য্যন্ত লোক বসিতে পারে না। মাংসাদি রন্ধনে ইহার ব্যবহার দেখা যায়; আমাদিগের বিশ্বাস, ইহা কতকটা মোগলদিগের অনুকরণফলেই

আমাদিগের মধ্যে তৎপাশন সময়ে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। রসুনের উপকারীতা ঔষধাধিকারে আমরা ভগ্নস্থানের সংযোজক ও শিশুর নাভিমূলের কর্ত্তিত স্থানের ক্ষত শুষ্ককারক, বলিয়া দেখিতে পাই।

আদা :—ভেদক, গুরু, ক্ষুধাবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক; শুষ্ক আদাকেই শুঁঠ বলে। আহার করিবার পূর্ব্বেই লবণের সহিত আদা খাওয়া অভ্যাস করা বিশেষ উপকারক; ইহাতে ক্ষুধার বৃদ্ধি ও রুচিবৃদ্ধি হয়; আয়ুর্ব্বেদ মতে গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে ইহা খাওয়া উচিৎ নহে। কলায়ের ডাইল সহ, আদা বিশেষ গুণকারক ও আহারেও সুস্বাদু হইয়া থাকে। আম আদা :—শীতল বায়ুজনক, পিত্তনাশক, মধুর, তিক্ত ও কণ্ডু নাশক। মূলা :—রোচক, লঘু, উষ্ণ, পাচক এবং ত্রিদোষনাশক; মূলার এই গুণ ক্ষুদ্রাকারের মূলাতেই দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৃহদাকারের অর্থাৎ নেপালী মূলা, গুরু, রুক্ষ এবং ত্রিদোষজনক; তৈলাদির দ্বারা সিদ্ধ করিলে দেখা গিয়াছে যে ইহাও ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে; স্কার্ভির (Scurvey) প্রতিষেধক বলিয়া ইহা ব্যবহারে বেরি বেরি রোগ জন্মিতে পারে না। ইঁচোর :—(কাঁচা কাঁঠাল) গুরু বায়ুজনক, বলকারক, শ্লেষ্মাজনক ও মেদোবর্দ্ধক; পাকা কাঁঠালের বিচি—মধুর, গুরু ও কোষ্ঠরোধক। ইহা ভাজা খাইতে বড়ই মুখপ্রিয় কিন্তু সহজে জীর্ণ হয় না। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কাঁঠালের কোন জিনিষই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। গাজর :—মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু ও উষ্ণ। বিট :—দেখিতে গাজরেরই মত, কিন্তু শ্বেতবর্ণের

না হইয়া ইহা লালবর্ণের দৃষ্ট হয়; ইহার গুণও গাজরের ন্যায়। ইহা হইতে এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চিনি অপেক্ষাকৃত স্বল্প মিষ্ট। কলার মূল ও থোর :—ঠাণ্ডা, বলবর্দ্ধক, অম্লপিত্তদমনকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং দাহনাশক। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা সুপথ্য।

মানকচু :—লঘু, শীতল এবং শোথনাশক; কিয়ৎ পরিমানে রক্তেরও পরিশোধক। কেশুর :—শীতল, মধুর, কষায়, গুরু, রোচক এবং স্তনে দুগ্ধ উৎপাদক। পুদিনা :—বলকর, বমন নিবারক, অরুচিনাশক, বায়ুদমনক, মুখের জড়তানাশক এবং কফনাশক। ইহার চাট্‌নি, কাঁচা আমের সহ অথবা তেঁতুল সহ, বড়ই মুখরোচক এবং তৃপ্তিপ্রদ খাদ্য। পোস্তাদানা :—অতিশয় গুরু, কফনাশক ও বায়ুজনক, কিন্তু বলকারক; ইহার দ্বারা প্রস্তুতীত দ্রব্যাদি অজীর্ণরোগীর পক্ষে আহার একেবারে নিষিদ্ধ। ডুমুর :—সুস্বাদু, শীতল; ইহার দ্বারা কফ, পিত্ত, অর্শ, ও পাণ্ডুরোগ বিদূরীত হয়; অধিকন্তু ইহা রক্তদোষপ্রশমক ও মূত্রাতিশার উপশম কারক। বহুমূত্র ও যকৃতদোষযুক্ত রোগীর পক্ষে ইহা নিত্য ভোজন ঔষধের কার্য্য করে। মাদার :—কাঁচা হইলে অম্লমধুর, ত্রিদোষজনক, রক্তদূষক, ক্ষুধামান্দ্যকর, ও চক্ষের অনিষ্টকর; কিন্তু পাকা অবস্থায় উহা বায়ুপিত্তনাশক, রোচক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বলকারক। বরবটী :—বায়ুবর্দ্ধক, রোচক, বলকারক ও স্তনে দুগ্ধ উৎপাদক, গুরু ও তৃপ্তিকর। পদ্মের মৃণাল বা শালুক :—পিত্তজনিত দাহ নিবারক, রক্তদোষনাশক, বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক এবং গুরু।

শাকাদি ভোজনে সাবধানতা অবলম্বনের কথা পূর্ব্বেই এক স্থানে উক্ত হইয়াছে; এখন শাকাদির গুণ জ্ঞাত থাকিয়া কিরূপ অবস্থায় উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাও অবগত থাকা প্রয়োজন বিধায়, এখানে তাহার বিষয় কতক বলিতে ইচ্ছা করি। অতিশয় জীর্ণ, অসময়ে উৎপন্ন, তৈলাদি দ্বারা অসিদ্ধ, অপরিস্কার স্থানে উৎপন্ন, বিকৃত বর্দ্ধণযুক্ত (কুড়ে মারা) এবং পোকা মাকড়াদি দ্বারা কীটদুষ্ট শাক ভোজন নিষিদ্ধ এবং মূলক ব্যতীত আর কোন শাকই, শুষ্ক ভোজন করিবে না। শুষ্ক মূলক ভোজনে উপকার আছে জানিবে।

প্রকৃতির লীলাভূমী এই ভারতবর্ষে ফল-ফুল ও শাক-সব্জীর অভাব নাই; এখানে যত প্রকার ফলমূলাদি পাওয়া যায়, তাহা জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং সমুদয় ফলাদির বর্ণনা করা এখানে অসম্ভব। যে সকল ফল আমরা সমধিক ব্যবহার করিয়া থাকি, এখানে তাহারই আলোচনা করিব। সকল ফলের মধ্যে অম্ল ও লবণজাতীয় পদার্থ অল্পাধিক পরি-মানে বিদ্যমান, কিন্তু কতকগুলি ফলে ফলাদি আবার (যেমন আম্র, কাঁটাল ইত্যাদি) শর্করাজাতীয় উপাদানও অধিক পরিমাণে দেখা যায়। যথারীতি ভোজনে ইহা রক্ত শোধিত করে।

আম্র:—আমাদের এখানে ইহাই ফলের রাজা; বোল হইতে পক্কাবস্থা পর্য্যন্ত, সকল অবস্থাতেই আমরা ইহার ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সকল অবস্থাতেই ইহার বিভিন্ন

গুণ দৃষ্ট হয়; বোল শীতল, রুচিকর, রক্তদোষনাশক; কচি আম, কষায়, রোচক, বাতশ্লেষ্মানাশক। ইহার অম্বল, চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে, বড়ই তৃপ্তিপ্রদ হইয়া থাকে। কাঁচা আম, বড়ই টক ও রক্তদূষক। ইহা অধিক খাওয়া উচিৎ নহে; এই কাঁচা আম ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আমসি করিলে, উহা স্বাদু ও অম্লমধুর হইয়া থাকে; কিঞ্চিৎ মিষ্ট সংযোগে ইহার অম্বল, বড়ই তৃপ্তিদায়ক, রুচ্য এবং হৃদ্য হইয়া থাকে। পাকা আম মিষ্ট, বলকারক, অগ্নি-কারক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, কিন্তু পিত্তজনক নহে; আমের গুণ গাছপাকা আম গুরু, অতিশয় বায়ুনাশক, অম্লমধুর ও সামান্য বায়ুজনক জানিবে। ঘরে পাকান আমই পিত্তনাশক, কারণ তাহাতে অম্লরস অল্প হইয়া মিষ্টরস অধিক থাকে; ২।১ দিন ঘরে থাকিয়া পাকিলে, ইহা লঘু, রোচক বলবীর্য্যকারক, বায়ুপিত্তনাশক এবং সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। আমের রস গুরু, বলকারক, বায়ুনাশক ও অতিশয় পুষ্টিকারক। দুগ্ধের সহিত আম সেবনে রুচি বৃদ্ধি, দেহপুষ্টি, বায়ুপিত্তনাশ ও বর্ণের উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা পরিমাণে অধিক খাইতে নাই, তাহাতে অগ্নিমান্দ্য, রক্তদোষ (গাত্রে স্ফোটকাদি হওয়া), অতিশয় কোষ্ঠরোধ প্রভৃতি হইতে পারে, অতএব আম্র ভোজনে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগীগণ লোভ বশতঃ, মুখের তৃপ্তিদায়ক বলিয়া যেন অধিক মাত্রায় ইহা আহার করেন

আমসত্ত্ব :—রৌদ্রে পাক হইয়া যায় বলিয়া, ইহা

লঘু হয় এবং আহারে তৃষ্ণা, বমি এবং বায়ুপিত্তের উপশম ও কোষ্ঠ শুদ্ধি কারক হয় জানিবে।

কাঁঠাল :—আমের ন্যায় ইহাও আমাদের দেশে সময়ে প্রচুর জন্মে এবং কাঁচা (ইঁচোর) অবস্থা ইহাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক্কাবস্থায় ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, বায়ুপিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক ও পুষ্টিকর; আরও ইহা অতিশয় মাংসবৃদ্ধিকর ও শ্লেষ্মাজনক জানিবে। খাজা কাঁঠাল (অর্থাৎ যাহার রোয়া—কোষ কঠিন) বড় সহজে জীর্ণ হয় না এবং ভোজনে উদরের উপদাহ প্রায়ই উৎপন্ন করিয়া থাকে। গলা কাঁঠাল অপেক্ষাকৃত জীর্ণক্ষম। অগ্নিমান্দ্য ব্যক্তির ইহা মুখরোচক হইলেও পাকস্থলী রোচক নহে, সুতরাং ব্যবহারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কাঁঠালের রস, গুরু, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মধুর এবং শীতল। কাঁঠালের বীজ, সুসিদ্ধ এবং ঘৃত সংযুক্ত হইলে বলকর, মুখরোচক হয়। অপিচ ইহা হৃৎস্পন্দনের একটি ঔষধ বলিয়া গণ্য।

তরমুজ :—শীতল কিন্তু গুরু; পাকা তরমুজ উষ্ণ, পিত্ত-জনক কিন্তু বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে ইহা বড়ই উপাদেয় ও তৃষ্ণানাশক সরবৎ হয়। খরমুজা :—বলকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, গুরু, শীতল, বায়ু ও পিত্তনাশক। আতা :—শীতল, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং কফবর্দ্ধক; ইহা বমন ও বমনের বেগ নিবারণেও কথঞ্চিৎ সমর্থ। শশা :—কচি অবস্থায় লঘু, সুস্বাদু, শীতল ও পিত্তনাশক; পাকা শশা, পিত্তজনক ও উষ্ণ। ইহার কচিই উপকারী জানিবে এবং অজীর্ণরোগীও অনায়াসে খাইতে পারে।

কাঁকুড় :—মধুর, গুরু, কফ ও পিত্তনাশক ; ইহা রন্ধন করিয়াও তরকারী রূপে আহার চলিতে পারে। ইহার পক্কাবস্থাকেই ফুটি বলে ; ইহা উষ্ণ এবং পিত্তজনক কিন্তু কাঁকুড় তাহা নহে। তাল :—(কচি) লঘু, শ্লেষ্মাজনক, স্নিগ্ধ, মধুর বায়ু ও পিত্তনাশক। পাকাতাল সহজে জীর্ণ হয় না ; কাজেই তালের প্রস্তুত সমুদয় খাদ্যদ্রব্যই অগ্নিমান্দ্য ব্যক্তির পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ। পাকাতালের শুষ্ক আঁটি চিরিয়া তাহার মধ্য হইতে তালের কোঁফল বাহির করিতে হয় ; উহা তৃপ্তিকারক এবং স্নিগ্ধ ও সহজ পরিপাচ্য জানিবে। তালের রস বা তাড়ী, টাট্‌কা অবস্থায় খেজুর রস অপেক্ষা স্নিগ্ধকর এবং বায়ুনাশক ও পিত্তকর ; কিন্তু ইহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাওয়া প্রয়োজন ; রৌদ্র বাড়িতে থাকিলেই উহা হইতে গাঁজলা উঠিয়া তাড়ী নামক মাদক রসে পরিণত হয়। কুলে খাড় :- (পাকা) গুরু, বায়ু-পিত্তনাশক, কণ্ঠশোধক ; ইহা অম্লমধুর বলিয়া বড়ই মুখরোচক এবং তৃষ্ণা ও হিক্কার উপশমকারক। জাম : দাহশান্তিকর, রুক্ষ, ক্ষুধারোধক। ইহা অধিক পরিমানে খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার বিচি বহুমূত্র রোগে উপকারক। গোলাপজাম :— গুরু, রোচক, মধুর ও স্বাদু। কলা :—কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া ব্যবহার হয় ; ইহা গুরু, ও সহজ পরিপাচ্য নহে ; কাঁচাকলা হইতে ময়দার ন্যায় এক প্রকার পালো তৈয়ার হইয়া থাকে, উহার রুটি বেশ সুপাচ্য। পাকাকলা অতিশয় ভারজনক, ক্রিমি-উৎপাদক, এবং বায়ু ও কফবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। মর্ত্তমান কলাই খাইতে অতি সুস্বাদু, তন্নিম্নেই চাঁপা কলা জানিবে।

কামরাঙ্গা :—ইহা শীতল, অম্লমধুর ও বাতশ্লেষ্মকর ; ইহা অধিক ব্যবহারে জ্বর হইবার সম্ভাবনা।

বেল :—কাঁচা বেল কষায়, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক এবং বাতশ্লেষ্মহর। পাকা বেল সুগন্ধি, মধুর, দুর্জ্জর এবং অধিক মাত্রায়, পেট ফাঁপায়। অন্যান্য ফল পরিপক্ক হইলে গুণাধিক্য জন্মে.কিন্তু পাকা বেল অপেক্ষা কাঁচা বেলই অধিক গুণশালী জানিবে। বেলশুঁট ধারক এবং আমাতিসার ও শূলে বিশেষ হিতকরী। (আধপাকা কাঁচা বেলের খোলা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসের ভিতর যে বীজ ও আটা থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া, বেলের গুণ উহাকে চাকা চাকা করিয়া কাটিবে এবং রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। পরে রৌদ্র শুষ্ক—করিয়া বোতলে ছিপি দিয়া রাখিবে। ইহাকেই বেল শুঁট বলা যায়)।

পুরাতন উদরাময় এবং রক্তামাশয়ে ইহা বিশেষ উপকারী ; শিশুগণের অনিয়মিত কোষ্ঠপরিত্যাগ অবস্থাতেও (অর্থাৎ উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতার পর্য্যায় অবস্থায়) ইহার ব্যবহারে সুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে ট্যানিক Tanic আসিড আছে সুতরাং অন্ত্রের উপর ধারক astringent কার্য্য করে। আবার ইহা দাস্ত পরিষ্কারও করে ;—অন্য কোন ধারক পদার্থে একত্রে এরূপ সম্মিলন বড় দেখা যায় না। বেলের decoction অর্থাৎ তরল সার পদার্থ এবং সিরাপই ব্যবহারে প্রশস্ত। বেল পোড়া ব্যবহারে আহার এবং ঔষধ উভয় কার্য্যই সমাধা হয়।

(৩ ঔন্স শুষ্ক বেল বা দেড় ঔন্স আধপাকা বেল—বিচি, আঁশ ও আঠা বাদ দিয়া—এক পাইন্ট বা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া লইতে হইবে। পূর্ণ বয়স্কের জন্য ১ ঔন্স বেলের তরলসার করিয়া, দিবসে ৩।৪ বার ইহা সেব্য ; বেলের সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে, অর্দ্ধখণ্ড পাকা বেলের কোমল অংশের সহিত, এক ঔন্স জল ও এক চামচ চিনি মিশ্রিত করিয়া, বেলের সূত্রখণ্ড সকল (আঁশ) বাদ দিয়া ফেলিলেই, সিরাপ প্রস্তুত হইয়া যায়। ইহাও ৩ বার সেব্য)।

কুল :—(নারিকেলী) ভেদক, শীতল, গুরু ও পুষ্টিকর ; দেশী কুল (ক্ষুদ্র), রোচক, বায়ুজনক, গুরু, কফপিত্তকর ও উষ্ণ। কুলমাত্রেই শুষ্ক হইলে ভেদক, অগ্নিদীপক লঘু ও তৃষ্ণানিবারক। ইহার অম্বল উপাদেয় এবং শ্রমশান্তিকর। করমচা :—(পাকা) রোচক, অম্লমধুর কফবৃদ্ধিকর, লঘু ও বায়ুপিত্তনাশক ; কাঁচাবস্থায় ইহা গুরু, অম্ল, তৃষ্ণানাশক ও রক্তপিত্তকর। বঁইচি :—সর্ব্ব-দোষনাশক এবং মধুর ; ইহা বিচি সমেত খাইলে বড়ই উদরাময় উৎপন্ন করে। ফল্‌সা:—পিত্তনাশক, দাহনাশক, মধুর ও পুষ্টিকর ; কাঁচা অবস্থায় ইহা পিত্তকর।

ডালিম :—মিষ্ট হইলে ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিকর, লঘু, বলকারক ও স্মরণশক্তিবর্দ্ধক ; ইহাতে তৃষ্ণা ও দাহ শান্তিও হইয়া থাকে ; অম্লমধুর ডালিম রোচক, অগ্নিদীপ্তিকর এবং সামান্য পিত্তজনক, কিন্তু টক হইলে পিত্তজনক ও বায়ু-শ্লেষ্মানাশক হয়। প্রাচীন উদরাময় ও ডালিমের গুণ রক্তআমাশয়ে ইহা উপকারী ; মুখে ক্ষত হইলে

জলে সিদ্ধ করিয়া, ইহার কুলকুচা করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ইহার তরলসারই বিশেষ প্রয়োজনীয়। দুই প্রকারে ইহা প্রস্তুত করা হয় (১) শিকড়ের ছাল (২) খোসা। তাজা ডালিমের শিকড়ের ছাল (টুকরা) ২ ঔন্স অথবা ঐ শুষ্ক ৩ ঔন্স; দুই পাইন্ট বা ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া নাড়িয়া লইবে। ফিতা কৃমির জন্য ইহার বিশেষ ব্যবহার; পেটের অসুখাদি জন্য ১ ঔন্স দিবসে ৩ বার সেব্য। খোসার তরল সারও ঐ উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ১ বা দেড় ঔন্স দিবসে ৩ বার সেব্য। জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধের সহিত ইহার তরলসার প্রস্তুত করিলেও, সময়ে সময়ে অন্ত্রের পীড়ায় উপকারী হইতে দেখা গিয়াছে। এই তরলসার সহ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি দ্রব্য সংযোগে ইহা আরও মুখরোচক করা যাইতে পারে। আমাদের দেশীয় লোকের অন্ত্রের গোলযোগেই ইহা অধিক কার্য্যকরী। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক, কারণ যকৃতের কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া পরিপাকের বিশেষ সহায়তা ইহাতে হইয়া থাকে।

নির্ম্মলী:—ঘোলা জল পরিষ্কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বাতশ্লেষ্মানাশক, শীতল, মধুর ও গুরু। খেজুর:—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, গুরু, তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর এবং বলকর, বমননিবারক ও বাতশ্লেষ্মানাশক। দেশী ক্ষুদ্র খেজুর অপেক্ষা বৃহৎ পিণ্ডখেজুর (পশ্চিম দেশীয়,) এবং সোহারা (আরব দেশীয়) খেজুরের গুণ সমধিক

বৃদ্ধি হয়। খেজুর রস মাদক, পিত্তকর অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, রোচক, এবং বাতশ্লেষ্মনাশক ও মূত্রকর। কিস্‌মিস্‌ঃ—শীতল, চক্ষের হিতকর, পুষ্টিকারক, গুরু, স্বরশুদ্ধিকারক, ভেদক, মূত্রকারক, বলবর্দ্ধক, রোচক ও কোষ্ঠে বায়ু উৎপাদক। ইহা জলে ২।১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখার পর ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; গরম দুগ্ধের সহ সিদ্ধ করিয়া খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা সহজেই বিদূরীত হইতে পারে। মনাক্কা ঃ— কফপিত্তনাশক, গুরু ও শুক্রজনক। আঙ্গুর অর্থাৎ কাঁচা মনাক্কা।—গুরু, অম্ল ও বায়ুপিত্ত উৎপাদক। নাস্‌পাতি ঃ— লঘু, ত্রিদোষনাশক, অম্লমধুর, সুতরাং সকলেরই পক্ষে সুব্যবহার্য্য; আপেলও ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন। বাদাম ঃ—গুরু, বায়ুনাশক, পিত্তনাশক, কিন্তু উষ্ণ—সহজে জীর্ণ হয় না—এবং কফবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। বাদাম, জলে অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখার পর ব্যবহারে, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতা লাভ হইতে দেখা যায়; কিন্তু বাদাম ভাজা (অধিক) সুস্থ লোকেরও খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আক্‌-রোট ঃ—ইহা বাদামেরই ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং কফপিত্তবর্দ্ধক।

কমলালেবু ঃ—গুরু, বাতপিত্তনাশক, রক্তদোষনাশক, কফনিঃসারক, বলকারক ও পুষ্টিকর। ইহার দ্বারা বমি ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। মিষ্টরসবিশিষ্ট লেবুই উক্ত গুণসম্পন্ন। পাতিলেবু ঃ—অম্ল ও ক্রিমিনাশক; উদর বেদনা নাশক; পেটফাঁপা, অতিশয় মন্দাগ্নি, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি পীড়িত ব্যক্তির ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। অরুচি ও বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ভুক্ত পদার্থ হজম না হইয়া, উদর ভারযুক্ত এবং স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে, অথবা চোঁয়া (বদগন্ধযুক্ত) ঢেঁকুর উঠিতে থাকিলে, কিঞ্চিৎ লেবুর রস, লবণ দিয়া অথবা গরম জলের সহ সেবন করিলে, অতি সত্বর উপশম পাওয়া যাইতে পারে। সুস্থ ব্যক্তিগণেরও ইহা নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাতে সহজে অজীর্ণতা দোষ জন্মিতে পারে না। বাতাবিলেবু :—অম্লমধুর, রোচক, শীতল, কিন্তু গুরু। গোঁড়া লেবু—উষ্ণ, গুরু, অম্ল, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহার ব্যবহারে বমনেচ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, আমাশয় দোষ, অক্ষুধা এবং ক্রিমি নষ্ট হয়; মুখের বিকৃত আস্বাদও ইহা দূর করিতে সমর্থ। কাগজী লেবু—বমন ও তৃষ্ণানিবারক; মিছরী অথবা চিনি ভিজান জলের সহ, সামান্য পরিমাণে, ইহার রস মিশ্রিত করিয়া খাইলেও শরীর স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া শ্রান্তি দূর হয়।

লেবুর গুণ

তেঁতুল :— * অম্ল, গুরু, বাতনাশক, পিত্তজনক, কফবর্দ্ধক ও রক্তদোষনিবারক; পাকা তেঁতুল, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মানাশক। কোন সন্ধিস্থান মচ্‌কাইয়া যাইলে, তথায় কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া প্রলেপ দিলে উপশম প্রাপ্ত হয়।

আলু বোখরা :—রোচক এবং মৃদু বিরেচক।

নারিকেল :—কচি ডাবের জল রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ

---

* অম্লে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং খাদ্য পরিপাক জন্ত যে সকল রসের প্রয়োজন, অম্লদ্রব্য আহারে সেই সমুদয় অধিক নিঃসৃত হইয়া, পরিপাকের সাহায্য করে। লেবুর রসে রক্ত শোধন করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ও পিত্তজ্বরে হিতকর; ইহা শীতল, বায়ুনাশক ও রোচক সুতরাং অজীর্ণরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন আহারের পর, ইহার জলপানে অজীর্ণতা লক্ষণ দেখা দিবার আর ভয় থাকে না। ডাবের শাঁস :—রোচক, মূত্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক এবং ধাতুবর্দ্ধক; কিন্তু সহজ পরিপাচক নহে। ঝুনা নারিকেল :—গুরু, দুর্জ্জর ও বল, মাংস এবং পুষ্টিপ্রদ; ক্ষয়রোগীর অগ্নিবল থাকিলে, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর, কিন্তু অজীর্ণ রোগীর বিষম শত্রু।

আনারস :—অম্লমধুর, পিত্তনাশক, শীতল, মুখরোচক, ধারক ও ক্রিমিনাশক; ইহার পাতার রস সেবনে ক্ষুদ্র ও ফিতা কৃমি বিনষ্ট হইয়া থাকে; ইহা সেবনে অজীর্ণতাও দমন হয়, কারণ যকৃতের উপরও ইহার বিশেষ ক্রিয়া বর্ত্তমান দেখা যায়।

আক :—রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, স্নিগ্ধ, কফজনক, গুরু, মূত্রকারক ও শীতল; কচি আক শ্লেষ্মার উৎপাদক, মেদোবর্দ্ধক; মধ্যমবয়স্থার আক, বায়ু-পিত্তনাশক ও সরস; বৃদ্ধ আক রক্তজনক, বলকারক ও বীর্য্যোৎপাদক। দন্ত চর্ব্বিত আকের রস, রক্তপিত্তনাশক, চিনির ন্যায় বীর্য্যবিশিষ্ট, ও শ্লেষ্মাজনক। কলে নিষ্পেষিত আকের রস, ময়লাদি মিশ্রিত থাকায় বিকৃত হইয়া গুরু, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী হয়। আকের রস অগ্নিতে জ্বাল দিলে গুরু, বাতশ্লেষ্মানাশক, গুল্মনাশক ও সামান্য পিত্তকর হইয়া উঠে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মৎস্য মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মসলাদি।

আমিষ ও নিরামিষ লইয়া আবহমান কাল হইতে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে; এস্থানে আমরা তাহার কোন আলোচনা না করিয়া, শুদ্ধমাত্র মৎস্য ও মাংসের সাধারণ গুণাদি ও তাহাদের বিশেষ ২ প্রকারের পৃথক্ গুণাদি মাত্র বর্ণনা করিব।

মাংস

মাংসমাত্রেরই সাধারণ গুণ, বাতনাশক, বলপ্রদ, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকারক, গুরু, মেদবর্দ্ধক এবং পাকে ও স্বাদে মধুর। সদ্যমারিত জীবের মাংস অমৃত সদৃশ, রোগনাশক, মেদবর্দ্ধক এবং সুপথ্য; যে জীব নিজ হইতে মরিয়া যায়, তাহার মাংস বলক্ষয়কর,—গুরু এবং অতিসার রোগোৎপাদক জানিবে; সুতরাং এই প্রকার মাংস কাহারও সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধ জীবের মাংস প্রায়ই রোগোৎপাদক, অতএব উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; বালজীবের মাংস বড়ই মুখপ্রিয়, লঘু ও বলকারক; মাংসভোজীগণের পক্ষে ইহা অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক বিধায়, আমরা যথাসাধ্য এখানে উহার আলোচনা করিলাম।

আমাদের দেশে ছাগমাংসই সমধিক প্রচলিত; ইহা লঘু, বায়ুপিত্তকফনাশক, নাতি শীতল, অতিশয় বলকারক, রুচিকারক, মেদবর্দ্ধক; কচি ছাগশিশুর মাংস অতিশয় লঘু, স্বাস্থ্যপ্রদ এবং মহতী বলকারক; ইহার আর একটি গুণ জ্বরনাশক, সুতরাং জ্বর রোগীকেও (যদি উদরাময়াদি বর্ত্তমান

না থাকে) ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগীর পথ্য-ভাবে ব্যবহার করিতে হইলে, ইহার মাংসের যূষ্ বাহির করিয়া, মাংস বাদ দিয়া, শুদ্ধ যূষ্, স্বল্প মসলাদি সংযোগে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। খাসির মাংস গুরু, কফ-জনক, মাংসবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুনাশক ও পিত্তনাশক; বৃদ্ধ অথবা কোন রোগে মৃত ছাগলের মাংস, কর্কশ ও বায়ুজনক; ছাগমুণ্ড মেধাবর্দ্ধক ও রোচক; ইহার অণ্ডকোষ শুক্রবর্দ্ধক এবং যকৃৎ (চলিত কথায় যাহাকে মেটে বলে) চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক। ছাগের পরই পশু-মাংস মেষমাংস:—ইহা পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মজনক এবং গুরু; খাসী করা মেষ মাংস কিঞ্চিৎ লঘু; ইহারও শিশুর মাংস ছাগ-শিশুর মাংসের ন্যায় গুণকর।

কচ্ছপ মাংস:—বলকারক; বায়ুপিত্তনাশক ও ধ্বজ ভঙ্গ নিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিণ মাংস:—শীতল, মল-মূত্ররোধক, অগ্নিকারক, লঘু; কৃষ্ণসার হরিণের মাংসই তৃপ্তি-কর ও সুখাদ্য বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ছাগের ন্যায় সুস্বাদু নহে। খরগস্ মাংস:—শীতল, লঘু; স্বাস্থ্যরক্ষক, অগ্নি-কারক; পিত্তশ্লেষ্মনাশক এবং বায়ু সাম্যকারক; জ্বর এবং অতিসার রোগীকে ইহা নির্ভয়ে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; রক্তদুষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারক।

চতুষ্পদ জন্তুগণের মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত কয়টি জীবের মাংসই সমধিক প্রচলিত বলিয়া, উহাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল; অন্যান্য সমুদয় জীবের মাংসও সম্প্রদায় বিশেষে লোকে ভোজন

করিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে যখন সেই সমুদয় খাদ্য নহে, তখন তাহার সম্বন্ধে এস্থানে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

পশুমাংসের ন্যায় পক্ষীর মাংসও ভোজন প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখা যায় ; ইহাদের মধ্যে ধান্যক্ষেত্রচারী পক্ষীর মাংস লঘু ও সুপথ্য ; জলচর পক্ষীগণের মাংস বলকারক, স্নিগ্ধ এবং গুরুতর। লাবপক্ষীর মাংস :—অগ্নি-কারক, সুপথ্য, স্নিগ্ধ ; সাদা লাবের মাংস ত্রিদোষঘ্ন ও অতিশয় লঘু।

পক্ষী-মাংস

চড়াইয়ের মাংস :—লঘু, শীতল, স্বাদু, কফপ্রদ ও শুক্রজনক। পায়রার মাংস :—শীতল,গুরু, রক্তপিত্তশান্তিকর, বায়ুনাশক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। তিত্তিরী মাংস :—বলকারক ও ত্রিদোষঘ্ন ; সাদাই প্রশস্ত গুণকর। হংস, সারস ও বক প্রভৃতি জলচর পক্ষীর মাংস :—পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক, শীতল, মধুর ও গুরু। মুরগীর মাংস :—মেদবর্দ্ধক ; বায়ু-নাশক, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, চক্ষের জ্যোতিকারক, বলকর ও কফ-বর্দ্ধক ; জ্বরাদি রোগে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে (হজম শক্তি বর্ত্তমানে) রোগীকে ইহার যুষ্ পথ্যভাবে প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় পায়রা ও হাঁসের মাংসও কেহ কেহ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের মতে শিশু-মোরগ মাংসই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জানিবে। মুরগীর মাংসে সাধারণতঃ ছানাজাতীয় উপাদান অধিক থাকে। পশু মাংস অপেক্ষা পক্ষীর মাংস সুপাচ্য।

পক্ষীর ডিম্ব :—অনেকে আহার করিয়া থাকেন ; হাঁস

ও মুরগীর ডিম্বই চলিত দেখিতে পাওয়া যায়; ডিম্ব মাত্রেই শুক্রজনক, বায়ুনাশক এবং পুষ্টিকারক জানিবে; মুরগীর ডিম্ব অপেক্ষা হাঁসের ডিম্ব লঘুতর; অনেকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন যে, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যহ কাঁচা ডিম্ব খাওয়া উপকারক; এমন কি ১।২ ড্রাম মদ্যের সহিত হইলে আরও বলকারক ও স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে—এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; এ ব্যবস্থা আমরা সমীচীন বলিয়া বোধ করি না। হাঁসের ডিম্ব অত্যধিক ব্যবহারে বাতরোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। ইহাতে এল্‌বুমেন অধিক থাকায়, বহুমূত্রপ্রবণ অথবা বাতব্যাধিপ্রবণ ব্যক্তিগণের খাওয়া কর্ত্তব্য নহে; অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত লওয়া নিষিদ্ধ।

পক্ষীর ডিম্ব।

মাংস ভোজনে সাবধানতা

আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে মাংস বিশেষ তৃপ্তিদায়ক নহে; বরং সময়ে অনিষ্টকারকই হইয়া পড়ে—অবশ্য তাহা মাংসের দোষে যত না হউক, ভোজনকারীর অনবধানতা প্রযুক্তই বিশেষতঃ, উহা সংঘটিত হইতে দেখা যায়, কারণ জীর্ণাক্ষম, অথবা স্বল্প জীর্ণশক্তি-বিশিষ্ট লোকে যদি না বুঝিয়া যাহা তাহা আহার করে এবং তাহার ফলে [illegible]গ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আহার্য্যপদার্থকে দোষ না দিয়া আহারকারীকেই দোষী করা কর্ত্তব্য। এদেশে মাংস নিত্য ভোজ্যের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, মধ্যে মধ্যে ভোজন করাই কর্ত্তব্য; যদিই কেহ নিত্যভোজন করিতে

চাহেন ও তাঁহার জীর্ণশক্তি বিশেষ বলবতী থাকে, তবে অধিক মসলাদি সংযুক্ত না করিয়া উহা খাওয়া কর্ত্তব্য ; মসলাদি সমধিক ভাগে দেওয়া হইলে, মাংস আরও গুরুতর হইয়া পড়ে। পাকস্থলীর উপর নিত্য গুরুতর কার্য্যভার পড়িতে থাকিলে ক্রমে পাকস্থলী অবাধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং উহার দ্বারা নিয়মিত ভাবে কার্য্য সাধিত হয় না এবং তাহারই ফলে স্বয়ং উহাও বিকৃত হইয়া যায় এবং শারিরীক অন্যান্য যন্ত্রাদিও বিকৃত করিয়া ফেলে। মাংসের সহিত পেঁয়াজ দিলে উহা খুবই মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়। আমার এই কথায় হয়ত অনেকে বলিবেন যে "পেঁয়াজ বর্জ্জিত নিরামিষ মাংসই যদি খাইতে হয়, তবে না খাওয়াই ভাল"!! পেঁয়াজ সংযোগে যাঁহারা মাংসভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহা বাদ দিয়া ২।১০ দিন খাইলেই নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা বাদ দিয়াও কোন বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় না। আমরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন কথা বলিতে চাহি না ; পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকলেই নিত্য মাংস আহার করিয়া থাকে, কারণ তথায় মৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না এবং মাংসও সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা এখানে নিত্য যেমন মৎস্যের ঝোল খাইয়া থাকি, তাহারা সেই রূপ স্বল্প মসলাদি সংযোগে নিত্য মাংসের ঝোল খাইয়া থাকে। ঐ প্রদেশে যাইয়া নিজেরাও খাইয়া দেখিয়াছি যে, এই প্রকারে মাংস ভোজনে কোন প্রকার অসুখ করে না। তবে তাহারা তথায়

স্বল্প মসলা যুক্ত মাংস

পেঁয়াজ নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকে; আমাদের মতে অন্যান্য গরম মসলাদি পরিবর্জ্জনের সহ ইহারও "বিসর্জ্জন" হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে মাংসাহার সমধিক কর্ত্তব্য, সুতরাং আমাদের দেশে শীতকালেরই ইহা উপযোগী আহার।

আমিষের মধ্যে মৎস্যই আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত; বিশেষতঃ, অন্নগতঃ প্রাণ বাঙ্গালীর ইহা নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য। মাংসের ন্যায় মৎস্যও পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও উষ্ণ; সুতরাং কামাগ্নিভাবোত্তেজক বলিয়া হবিষ্যকারী এবং বিধবার পক্ষে ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে বিধান দেওয়া আছে। অপিচ সধবার পক্ষে ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য,এমন কি ইহার ব্যবহার "আয়তির" চিহ্ন বলিয়াই ব্যবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মৎস্য

মৎস্যের সাধারণ গুণ এই যে ইহা স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, কফপিত্তজনক, বায়ুনাশক, রোচক, মেদবর্দ্ধক, পুষ্টিকর এবং বলবর্দ্ধক; যাহাদিগের ক্ষুধাগ্নি বেশ দীপ্ত থাকে তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় উপকারক। মন্দাগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহার ব্যবহার সংযতভাবে এবং প্রকারভেদে বাছাই করিয়া হওয়া দরকার। পচা

মৎস্য ব্যবহারে সাবধানতা

অথবা বাসি মৎস্য সহজে কাহারও খাওয়া উচিৎ নহে; অপর্য্যাপ্ত ভাবেও ইহার ব্যবহার না করিয়া, নিয়মিত ও পর্য্যাপ্তভাবে মৎস্য ভোজন করিলে কোনই অপকার হইতে দেখা যায় না। অরন্ধন উপলক্ষে অনেকে বাসি মৎস্যের তরকারী বা

অন্ত প্রকারে ইহা ব্যবহার করিয়া বিপদগ্রস্ত,—এমন কি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছেন দেখা গিয়াছে। টাট্‌কা মৎস্য ব্যতীত, অজীর্ণ রোগীর বিশেষতঃ, অন্য মৎস্য খাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এখন বিশেষ বিশেষ মৎস্যের কিরূপ গুণ আছে দেখা যাউক। মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্যই শ্রেষ্ঠ; ইহা বায়ু-নাশক, গুরু, স্বাদু এবং অধিক পিত্তজনক নহে; রোহিত মৎস্যের মস্তক বিশেষ বলকারক; বড়জাতীয় এই মৎস্য ভাজা ইত্যাদি অধিক না খাইয়া, ঝোলের সহিত সুসিদ্ধ করিয়া ভোজনে তেমন অপকার দেখা যায় না; কিন্তু অধিক মাত্রায় অথবা ভাজা খাওয়ায় অপকার সম্ভাবনা। পরিপাক শক্তি স্বল্প থাকিলে ইহা খাওয়া উচিৎ নহে, বরং ইহার বাচ্চা পুঁটি মৎস্যই তাহাদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। পুঁটি মৎস্য-বাতশ্লেষ্মা নিবারক, স্নিগ্ধ, রোচক ও লঘু। কাতলা ও মৃগেল :—বলকর, বায়ুনাশক, রোচক, পিত্তনাশক কিন্তু শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ও গুরু; রোহিৎ মৎস্যের ন্যায় ইহাও দীপ্তাগ্নি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাত্র হিতকারক। ইলিশ :—মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, বলবর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মজনক, মেদবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য এবং বায়ু-নাশক; ইহা খুবই মুখরোচক কিন্তু আহারে বড়ই কষ্টদায়ক; যাঁহাদিগের পরিপাক শক্তি সুবিধাজনক নহে, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা বিষ সদৃশ। সমুদয় মৎস্য অপেক্ষা ইহাতে তৈল অধিক থাকে; ইহার তৈলও খাইতে বিশেষ সুস্বাদু, কিন্তু সুবিবেচনার সহিত ভোজন না করিলে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা; এই মৎস্য বাসি ও পচা আরও বিপদজনক; কত প্রাণী যে ইহা সেবনে

ওলাউঠাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব ইহার ব্যবহার অতীব সাবধানের সহিত হওয়া কর্ত্তব্য। অজীর্ণরোগী অথবা দুর্ব্বল ব্যক্তি যেন কদাচ ইহার আস্বাদ গ্রহণ না করেন। চাঁই :—গুরু, বলকারক, মধুর, ও স্নিগ্ধ; কিন্তু সহজপরিপাচ্য নহে। ভেট্‌কী মৎস্য রোহিতের ন্যায় গুণসম্পন্ন। শাল :—বায়ুপিত্তনাশক, বলকারক, কিন্তু কফবর্দ্ধক। বোয়াল :—গুরু, বলকারক, রক্তদূষক ও নিদ্রাকারক।

বেলিয়া :—মধুর,শীতল, পিত্তনাশক ও রক্তদোষনাশক; ইহা রোগীর পথ্যবিশেষে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রোগে ব্যবহৃত মৎস্য

শিঙ্গি :—বায়ুশান্তিকর, স্নিগ্ধ, রোচক ও লঘু; ইহা রোগীরপক্ষে বড়ই তৃপ্তিপ্রদ; জেয়ল মৎস্যও এই শ্রেণীস্থ এবং রোগীর পথ্য জানিবে। মাগুর :—বায়ুনাশক, বলকারক, লঘু এবং পুষ্টিকর, ইহাও রোগীর পথ্য। কই মৎস্যকেও আমরা এই রোগীর পথ্য শ্রেণীতে ধরিয়া থাকি; ইহা রুচিকারক, স্নিগ্ধ, মধুর, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। সরলপুঁটি :—পিত্তনাশক, শীতল, মধুর, বায়ুনাশক, রুচিকারক ও কফনাশক; অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা এবং পূর্ব্বোক্ত রোগীর পথ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট মৎস্য সকল বিশেষ উপকারক জানিবে।

চিঙ্গড়ী :—ক্ষুদ্রজাতীয় হইলে বায়ুপিত্তনাশক, লঘু ও রুচিকর; কিন্তু গল্‌দা চিংড়ী আহারে খুবই তৃপ্তি-

কর এবং পুষ্টিকারক হইলেও—বিশেষ উপকারক নহে; মন্দাগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উহা মোটেই সুফলপ্রদ নহে; বাদা জাতীয় অন্য এক প্রকার চিংড়ী পাওয়া যায়, উহাও পেটের অসুখোৎপাদক জানিবে। এই চিংড়ী ও ইলিশ মৎস্য হইতেই নানাপ্রকার উদরের গোলযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য কোন জাতীয় মৎস্যেই উহাদের ন্যায় অপকার হইতে দেখা যায় না; অতএব এই দুই জাতীয় মৎস্য ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

খয়রা মৎস্য :—সামান্য পিত্তজনক, বায়ুনাশক এবং সহজ পরিপাচ্য নহে। **টেঙ্গরা মৎস্য** :—বেশ রুচিকারক ও মেধাবর্দ্ধক বটে, কিন্তু বায়ুপিত্তজনক, মেদঃক্ষয়কর; ইহাও সহজ পরিপাচ্য নহে। **চেঙ্গ মৎস্য** মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল ও লঘু। **বানমৎস্য** :—রক্তপিত্তশান্তিকর, কফনাশক ও বলবর্দ্ধক।

ক্ষুদ্রমৎস্য মাত্রেই খাইতে মিষ্ট, বায়ুপিত্ত ও কফনাশক, রুচিবর্দ্ধক, লঘুপাক, বলবর্দ্ধক এবং সুপথ্য। **মৎস্যের ডিম্ব** অতিশয় পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধকর, লঘু, কিন্তু কফজনক ও গ্লানিকর। শুষ্ক মৎস্য বা নোনা মৎস্য কোন প্রকারেই উপকারক নহে; উহা দুষ্পাচ্য ও মলরোধক; বহু লোকেই নোনা বা শুষ্ক মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ প্রথা বড়ই দূষনীয় এবং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

ধনধান্যপুষ্পভরা, শ্যামাঙ্গলা বঙ্গজননীর গৃহে, তরীতরকারী ও ফলমূল যেমন নানাজাতীয় স্তরে স্তরে শোভমান দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এতকাল খাল-বিল-নদী-তড়াগাদিও প্রচুরভাবে

বঙ্গজননীর সেবানিরত থাকায়, এখানে কোনকালে মৎস্যের অভাব দৃষ্ট হয় নাই; অপিচ স্থান বিশেষে নানাজাতীয় (পূর্ব্ব-লিখিত প্রকার ব্যতীতও) মৎস্য দেখিতে পাওয়া যাইত এবং এখনও যায়, কিন্তু কালের বশে ক্রমশঃ খালবিলাদির অভাব প্রযুক্ত আমাদের দেশও মৎস্য শূন্য হইতে বসিয়াছে! প্রকৃতির অন্যতম সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছ সলিল-রাশিতে স্বচ্ছন্দবিহার করিতে না পাই-য়াই যে, এই মৎস্য বংশ লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট মৎস্যকুল বিনাশের কারণ নির্দ্দেশ জন্য বহু টাকা ব্যয়ে মৎস্য-কমিশন বসাইয়া উহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু কমিশন নির্দ্দেশিত পন্থা আমরা সম্পূর্ণ সমীচিন বলিয়া বোধ করি না। ইহাঁরা বলেন যে, ধীবরকুল বড়ই অশিক্ষিত সুতরাং তাহারা অজানিত ভাবে ডিম্ব সহিত মৎস্য মারিয়া মারিয়াই উহাদের বংশ লোপ করিতে বসিয়াছে; সেজন্য এখন কমিশন নির্দ্ধারিত পন্থায় ডিম্বপ্রসব সময় বাদ দিয়া মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা হইতেছে! হায় যদি তাহাই সত্য হইত, তবে বোধ হয় এতদিন অভিধান হইতেই মৎস্য নাম লোপ পাইয়া যাইত! লোকে কথায় বলে যে "মাছের মার পুত্রশোক"! অর্থাৎ মৎস্য এতই ডিম্ব প্রসব করে যে, তাহাদের তত্ত্বাবধারণা করা একেবারেই অসম্ভব; পুরুষ মৎস্য কতক ডিম্ব, প্রসব হইবা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিতে থাকে, কতক সংখ্যা স্রোতের জলে কোথায় ভাসিয়া যায় তাহার স্থিরতা থাকে না, কতক বা স্ত্রীমৎস্য সামলাইয়া

মৎস্যের বংশ লোপের কারণ

রাখিতে চেষ্টা করে। এইরূপই আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; তদুপরি নিত্য কত মৎস্য রাশি যে বধিত হইতেছে তাহারও সংখ্যা নাই, তথাপি উহা সমানরূপেই যোগাইত হইতেছিল। কিন্তু আজকাল হঠাৎ মৎস্যকুলের বংশ নাশের আশঙ্কা প্রকৃষ্টরূপে কেনই বা উদিত হইল? আমাদিগের মনে হয় যে খাল, বিল, নদী ও তড়াগাদির দূষিত ভাব ও শুষ্কতাই ইহার কারণ। যদি ঐ সমুদয় খাল বিলাদি খননাদি দ্বারা মৎস্যকুলের বাসস্থান-স্বচ্ছন্দতার উপর দৃষ্টি রাখা হয়, তাহা হইলেই মৎস্যকুল পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। পরিষ্কার জল পানীয় জন্য যেমন মনুষ্যকুলের প্রয়োজন তেমনি মৎস্যগণের পক্ষে ও ইহা নিতান্ত আবশ্যক! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজকাল ইহার অভাবেই নানাপীড়াদি সমুদ্ভূত হইয়া মানবকুলও যেমন আধিব্যাধিপীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, সেইরূপ মৎস্যকুলও বংশহীন হইয়া পড়িতেছে!!

মৎস্য রক্ষার প্রতিকার।

কোন্ মৎস্য প্রশস্ত

পুষ্করিণী জাত মৎস্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বায়ুনাশক; ইহার পরই খালবিলাদি জাত ও স্রোতস্বতী নদীজাত মৎস্য। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমুদয়ে সমুদ্রজাত নানাপ্রকার মৎস্যাদি পাওয়া যায়, উহা প্রায়ই সহজ পরিপাচ্য নহে; বর্ষাকালে নদীজাত মৎস্য অন্য সময়াপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে।

মাংস ও মৎস্যের যুষ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা আব-

শুক ; সিদ্ধ মাংসের যুষ রুচিকারক, বায়ুপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর এবং শ্রমশান্তি করিয়া থাকে। দুর্ব্বল ও রোগাজীর্ণগণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক ; কিন্তু ইহা প্রয়োগকালে রোগীর ঔদরিক কোন গোলমাল বর্ত্তমান আছে কিনা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ; এরূপ স্থলে আমাদের মতে মাংসের যুষ না দিয়া লঘু ও সহজ পরিপাচ্য ক্ষুদ্র মৎস্যাদির যুষ দেওয়া প্রয়োজন। আজকাল অনেকে কাঁচা মাংসের যুষও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। স্থলবিশেষে মাংসাদির যুষ, দেওয়া আবশ্যক হয় এবং তখন ইহা চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী হওয়াই কর্ত্তব্য ; ইহার বদলে মৎস্য-যুষ দেওয়া ব্যবস্থাও মন্দ নহে ; আমরা অনেক স্থলে এই ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। টাইফয়েড্ ইত্যাদি নিস্তেজকর রোগেও শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের মতানুযায়ী আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া সবিশেষ ফল পাইয়াছি।

মৎস্য ও মাংসের যুষ

এ পর্য্যন্ত আমরা যথাসম্ভব তরী-তরকারী ও ফলমূল এবং মৎস্য—মাংসের আলোচনাই করিয়া আসিলাম। তরী-তরকারী অথবা মৎস্য মাংস আমরা রন্ধন করিয়া ভোজন করি এবং সেইজন্য কতকগুলি মসলার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এখানে ঐ সমুদয় মসলা ও পান (তাম্বুল) সহিত যে মসলাদি আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার ও আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি ; ইহারা সাধারণতঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি, ভক্ষ্যদ্রব্যে সুগন্ধ প্রদান এবং

পরিপাক যন্ত্রের স্রাবণ ক্রিয়ার Secretion বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উহাদের পরিপাচ্য ও অপরিপাচ্যতার উপরও আমাদের সাধারণ পরিপাক শক্তি নির্ভর করিয়া থাকে। সরিষার তৈল দ্বারাই আমাদের সমুদয় আহার্য্য বস্তু (অম্ল ব্যতীত) প্রস্তুত হইয়া থাকে;

সরিষার তৈল

ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তদূষক। আজকাল কলের দ্বারা প্রস্তুত এই সরিষার তৈলে নানাপ্রকার ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত থাকায়, ইহা ব্যবহারে বেরি বেরি ইত্যাদি রকম রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যাইতেছে। যদিও হেল্‌থ অফিসারের মতে ভেজাল তৈল (সরিষার) বেরি বেরির কারণ নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি আমাদের মতে উহা একেবারে দোষবর্জ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। ঘানির খাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া যাইলে, যাহা তাহা মিশ্রিত কলের তৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে! রাই সরিষার গুঁড়া বা মাষ্টার্ড mustard অনেকে ভাতে পোড়া বা তরী তরকারীর সহ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা সামান্য গুরুপাকের হইয়া থাকে এবং অত্যধিক সেবনে গলা ও বুকজ্বালা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে এই সরিষা দিয়া এক প্রকার ঝাল কাসন্দি প্রস্তুত হইয়া থাকে, বিলাতে প্রস্তুত মাষ্টার্ড অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণে উত্তম; আমাদের এই প্রদেশেও আম্র (কাঁচা) সংযোগে সরিষা দিয়া একপ্রকার কাসন্দি প্রস্তুত হইয়া থাকে; এই শেষোক্ত কাসন্দিতে অম্ল সংযোগ থাকায় আস্বাদে মন্দ হয় না, অথচ ঝাল কাসন্দির ন্যায় গুরুপাকেরও হয় না। অজীর্ণ রোগীর ইহার ব্যবহারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রন্ধনের মসলা।

হরিদ্রাই :—প্রায় সমুদয় রন্ধন করা দ্রব্যেই ইহা মিশ্রিত করা হয়; ইহা ব্যবহারে রক্তদোষ, শোথ ও কামলা নষ্ট হইয়া থাকে; পিত্ত ও কফনাশক এবং বর্ণজনক ক্ষমতাও ইহার দৃষ্ট হয়; অনেক সময় অন্য মসলাদি না দিয়া, শুধু হরিদ্রা ও ধনিয়া সংযোগেই ঝোলাদি প্রস্তুত করাইয়া রোগী বা তদবস্থাপন্ন লোকের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ধনিয়া :—লঘু, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক, রুচি-কারক, ত্রিদোষনাশক; ইহা তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও কৃমি নষ্ট করে। জীরা :—তিন প্রকার যথা শুক্ল, কৃষ্ণ এবং কালোজী; তিনের গুণ কিন্তু একই প্রকার। ইহা ক্ষুধাবৰ্দ্ধক, স্মরণশক্তি-বৰ্দ্ধক, জরায়ুশোধক, রুচিকারক, চক্ষুর হিতকর, কফনাশক, পিত্তজনক, ও বলকারক। মরীচ :—(লঙ্কা) ক্ষুধাবৰ্দ্ধক, রোচক, দাহকর ও কফনাশক; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে সংযত হওয়া কৰ্ত্তব্য; অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, বুকজ্বালা, অগ্নি-মান্দ্য এবং অর্শ উৎপাদন করিতে পারে। স্থানভেদে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধেও বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইতে দেখা যায়; পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় লোকেই বঙ্গের দক্ষিণ প্রদেশস্থ লোক অপেক্ষা ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। অজীর্ণ ও অর্শ রোগীর পক্ষে ইহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

গোলমরীচ :—বিশেষ উপকারক; অনেক সময় লঙ্কা মরীচ না দিয়া গোলমরীচ ব্যবহারে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করান হইয়া থাকে; ইহা অতিশয় বায়ুনাশক, কফর এবং উৎকাশি প্রশমনক ও কৃমিনাশক। বাহাদিগের পক্ষে লঙ্কার ঝাল

সহ্য হয় না, তাহাদিগের জন্য ইহার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। হিং :—অনেক সময় বিশেষতঃ কলায়ি ডালের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা উষ্ণ, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রক্ত প্রবর্ত্তক; ইহা সেবন করিলে অনেক সময় যাবৎ উদ্গারে ইহার গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া, অনেকে ইহা পছন্দ করেন না। মেথি :—বায়ুনাশক, শ্লেষ্মানাশক, রুচিকারক এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক; রাঁধুনী :—রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পাচকও বায়ুনাশক। তেজপত্র :—লঘু ও তীক্ষ্ণ; ইহা বায়ু, কফ, গা বমি বমি ও অরুচি নাশ করে।

লবণ :—ভিন্ন রন্ধন চলিতেই পারে না; অলবণ সংযুক্ত কোন দ্রব্যই রুচিকারক নহে; ঝাল ও লবণ সমভাবে প্রয়োগ করিতে জানিলেই তাহাকে সুপাচক অথবা সুপাচিকা বলা হইয়া থাকে। ঝাল না হইলেও বরং খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু লবণ বিনা উহা প্রায় অসম্ভব। এই লবণ সাধারণতঃ আমরা সৈন্ধব, করকচ ও পাঙ্গা এই তিন ভাবে নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে সৈন্ধব ও করকচই বিশুদ্ধ এবং হিন্দুর ব্যবহার্য্য; পাঙ্গা লবণ গো-শূকরাদির রক্ত ও হাড় দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়, সুতরাং অস্মদ্দেশীয় হিন্দু মুসলমানের অব্যবহার্য্য। সৈন্ধব লবণ, ত্রিদোষনাশক, লঘু, শীতল, বলকারক, রোচক এবং চক্ষুর উপকারক ও অগ্নিদ্দীপক। করকচ লবণ নাতিশীতোষ্ণ, বায়ুনাশক, কফবর্দ্ধক; পাঙ্গা লবণ গুরু, শীতল, বায়ুনাশক হবিষ্য জন্য সৈন্ধব লবণই ব্যবহেয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে গুণ বিচার করিয়া দেখিলেও উহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

কোন কোন রোগে অবলবণ পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে; সম্প্রতি বার্লিন নগরীয় এক ডাক্তারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, শিশুগণের গাত্রে একজিমা (Eczema) দেখা যাইলে, উহাদিগকে লবণ বর্জ্জিত আহার্য্য পদার্থ খাইতে দেওয়ায়, একজিমা ৪।৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। ইহা পাঠে এই সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে যে, স্তন্যপায়ী শিশুগণের একজিমা, সম্ভবতঃ তাহাদের মাতা অথবা স্তন্যদাত্রীর অতিরিক্ত লবণ আহার জন্য উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং স্তন্যদাত্রী লবণবর্জ্জিত খাদ্য আহার করিতে আরম্ভ করিলেই, অচিরে শিশুকে ঐ পীড়া হইতে উন্মুক্ত করাইতে পারেন। পূর্ণবয়স্কের শরীরে একজিমা দেখা দিলেও এই ব্যবস্থায় বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। খাদ্যদ্রব্যে লবণ সংমিশ্রণ করা হয় কেবল উহা আস্বাদজনক করিবার জন্য, নতুবা ঐ লবণে পরিপাক ক্রিয়া অথবা শারীরিক অন্য কোন উপকার হয় না। একজিমা ব্যতীত শোথ এবং মূত্রযন্ত্রীয় (Kidney) অন্যান্য রোগেও ইহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।

অলবণ খাদ্য ব্যবস্থা।

পান :—রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্মনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নিবারক, এবং বায়ু ও শ্রমশান্তিকর। মসলাদি সহ আহারান্তে ইহা চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারা মুখের জড়তানাশ ও কান্তিবর্দ্ধন; হইয়া থাকে। ঘন ঘন ও অত্যধিক মাত্রায় ইহা সেবন

পান ও তাহার মসলাদি

বিধেয় নহে। কারণ তাহাতে দন্ত,দৃষ্টি,,কেশ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও অগ্নির বলহানি, বায়ু ও পিত্তের বৃদ্ধি এবং রক্তবিকৃতি উপস্থিত হয়। যাহাদিগের দন্ত দুর্ব্বল, তাহাদের ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; ক্ষুধার সময়েও ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে ক্ষুধার লোপ হইয়া থাকে।

সুপারিই:—পানের প্রধান মসলা; ইহা গুরু, শীতল, কফপিত্তনাশক, রোচক ও মোহকর। কাঁচা সুপারি, অগ্নিমান্দ্যকর, দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতাকারক এবং মোহ উৎপাদক। কিছুদিন পূর্ব্বে "পানে পোকা" সম্বাসে যে সমুদয় বিষাক্ত রোগীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয়ই সুপারির এই গুণ হেতু উদ্ভূত জানিবে। কাঁচা এবং কোন কোন প্রকারের সুপারি খাইয়া অনেক সময় বিশেষ "ঘোর" লাগে এবং শ্বাসবন্ধ হইয়া আইসার ন্যায় বোধ হয় এবং সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু ঘর্ম্মও হইতে দেখা যায়। পানের সহিত সুপারি অধিক খাইলে, উহা দন্তের মধ্যে লাগিয়া লাগিয়া দন্তবেষ্টের হানি করায় দন্ত নড়িয়া যাইতে পারে। চুণ:—পানের একটি প্রধান অঙ্গ; ইহা ব্যতিরেকে পান খাওয়া চলিতেই পারে না। ইহা বাতশ্লেষ্মা, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী এবং কৃমি নষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ উহাতে রেনাল্ কলিক (Renal colic) বা বৃক্ক শূল এবং পাথরী Gravel জন্মাইতে পারে। যাহাদিগের এই পীড়া বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের ইহা ব্যবহার না করাই কর্ত্তব্য। চুণের জলের আবার গুণ পৃথক দেখিতে পাওয়া যায়; (এক কোয়ার্ট

বোতল জলে এক ছটাক গুঁড়া চুণ মিশাইয়া ২৪ঘণ্টা যাবৎ উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলেই চুণের জল

চুণের জল প্রস্তুত হইয়া যায়।)

অজীর্ণতায় ইহা সেবনে মহদুপকার দেখা যায়; পেটফাঁপা ও অজীর্ণ অপচারজনিত দাস্ত হইতে থাকিলে শিশুগণকে দুগ্ধের সহিত সামান্য মাত্রায় ইহা সেবন করিতে দিলে, খুব সত্বর উক্ত-দোষ বিদূরীত হইতে দেখা গিয়াছে। বহুমূত্র, শূল ও অম্লপিত্ত রোগেও দুগ্ধের সহিত ইহার ব্যবহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

মৌরী :—বায়ু ও কফনাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, লঘু ও উষ্ণ; ইহা অগ্নিমান্দ্য, শূল, ক্রিমি, বমন কোষ্ঠবদ্ধতা, ও যোনিশূল নষ্ট করে। জ্বরে অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও গা বমি বমি ভাব বর্ত্ত-মানে, ইহা ভিজান জল ব্যবহারে অনেক স্থলে শান্তিলাভ হইতে দেখা যায়। যোয়ান :—রুচিকারক, লঘু, বমি ও শূল-নাশক এবং অগ্নিদীপক; ইহা ব্যবহারে অজীর্ণতা সম্বন্ধীয় উদর-রোগ, প্লীহা, গুল্ম ও ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল যোয়ানের আরক প্রায় অধিকাংশ অজীর্ণরোগীই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এলাইচ :—(বড়) অগ্নিকারক, লঘু ও উষ্ণ; ইহার দ্বারা গা বমি বমি, তৃষ্ণা, বমন প্রভৃতি বিনষ্ট হয়; ছোট এলাইচ :—শীতল, লঘু ও বায়ুনাশক। দারুচিনি :—বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক এবং শরীরের উৎকৃষ্ট বর্ণসাধক; মুখ-শোষ ও তৃষ্ণাও ইহা বিদূরীত করে। লবঙ্গ :—রোচক, শীতল, লঘু ও চক্ষুর হিতকর; ইহার ব্যবহারে কাশি, পেটফাঁপা, বমন, তৃষ্ণা ও হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে। প্রদীপের শীষে ইহা

দগ্ধ করিয়া সেবনে অনেক সময় উৎকাশি কমিয়া যায়।

জয়িত্রীঃ—উষ্ণ, রোচক, দুর্গন্ধনাশক এবং বর্ণের উৎকর্ষসাধক।

এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ও জয়িত্রী ইহারা প্রায়ই সমগুণ বিশিষ্ট; রন্ধনের মশলা রূপেও ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যাদি প্রায়ই উষ্ণ, সুতরাং ইহারা একত্রে গরম মশলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং মিষ্টদ্রব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই যথাসম্ভব সমুদয় খাদ্যদ্রব্যই আলোচিত হইয়া যাইবে; দুগ্ধ এবং জল পানীয় পদার্থ বলিয়া উহারা পৃথক্ স্থানে পরে বর্ণিত হইবে। দধি ঃ—উষ্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু; ইহা ভোজনে কফবৃদ্ধি হইয়া থাকে; রাত্রি কফবৃদ্ধির সময় "ন রাত্রৌ দধি-ভোজনং"ইতি নিষেধ বাক্যে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সকল প্রকার দধির মধ্যে গো দুগ্ধের দধিই উৎকৃষ্ট; ইহা অম্ল, রুচিপ্রদ, বায়ুনাশক ও পুষ্টিকর। মাহিষদধি গুরু, রক্তদূষক, কফজনক ও বায়ুপিত্তনাশক। পক্ক দুগ্ধজাত দধি রুচিকারক, সমুদয় ধাতুপুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক এবং বায়ুপিত্তনাশক। চিনির সহিত দধি সেবনে, শরীরস্থ বায়ুনাশ ও তৃপ্তিকর হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা গুরু-পরিপাক হইয়া পড়ে। অম্লদধি অপেক্ষা চিনিপাতা অথবা মিষ্টরসাধিক্যযুক্ত দধি অল্প দোষাবহ। দধির সর অগ্নিমান্দ্য-কর, বায়ুনাশক, কফপিত্তবর্দ্ধক ও কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং গুরু; ইহার মাত, অম্লে রুচিপ্রদ, লঘু, বলকারক, বায়ুকফনাশক, তৃপ্তিজনক ও তৃষ্ণা নিবারক; অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহার

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি

ব্যবহার উত্তম ব্যবস্থা। ঘোল ঃ—লঘু, প্রীতিজনক, অম্লরস, বায়ুনাশক এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগে সুপথ্য। জীর্ণ হইয়া উহা স্বাদুরসে পরিণত হয় বলিয়া, ইহাতে পিত্ত প্রকুপিত করে না এবং কফ নিবারণ করে। চিনি মিশ্রিত ঘোল বায়ুপিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক এবং রসালবৎ গুণকারী ; গরম দুগ্ধে কিঞ্চিৎ লেবুর রস দিয়া ছানা কাটাইয়া সদ্যোজাত ঘোলই আমরা প্রশস্ত মনে করি। বাসি দুগ্ধের ঘোল অপেক্ষা ইহা অধিক গুণসম্পন্ন ; অজীর্ণ-দোষসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা ইহা সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। ঘোল সেবী ব্যক্তি কখন পীড়াগ্রস্ত হয় না এবং রোগ বর্ত্তমানে উহা প্রবলতর হইতে পারে না। ঘোল হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘৃত উদ্ধৃত করিয়া লইলে, উহা অতিশয় লঘু ও সুপথ্য হয় ; ঘৃত উদ্ধার না করিলে, উহা গুরু, পুষ্টিকর ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক হয় ; সৈন্ধব লবনের সহিত ঘোল সেবনে বায়ু প্রশমিত, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত প্রশমিত এবং মরীচ ও পিপুল চূর্ণের সহিত সেবনে কফাধিক্য প্রশমিত হইয়া থাকে। মন্দাগ্নিতে ও অরুচিতে ঘোল অমৃততুল্য হিতকারী ; অতিসার, শূল, উদররোগ, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, ক্রিমি প্রভৃতি রোগও ইহাতে নিবারিত হইয়া থাকে।

দধি ও ঘোল

এতকাল পরে পাশ্চাত্য জগৎ ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়া আপনাদের আবিষ্কারের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন! প্যারিস নগরস্থ পাষ্টুর বিদ্যালয়ের প্রধান

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ঘোল ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ ডাক্তার মেট্‌চিন্‌কফই (Dr. Metchinkoff) এই বিষয়ের আবিষ্কারক। তিনি বলেন যে, ঘোলে ল্যাক্‌টিক্‌ আসিড (Lactic Acid) থাকায় উহা নিয়মিত সেবনে অকাল বার্দ্ধক্য জন্মিতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে যুক্তিদর্শন করাইয়া দেওয়া ব্যতীত, শুধু একটা কথা বলিলেই পণ্ডিতসমাজ তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং মেট্‌চিন্‌কফ সাহেবকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও দেখাইতে হইয়াছে, যথা :—"মানবের পরিপাকযন্ত্রের বিধান মধ্যে নানা প্রকারের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যাসিলাস্‌ (Bacillus) অর্থাৎ জীবাণু বর্ত্তমান আছে এবং তাহারা পরিপাকযন্ত্রীয় নলপথের সাধারণ বাসিন্দা; বাস্তবিক যদি উহারা তথায় বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে পরিপাক সম্বন্ধীয় কতক কার্য্য সম্পাদন হইতেই পারিত না। বিশেষতঃ, বৃহদন্ত্রে ব্যাসিলাস্‌ কোলাই Bacillus coli নামক এক প্রকার জীবাণু অধিষ্ঠান করিয়া থাকে; উহারাও ক্ষতিকারক নহে এবং ঐ স্থানের স্বভাবত প্রজা হইয়া পরিপাক সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহারা সময়ে সময়ে অসংখ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া উঠে। ভ্রমাত্মক এবং অবৈধ খাদ্যাদি ভোজন (যাহা আজকাল সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে) হেতুই উহারা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমাদের শরীর মধ্যে এই ব্যাসিলাস্‌ কোলাই নামক জীবাণু অস্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হইলেই, আমাদের শরীরগঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া, অকালেই বার্দ্ধক্য জনোচিত অবস্থা আনাইয়া দেয়। এই অকাল

অকাল বার্দ্ধক্য ও ঘোল।

বার্দ্ধক্যাবস্থা যদি বিদূরণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে অন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত জীবাণুর বর্দ্ধিতসংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন। ল্যাক্‌টিক্ আসিডের (Lactic Acid) এই জীবাণু হ্রাসকারী ক্ষমতা বর্ত্তমান আছে এবং এই ল্যাক্‌টিক্ আসিড্ অতি সহজ উপায়েই ঘোল হইতে পাওয়া যায়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঘোল সেবনে দীর্ঘজীবন লাভের সম্ভাবনাও যে আছে তাহা ডাক্তার সাহেব বলিয়া দিতেছেন। মেট্‌চিন্‌কফ্ সাহেব নিজ যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ জন্য, কয়েকটি জন্তুর উপর এই ল্যাক্‌টিক আসিডের প্রয়োগকালে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন তাহাও ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ঘোল সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ হউক বা না হউক, উহা যে পরিপাক যন্ত্রের নানা প্রকার উপদাহ—পাকাশয়ের প্রতিশ্যায় হইতে রক্তামাশয় পর্য্যন্ত সমুদয় বিকৃতাবস্থারই—বিনাশ করিয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। পাশ্চাত্য জগৎ এতকাল পরে ইহা যে, জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন তাহাও সুখের বিষয়! কিন্তু ভারতবর্ষ যে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই তথ্য অবগত ছিল, তাহা অন্যদেশীয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা—ভারতবাসীরাও—এখন আর অবগত নহি !!

ঘৃত :—সাধারণতঃ অগ্নিদীপ্তিকর, চক্ষুর হিতকর, বায়ুপিত্তশান্তিকর, লাবণ্যবর্দ্ধক, তেজস্কর, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ এবং শ্লেষ্মজনক ; ঘৃতপানে রক্তদোষ, ব্রণ, শূল ইত্যাদি উপশমিত হয়। সকল ঘৃত অপেক্ষা গব্য অর্থাৎ গাওয়া

ঘৃতই শ্রেষ্ঠ; ইহা ত্রিদোষনাশক, শীতল, অগ্নিকারক এবং চক্ষের বিশেষ হিতকর; স্মৃতিশক্তি, কান্তি, তেজ ও ওজঃ বর্দ্ধণকারী, পবিত্র, বলকারক, গুরু, রোচক, সুগন্ধযুক্ত এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর। প্রত্যেক আধিদৈবিক ক্রিয়ায় হিন্দুর ইহাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। "চোখ ওঠায়" চক্ষে ইহা প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য লাভ হইতে দেখা গিয়াছে; যেমন কেন ক্ষত হউক না, ইহার প্রয়োগে সুফল ফলিবেই ফলিবে, কিন্তু এই গব্যঘৃত বিশুদ্ধ হওয়া চাই। কাঁচা ঘৃত, পাতে খাওয়া সকলের শরীরে সহ্য হয় না, উহা গরম করিয়া খাওয়া উচিত।

ঘৃত ও তাহার গুণাদি

গাওয়া ঘৃত খাইয়া প্রায়ই কোন বিশেষ অসুখাদি হয় না, কিন্তু "ভয়সা" অর্থাৎ মাহিষ ঘৃত খাইয়া অসুখ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে—কিন্তু তাহাও শুদ্ধ ঘৃতের দোষে নহে—ঐ ঘৃত সহ "ভেজাল" মিশান জন্যই প্রায় স্থলে অসুখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। গব্যঘৃতে ভেজাল মিশাইবার যো নাই, কারণ তাহাতে গব্যঘৃতের প্রকৃত সুগন্ধ রক্ষা হয় না। ভয়সা ঘৃতও রক্তপিত্তশান্তিকর, বায়ুনাশক, গুরু, শীতল ও বৃষ্য। সহরে খাবারের দোকানের এই ভেজাল ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্যদ্রব্যাদি খাইয়াই যে সহরস্থ পনের আনা লোক, অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা আমরা পূর্ব্বেও একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। পয়সা দিয়া খাবার ভ্রমে আমরা বিষ ক্রয় করিতেছি, এই কথা যতদিন আমরা বুঝিতে

ভেজাল ভয়সা ঘৃতই অজীর্ণের কারণ

না পারিব, ততদিন অজীর্ণ রাক্ষসীর হাত হইতে নিস্তারের উপায় বড় দেখি না! ইহাই যে একমাত্র কারণ, আমরা এরূপ বলি না, তবে ইহাও যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইবার আশঙ্কা নাই। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত পান করিলে, পিত্তজনিত দাহ, রক্তদোষ, নেত্ররোগ ও বায়ু নষ্ট হয়; পূর্ব্বদিবসীয় দধিজাত ঘৃত, অতিশয় রোচক, বলকর, ও পুষ্টিকারক। ভোজন জন্য নূতন ঘৃতই ব্যবস্থেয় জানিবে এবং শ্রমশান্তি, বল-ক্ষয় ও চক্ষুরোগেও নূতন ঘৃত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এক বৎসর পূর্ব্বকার প্রস্তুত করা ঘৃতকেই পুরাতন ঘৃত বলা যায়। ইহা ত্রিদোষনাশক। ঘৃত সমুদয় যতই পুরাতন হইবে, ততই উহাদের গুণবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বক্ষে শ্লেষ্মা বসিয়া যাইলে, পুরাতন ঘৃত মালিশ দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। বালক বা বৃদ্ধের পক্ষে, কাশরোগে অথবা তজ্জন্য উৎপন্ন রোগে, তরুণ পীড়ায়, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরে ঘৃত ভোজন নিষিদ্ধ।

নূতন ও পুরাতন ঘৃত

নবনীত:—সদ্য উদ্ধৃত হইলে লঘু, শীতল, স্মরণশক্তি-বর্দ্ধক ও স্বাদু হইয়া থাকে; দুগ্ধোৎপন্ন নবনীত চক্ষুর হিত-কর, রক্তপিত্তনাশক, শীতল, বলকারক এবং অতিশয় স্নিগ্ধ। ইহা শিশু, বালক ও বৃদ্ধ, সকলেরই পক্ষে অগ্নিকর, হিতকর, এবং কান্তিবর্দ্ধক।

আমরা নিত্য যে সমুদয় মিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা

মিষ্ট দ্রব্যাদি

সমুদয়ই পূর্ব্ববর্ণিত দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সহ চিনি, মিছরী অথবা গুড় সংযোগেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং এই তিন দ্রব্যের পৃথক আলোচনা করা হইলেই আর নামানুসারে মিষ্টান্নের সমালোচনা করার প্রয়োজন হইবে না।

গুড় :—স্নিগ্ধ, গুরু, ক্রিমিজনক, মূত্রশোধক, শ্লেষ্মাকারক, বাতনাশক, কিন্তু পিত্তনাশক নহে। পুরাতন গুড়ই অগ্নিকারক, বায়ুপিত্তনাশক, রক্তশোধক, পুষ্টিকর এবং ঔষধরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। নূতন গুড় অগ্নিকারক বটে, কিন্তু উহা সেবনে কফ ও ক্রিমি উপস্থিত হয়। আদার সহ নিত্য গুড় সেবনে শ্লেষ্মা, হরিতকীর সহ সেবনে পিত্ত, এবং শুঁঠের সহ সেবনে বায়ুরোগ নষ্ট হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে। খাঁড় গুড়, শীতল, বায়ুপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর এবং বলকারক ; একমাত্র ইহা ব্যতীত হবিষ্যের জন্য অন্য গুড়ের ব্যবস্থা নাই। খেজুর ও ইক্ষু হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহাদের নামেই গুড় দুই প্রকারে প্রচলিত। (উভয়ের পৃথক গুণ জন্য খেজুর ও ইক্ষুর গুণ-বর্ণিত স্থান দ্রষ্টব্য)।

নূতন ও পুরাতন গুড়

চিনি :—বায়ুপিত্তনাশক, রক্তদোষকারক, সুশীতল এবং দাহশান্তিকর। মিছরী :—লঘু, বায়ুপিত্তশান্তিকর, রক্তদোষনিবারক, ভেদক ও বলকর। উভয়ই এক গুণসম্পন্ন, তবে মিছরী অধিকন্তু বায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক বলিয়া

চিনি ও মিছরীর গুণ

অধিক উপকারক। পেট গরম অর্থাৎ অজীর্ণাদি নাশ জন্য মিছরী ভিজান জল পানের ব্যবস্থা আছে, চিনি ভিজান জলে উহা হয় না। মধু :—শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, রুচিকারক, স্বরের উৎকর্ষসাধক, মেধাজনক ও অল্প বায়ু প্রকোপক। ইহা সেবনে ক্রমি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, বমি, দাহ ইত্যাদি উপশমিত হয়। মধুর মধ্যে মৌমাছি কর্তৃক সঞ্চিত মধুই লঘু এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পদ্মমধু নেত্রের পক্ষে সবিশেষ উপকারক।

অজীর্ণরোগীর পক্ষে মিষ্টদ্রব্যাদির অযথা ব্যবহার বড়ই কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় মিষ্টদ্রব্য ভোজনে ক্রমির উপদ্রবও বাড়িয়া উঠে; এ কারণ মিষ্টদ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধেও সংযতভাব ধারণ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পানীয় প্রস্তাব।

জল, দুগ্ধ, মদ, চা ইত্যাদি।

পানীয়ের মধ্যে জলই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব জীবের অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ; ইহার অন্য নাম, অমৃত ও জীবন। যেমন বায়ু বিনা জগতে জীবের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ এই জল বিনাও জীব সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না। ইহা বলকর,

জলের সাধারণ গুণ

তৃপ্তিজনক, শীতল, লঘু, সতত হিতকর, ও অমৃতসদৃশ জীবনীশক্তিসম্পন্ন। ইহা দ্বারা শ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মলরোধ, বমি ও অজীর্ণ প্রভৃতিও নিবারিত হয়। ধূলিকণা বা ময়লাদি বিবর্জ্জিত বৃষ্টির জলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; পর্ব্বত গাত্র বিধৌত হইয়া যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে, উৎকৃষ্ট পানীয় জল* হইতে পারে। এই প্রকারে সংগৃহীত জল দ্বারাই সমুদয় জব্বলপুর সহরে জল সরবরাহ হইয়া থাকে; এই জলের রিজার্ভায়ার (Reservoir) ঐ স্থানের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ। এই জল বায়ুপিত্তনাশক, লঘু, তৃপ্তিকারক, আহ্লাদজনক, পাচক ও বুদ্ধিপ্রদ।

ইর জল

বর্ষাকালের বৃষ্টির জল বিশেষ উপকারক নহে। শিলাজাত জল বা বরফ জল অমৃতসদৃশ, কিন্তু গুরু, ঘন, পিত্তনাশক ও বাতশ্লেষ্মজনক; ইহা বায়ু এবং মলকে স্তম্ভিত রাখে।

অনেকে গ্রীষ্মকালে আহার সময়ে বরফ জল পান করিয়া থাকেন; ইহা পরিপাকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, কারণ পাকস্থলিতে একই সময়ে গরম ও অতিশয় শীতল দ্রব্য যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেমন অতিশয় গরম দ্রব্যে হজম ক্রিয়া ব্যাঘাতযুক্ত হয়, সেইরূপ অতিশয় শীতল দ্রব্যেও উহা পরিপাকের পক্ষে বাধা জন্মাইয়া থাকে। হস্তের পশ্চাৎভাগে একখণ্ড বরফ রাখিলে দেখিতে পাইবে যে, ক্ষণেক পরেই উহার চর্ম্ম মলিন (ফেকাশে) বর্ণ পরে লাল ও গরম হইয়া

উঠিয়াছে; চর্ম্মের উপরে যাহা দেখা যায়, পাকস্থলীর মধ্যেও যাইয়া বরফ তাহাই উৎপাদন করে জানিবে। সুতরাং বরফ বা বরফ জল পানে পাকস্থলীর আবরণ রক্তাধিক্যযুক্ত (congested) হইয়া ডিস্পেপ্সিয়া উৎপন্ন করিতে সাহায্য করে। তৃষ্ণা নিবারণ কল্পেও যাঁহারা এই বরফশীতল জল গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বুঝা উচিৎ যে, ইহাতে পিপাসা না কমাইয়া বরং আরও বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় ইহা পান করিলে পেট গরম হইয়া পড়ে; ইহার ফলস্বরূপ উদরাময়াদিও দেখা দিতে পারে। ওলাউঠাদি পীড়ায় অতিরিক্ত তৃষ্ণা বর্ত্তমানে, আমরা বরফ জল দেওয়া দূরের কথা, তৎপরিবর্ত্তে সহ্যমত গরম জলই পানীয়ের জন্ম ব্যবস্থা করিয়া থাকি। অতিরিক্ত বরফ ব্যবহারে যে কত বিপদ সংঘটিত হইতে পারে তাহা এখানে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে।

বরফ জলে অজীর্ণতা

বরফ ও তৃষ্ণা

বৃষ্টির জলের নিম্নেই নদীর জল প্রশস্ত—এই নদীর জল খরস্রোতযুক্ত নদীর হওয়া চাই—ও ইহা লঘু; শৈবলাদি সঞ্চিত, স্রোতোহীন অথবা স্বল্পস্রোতা নদীর জল গুরু জানিবে। স্রোতস্বতী নদীর জল সুপেয় হওয়ার কারণ এই যে, নদীমধ্যে নানাপ্রকার আবর্জ্জনাদি পতিত হইতে থাকিলেও,স্রোতোবেগ এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বায়ুতে উন্মুক্ত (exposed) থাকায় ইহার দূষিতভাব দাঁড়াইতে পারে না। এই কার-

সেই হিমালয় পর্ব্বতোদ্ভূত নদী সকলের জল বিশেষ উপকারক। সকল নদীর মধ্যে আবার গঙ্গার জলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গঙ্গার জল

এখানে ধর্ম্মভাবের কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং আমাদের দেশীয় লোকের কথাও বলিতে চাহি না। বিদেশীয় পর্য্যটক সুবিখ্যাত মার্ক টোয়েন (Mark Twain) সাহেব রাসায়নিক উপায়ে সমুদয় জল পরীক্ষা দ্বারা, এই গঙ্গাজলই একমাত্র কীটাণুনাশক (Bacilli-destroyer) বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। সকল জলেই কীটাণু ছাড়িয়া দিলে, সজীবাবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গার জলে উহা অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে "হিন্দুগণ এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আধুনিক কালের বহু পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন—এমন কি আধুনিক সভ্যযুগের অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মাইবার সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও, এই বিষয় তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচর ছিল না—তাই গঙ্গাজলকেই তাঁহারা পবিত্রতম বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"

ভাই হিন্দু! আধুনিক সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু! এখন বুঝিলে কি যে তোমাদের পুরাকালের ঋষিগণ কেবল মাত্র ফলমূলাদি ভোজনকারী থাকিয়া অথবা কাল্পনিক ঘটনায় পুরাণাদি বর্ণন করিয়া যান নাই!!! ইতিহাসের আবরণে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সার, সমুদয়ই দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে

হিন্দুর পুরাণ গ্রন্থ

সংগ্রহ করিয়া, জটিলতা টুকু মাত্র বাদ দিয়া তোমাদের সুখ

শান্তি, তথা মোক্ষপ্রাপ্তির পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। মনে করিও না যে, বিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান, তোমার ঘরে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষাও কিছু নূতন জিনিষ দিতে পারিয়াছে! রামায়ণে পুষ্পকরথের কথা শুনিয়া আমরা হাস্য করিতাম, কিন্তু আজকাল "এরোপ্লেন" বা উড়ো জাহাজের কথা শুনিয়া বা দেখিয়া কি আর হাসিয়া থাকি? এখন স্বতঃই মনে হয় হয়ত তখনও ইহাই ছিল! যতক্ষণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আমরা পূর্ব্বতন ঋষিগণের গুণবত্তা ও তাঁহাদের দর্শন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় না পাইতেছি, ততক্ষণ ত আর আমরা উহা মানিয়া লইতেছিনা! হায়! এতই আমরা পরমুখাপেক্ষী!!!

নদীজলের নিম্নেই নির্ঝর জল; ইহা রুচিকারক, লঘু পিত্ত ও কফনাশক, কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং মধুর; অজীর্ণতাদোষ নিবারণজন্য অনেক সময়ে, কোন কোন বিশিষ্ট Spring water অর্থাৎ নির্ঝর জল ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। সচরাচর আমাদের দেশীয় "সীতাকুণ্ডের জল" ও "ঘাটশিলার জল" এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদেশীয় এই জাতীয় জলের মধ্যে "আপেণ্টা" "ভিচি" প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ। পল্লীগ্রামে এবং যথায় নিকটে নদী বর্ত্তমান নাই, তথায় প্রায়ই ইন্দারা অথবা কূপজলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যে ইন্দারা বা কূপ হইতে সর্ব্বদা জল উত্তোলিত হইয়া থাকে এবং গভীর হইতে দেখা যায়, অনেক সময় তাহার জল নির্দ্দোষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দারার জল সুস্বাদু হইলে উহা বায়ু-

পিত্তনাশক হয়; কূপ জলও স্বাদু হইলে লঘু, পথ্য ও ত্রিদোষঘ্ন হয়, কিন্তু এই উভয় জলই ক্ষারগুণবিশিষ্ট হইলে অতিশয় পিত্তকারক হয়। সরোবর যদি প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে, উহার জল নিঃসঙ্কোচে পানীয় রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সরোবর যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে অর্থাৎ কোন প্রকার ময়লা আবর্জ্জনাদি পতিত অথবা বিধৌত হইতে না পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই দৃষ্টির অভাব বশতঃই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত সরোবরাদি মফঃস্বলে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ খনিত হইয়াও তাহাদিগেরই বিনাশ পথ প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে! ঐ সমুদয় পুষ্করিণী কত বৎসর পূর্ব্বে খনিত যে হইয়াছে হয়ত তাহার ঠিকও নাই; মধ্যে২ পুনরায় মাটি খনিত হইয়া, উহার পূর্ণসংস্কার হওয়া দূরের কথা, তদুপরি যে শৈবালদল জন্মাইয়া সবুজবর্ণ পানায় উহা ভরিয়া গিয়াছে, তাহাও কদাচ অপসারিত হয় না! ইহার উপর রাস্তার ময়লাদি বিধৌত হইয়াও ইহার মধ্যে পড়িতেছে এবং সরোবরতীরস্থ গাছপালা হইতেও পত্রাদি পতিত হইয়া সময়ে তন্মধ্যেই পচিয়া যাইতেছে। এই গলিত পত্রাদি পরিশোভিত, শৈবালপানাদি পূর্ণ, নীলবর্ণের বদ্ধ জলই, হতভাগ্য পল্লীবাসীদের একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইতে অনেক সম.. খা গিয়াছে। এই জলেই তাহাদের স্নান, ইহাতেই তাহাদের বাসনাদি মার্জ্জন। ক্ষারসংযুক্ত বসনাদি

অন্যান্য জলাদি

বদ্ধ জলই ম্যালে-রিয়ার আকর

পল্লীগ্রামের জলকষ্ট

ধৌতকরণ, ইহাতেই মলমূত্রাদি বর্জ্জন, এবং সর্ব্বোপরি ইহাই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে!!! এরূপ স্থলে ম্যালেরিয়া আসন জুড়িয়া বসিবে না ত কি হইবে? এইসব আবর্জ্জনাদিপূর্ণ বদ্ধ স্থানেই মশকাদি জন্মিয়া থাকে, তাই মশক মারিলেই ম্যালেরিয়া নাশ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে! মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ যে আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে তাহা স্বীকার করি,কিন্তু তাই বলিয়া যে মূল বিষ নাশ না করিয়া উহার বাহক বিনাশ করিলেই আর ম্যালেরিয়া ভয় থাকিবে না, তাহা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য নহি।

যে কূপ বা ইন্দারার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন "কূয়ো পায়খানার" অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে না হয়, (যাহা পল্লীগ্রামে অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে) এবং শুষ্ক পত্রাদি পড়িয়া উহা আবর্জ্জনা যুক্ত হইতে যাহাতে না পারে এপক্ষে সতত বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। যে জল ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা বিশুদ্ধ কি অবিশুদ্ধ নিম্ন উপায়ে অতি সহজেই অবগত হইতে পারা যায়:—পার্ম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাশ (Permanganate of po'ash) বা কণ্ডির তরল সার(Condy's fluid) স্বয়ং দেখিতে বেগুনে অথবা ঈষৎ লাল (Pink) বর্ণের কিন্তু দূষিত জলে উহা মিশাইলে বাদামী বর্ণে পরিবর্ত্তিত অথবা একেবারে বর্ণহীন হইয়া যায় দেখিতে পাইবে। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ইহাতে পারম্যাঙ্গানেট এবং মল আপনাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা

এক গ্যালন জলে ৪ ফোঁটা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য মিশাইলেই উহার বেশ পরিশোধন হইতে পারে ; কূপ বা ইন্দারার জল পরিস্করণ জন্য ২ ঔন্স অতরল পারমাঙ্গানেটই যথেষ্ট। যে পর্য্যন্ত কূপাদির জল ঈষৎ ভাবে লাল বর্ণ ধারণ করিতে না দেখা যায় সে পর্য্যন্ত উহা মিশ্রণ করা প্রয়োজন। দেখিতে পরিষ্কার হইলেই যে জল বিশুদ্ধ হইতে পারে তাহা মনে করিওনা ; এক ফোঁটা জলের মধ্যে ৫০০, ০০০, ০০০ পঞ্চাশ কোটি কলেরা বা অন্যান্য রোগবীজের জীবাণু অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে, অথচ তাহা তোমার চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায় না ! ! !

জল পরিস্কৃতি করণ

মফঃস্বলে সুপেয় নির্দ্দোষ পানীয় জল পাওয়া আজকাল বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, তাই এখানে সহজ উপায়ে জল পরিস্করণের ২।১টি পন্থা দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আমাদের বিশ্বাস এই উপায়ে পানীয় জল পরিস্করণ করিলে, সহজেই দূষিত পানীয় সেবন হেতু উদ্ভূত পীড়াদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। (১) জল অগ্নিতে ফুটাইয়া লইলেই উহার সকল দোষ অপনোদিত হইতে দেখা যায় ; উষ্ণ করিলে জলের কেবলমাত্র যে অধিকাংশ অর্গানিক (Organic) দূষিত পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, ইহাতে ইনর্গানিক (Inorganic) লাবনিক পদার্থও (salts)—যাহা দ্রবণ অবস্থায় জলের সহিত বিগলিত (dissolved) থাকে—অধঃক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জল যদি ঈষৎ উষ্ণাবস্থাতেই খাওয়া হয়, তাহা হইলে আরও ভাল, কারণ উহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প

দুই প্রহর অর্থাৎ প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগে, এবং সিদ্ধ কৃত শীতল জল এক প্রহর অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা কিন্তু ঈষৎ উষ্ণ জল ১।৷০ ঘণ্টার মধ্যেই হজম হইয়া যায়। (২) কোন পাত্রে করিয়া জল, সমুদয় দিবস রৌদ্রে এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণে, অভাবে শিশিরে রাখিলেই উহা পরিশোধিত হইয়া লঘু, শীতল, অমৃততুল্য ও ত্রিদোষনাশক হইয়া উঠে। এই জল অন্তরীক্ষ জল সদৃশ গুণকর, বলকর এবং মেধাবৰ্দ্ধক জানিবে। (৩) জলে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি অথবা নির্ম্মলী ফল ঘষিয়া থিতাইয়া লইলেও জল বেশ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। কিন্তু এ ভাবে জল পরিষ্করণ প্রথা আমরা অনুমোদন করি না; ইহাতে প্রায় অম্ল উৎপাদন করে এবং অচিরে ডিস্পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণতা উদ্ভূত হইতে পারে। (৪) জল ফিল্‌টার করিয়া লওয়া। আজকাল বাজারে, ছোট বড়, কাঁচের অথবা চিনামাটির নানা প্রকার ফিল্‌টার বিক্রীত হইয়া থাকে। যাহাদের পক্ষে ইহা ক্রয় করা সম্ভবপর না হয়, তাহারা নিম্ন উপায়ে অতি সহজেই পানীয় জল পরিষ্কৃত করিতে পারেন; যথা:—একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ত্রিপদের উপর পর পর ৪টি মাটির কলসী রাখিবে; ইহার উপরের ৩টি সছিদ্র এবং সর্ব্ব নিম্নটি ছিদ্র রহিত হওয়া চাই; দ্বিতীয়ে কাষ্ঠের কয়লা, তৃতীয়ে বালি বা প্রস্তর খণ্ড পরিপূরণ করিয়া রাখিবে; সর্ব্বোপরি এবং সর্ব্বনিম্ন কলসদ্বয় শূন্য থাকিবে। এখন উপরের কলসে জল ঢালিয়া দিলে, উহা কলসীর তলস্থ ছিদ্র দিয়া অল্পে অল্পে আসিয়া, কয়লা ও বালির ভিতর দিয়া আসিবার সময়,

দেশী সহজ ফিল্‌টার

বেশ পরিস্কৃত হইয়া, নিম্নস্থ কলসীতে পতিত হইবে। তলস্থ কলসীর মুখে একখানি পরিষ্কার [illegible] বাঁধিয়া রাখা ভাল।

সময়ে সমুদয় ফিল্‌টারই ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে যদি উহা পরিস্কৃত করা না হয় তাহা হইলে, যে জীবাণু সকল তাড়াইবার জন্য উহার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া থাক তাহারই পরিসরকল্পে ইহা সাহায্য করিবে জানিও; অর্থাৎ উহার মধ্যে নানা জীবাণু সৃজিত হইয়া পানীয় জল দূষিত করিয়া দিবে। মাটির কলসীর ফিল্‌টারের কয়লা বালিও, মাসে অন্ততঃ একবার বদলাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধ করিয়া এই প্রথায় যদি জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সেই জল বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে আমাদের দেশের বড় বড় সহরে, সাধারণের পানীয় জন্য নদী বা দূরবর্ত্তী পাহাড়ের গাত্র হইতে, জল আনাইয়া ফিল্‌টার করতঃ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এজন্য ঐ সব স্থানে (পূর্ব্বের ন্যায় কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদির দূষিত জল ব্যবহার বন্ধ হওয়ায়) সহরবাসীগণের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে। (৫) বকযন্ত্র দ্বারা জল পরিস্রুত (Distilled) করিয়া চোঁয়াইয়া লওয়া প্রথা অতিশয় উত্তম। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিস্কৃত জল এবং ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জল আস্বাদবিহীন হয় বলিয়া, পানীয় জল তেমন ব্যবহার কেহ করে না।

অনেকের ধারণা আছে যে, সোডা লেমনেড ইত্যাদি

এরেটেড (Ærated) জল পান করিলেই, দূষিত জলপানের বিষময় ফলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা সত্য নহে, কারণ সোডা-জল প্রস্তুতকারকেরা অনেক সময়, দূষিত জল ব্যবহারেই উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাতে সীসক অথবা কলের তৈলও লাগিয়া থাকিতে পারে। উহারা প্রায়ই জল ভাল করিয়া ফিল্‌টার বা উষ্ণ করিয়া লয় না। বাজারের সোডা ইত্যাদি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করা অপেক্ষা, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে, যাহাতে সহজেই পানীয় জন্য জল শোধন করিয়া লইতে পারা যায় তাহা করাই যুক্তিসঙ্গত। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, জলের সহিত কিঞ্চিৎ এল্‌কোহল মিশাইয়া লইলেই আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাকারীগণ বোধ হয় জানেন না যে, জল গরম করিলেও উহা হইতে কোন কোন জীবাণুর জীবনীশক্তি লুপ্ত হয় না!! সুতরাং মদের সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা যে নির্দ্দোষ হইতে পারে ইহা কেমন করিয়া বলা যায়?

তৃষ্ণায় সোডা লেমনেড

এখানে আমরা আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন মনে করি। জলের কঠিনত্ব (Hardness) ও কোমলত্ব (Softness) ভাবের কথা শুনিয়া হয়ত আপনার মনে অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় বাস্তবিকই উহা প্রমাণিত হইয়াছে দেখিবেন। এই কঠিনতা আবার (১) অস্থায়ী (কার্ব্বনেট্ অব্ লাইম মিশ্রিত) এবং (২)

কোমল ও কঠিন জল

সময়ে পরিপাক হইয়া যায়। কাঁচা জন্ত পরিপাক হইতে স্থায়ীভাবের হইয়া থাকে। উষ্ণ করিলে প্রথম প্রকারের দূষিত ভাব নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু উহাতে দ্বিতীয় প্রকার দোষ বিদূরিত হয় না। সল্‌ফেট অফ লাইম অথবা ম্যাগ্নেশিয়া শেষোক্ত প্রকারের জলে মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। স্থায়ীভাবের কঠিন জল, নানাপ্রকারে ব্যবহার নিষিদ্ধ; ইহার দ্বারা দ্রব্যাদি ভালরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করা যায় না, সাবানে ফেনা হয় না (will not lather) এবং চর্ম্ম খস্‌খসে, এমন কি সময়ে সময়ে (বিশেষ শীতকালে) ফাটিয়াও যায়। লাইম ও ম্যাগ্নেশিয়া সণ্ট অধিক পরিমাণে জলে থাকিলে, উহা নানাপ্রকার পীড়ার স্বষ্টি করিতে পারে। কঠিন জল চা প্রস্তুত অথবা রন্ধন জন্ত আদবেই ভাল নহে, সবুজ বর্ণের শাকসব্জীর বর্ণও ইহা দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা বিশেষ কঠিন হইলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া উদ্ভব করাইতে পারে। স্থায়ী কঠিনতা বিদূরণ জন্ত "ক্লার্কের মতে" (Clarke's process) চুণ (quick lime) প্রয়োগই উত্তম ব্যবস্থা। ১ গ্যালন কঠিন জলে ২ ড্রাম পরিমাণ চুণ প্রয়োগই যথেষ্ট। চুণ প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা জল রাখিয়া দিবে, পরে ২।৩ ইঞ্চি তলানি জল রাখিয়া সমুদয়ই ধীরে ধীরে ঢালিয়া লইবে। জল হইতে কতক পরিমাণে জীবাণুও (microbes) এই উপায়ে বিদূরিত হইয়া যায়।

জলের সহিত নানা রোগও আমাদের শরীরে আনীত হইতে পারে; দূষিত জল ব্যবহারেই যে লোকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় তাহা সকলেই জানেন। এই কারণেই প্লীহারোগও উৎ-

পন্ন হইতে পারে। জলে জান্তব, উদ্ভিজ্জ, অথবা খনিজ দূষিত পদার্থ থাকিলে রক্তমাশয় এবং উদরাময় দুষ্ট হয়; এই কারণে ডিস্পেপ্সিয়াও দেখা দেয় জানিবে। দূষিত জল পানীয়রূপে অনবরত ব্যবহারে মূত্রস্থলীতে পাথ্রী (Stone), গলগণ্ড, ইত্যাদি হইতে দেখা গিয়াছে। কলেরা এবং টাইফায়েড জ্বরের বিষও ইহার দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে আনীত হয়। দুগ্ধে দূষিত জল মিশ্রিত থাকিয়া, অনেক সময় উপরি উক্ত পীড়াদির প্রাদুর্ভাব আনাইয়া দিয়াছে। অন্ত্রের মধ্যে কৃমি ইত্যাদিও জল দ্বারাই সরবরাহিত হইয়া পড়ে; দূষিত জলে উদ্ভূত জীবাণুসকলও মশক দ্বারা আমাদের শরীরে একেবারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সুতরাং পানীয় অথবা যে জন্যই হউক, এই জলের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

জল দ্বারা আনীত পীড়াদি

পানীয় মধ্যে জলের অব্যবহিত পরেই, দুগ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার অন্য একটি নাম বালজীবন, কারণ বাল্যবয়সে, বিশেষতঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯ মাস পর্য্যন্ত (আমাদের দেশে স্থল বিশেষে ১॥ কি ২ বৎসর পর্য্যন্ত) একমাত্র ইহাই শিশুগণের জীবনধারণের অবলম্বন হইয়া থাকে। মৎস্য মাংসাদিকে আমরা সম্পূর্ণ খাদ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না, কিন্তু দুগ্ধকে প্রকৃত পক্ষে পানীয় না বলিয়া সম্পূর্ণ খাদ্যরূপে গণ্য করিতেও পারা যায়।

দুগ্ধের গুণ

এখানে আমার একথা বলার উদ্দেশ্য

এই যে সুস্থদেহ বজায় রাখিবার জন্ত, যে সমুদয় পদার্থ নিত্য আমাদের অবশ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার সমুদয় পদার্থ মাংসাদির মধ্যে নিহিত নাই, কিন্তু দুগ্ধে তাহা বর্ত্তমান আছে। ইহা জীবন ধারণের পক্ষে, অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং অতি সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ইহা বায়ুপিত্ত নাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, জীবনীশক্তিপ্রদ, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক ইত্যাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা, সবল, দুর্ব্বল, রোগী, নিরোগী সকলের পক্ষেই, ইহা সমান ভাবে ফলপ্রদ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা কোন প্রকার প্রধান খাদ্যের সহ খাওয়া উচিৎ নহে, কারণ দুগ্ধ যখন নিজেই একটি প্রধান খাদ্য (অর্থাৎ প্রধান খাদ্যের সকল জিনিষই ইহাতে বর্ত্তমান আছে) তখন অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের সহ ইহা সেবন করিলে, পাকস্থলীর উপর অতিরিক্ত কার্য্য সম্পাদনের ভার দেওয়া হয় মাত্র; সুতরাং সময়ে উহা বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের ভাত প্রধান খাদ্য, তবে কি আমরা ভাতের সহ দুগ্ধ খাইব না? দুধ ভাত আহার না করিলে আহার সম্পূর্ণ বলিয়াই অনেকের বোধ হয় না! যদিও ভাতের সহিত দুগ্ধ খাওয়ায় একটু গুরুপাক হইয়া থাকে, তথাপি উহা আমাদের প্রচলিত নিত্য খাদ্যের সহিত যোগে বিশেষ কোনই গোল করে না। পাশ্চাত্য জাতীয় আহার প্রায় সমুদয়ই মাংসাদি সমন্বিত, সুতরাং উহার সহিত দুগ্ধ

অন্য খাদ্যের সহ দুগ্ধ সেবন

মোটেই সহ্য হয় না। মাংসের সহিত দুগ্ধসেবন অন্যায় বলিয়া আমাদের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। যাঁহারা নিত্য মাংসভোজন করিয়া থাকেন, আহারের অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে দুগ্ধ সেবন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য; নতুবা অজীর্ণ হেতু উদরাময়াদি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থেও দুগ্ধ এই প্রকারেই সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। কাফি অথবা চা এর পরিবর্ত্তে সম পরিমাণ দুগ্ধ এবং গরম জল মিশাইয়া, অথবা অন্য কোন প্রকার খনিজ জল

কাফি অথবা চা এর পরিবর্ত্তে দুগ্ধ সেবন

(যেমন ভিচি, আপেণ্টা,সীতাকুণ্ড, ঘাটশিলা ইত্যাদি) বা সোডা ওয়াটার মাত্র মিশাইয়া, প্রাতঃকালে কিংবা অপরাহ্লে সেবন করিলে, চা বা কাফি সেবন অপেক্ষা অধিক ফললাভ হইতে পারে বলিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণও বলিয়াছেন।

দুগ্ধ রোগীর পথ্য

তরুণ জ্বর বা অন্য কোন প্রকার রোগে, দুগ্ধই একমাত্র সুপথ্য (অবশ্য পাকাশয়িক গোলযোগ অবর্ত্তমানে) বলিয়া সকলেরই জানা আছে, কিন্তু এবিষয়ে একটি সাবধনতার কথা বলা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। পাকস্থলীতে পতিত হইয়া দুগ্ধ ছানাযুক্ত হইয়া একটি অতরল (solid) পিণ্ডে পরিণত হয়। বেশী না খাইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এই ভয় অযথা অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিক পরিমাণে আহারে শরীরের উপকার না হইয়া, অপকারই হইয়া থাকে জানিবে। ২৪ ঘণ্টার

মধ্যে অন্য কোন খাদ্যাদি না খাইলেও, ৩।৪ পাইণ্টের (১ পাঁইট ২।॰ পোয়া) অধিক দুগ্ধ সেবন করা বা করান কর্ত্তব্য নহে। তোমার পারিবারিক চিকিৎসক অবশ্য রোগবিশেষে যতটা দুগ্ধ দরকার এবং তাহার প্রকার অর্থাৎ খাঁটি দুগ্ধ, কি জল মিশ্রিত (কি পরিমাণে) তাহা জানাইয়া দিবেন। কতকগুলি লোকের এমনই বিশ্বাস আছে যে, যেন তাঁহারা চিকিৎসক অপেক্ষা বেশী বুঝিয়া থাকেন, তাই রোগীর প্রতি ভালবাসা দেখাইতে গিয়া সহ্যাতিরিক্ত দুগ্ধ সেবন করাইয়া থাকেন! ফলে তাহাতে বমন হইতে দেখা যায় ও উপকারের পরিবর্ত্তে সমূহ অপকার হইয়া পড়ে, কারণ জ্বর বা রোগাবস্থায় পরিপাক শক্তি সুস্থাবস্থাপেক্ষা স্বল্প কার্য্যকরী থাকে।

দুগ্ধ প্রায় সকলেরই সহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু এমনও লোক দেখা যায় যে, তাহার শরীরে দুগ্ধ সহ্য হয় না। তাহারা বলে যে, পাকস্থলীতে উহা পতিত হইয়া ছানাযুক্ত হয় এবং অল্প পরেই বমন হইয়া যায়। এখন কথা হইতেছে যে, দুগ্ধ ত সকলেরই পাকস্থলীতে যাইয়া ছানাযুক্ত হয় কিন্তু তাহা পাকস্থলীতে রাখিবার উপায় কি! দুধের ন্যায় বল-

দুগ্ধ সহ্য না হইলে ব্যবস্থা

কারক, সহজেই পরিপোষক পদার্থও যদি শরীরে সহ্য না হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া শরীর পরিপোষণ হইবে? দুধের সহ, সম পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া, অথবা ভিচি (Vichi) বা নীতাযুক্ত জল, সোডা ওয়াটার

মিশাইয়া খাইলেই, উহা আর বমন হইয়া যাইবার ভয় থাকে না জানিবে। অথবা দুগ্ধকে ঘোল করিয়াও খাওয়া যাইতে পারে। এক পাইণ্ট দুগ্ধ গরম করিয়া, তাহার মধ্যে ছোট চামচের দুই চামচ লেবুর রস মিশ্রিত করিলেই, উহাতে ছানা কাটিয়া যাইবে; পরে ঐ ছানাগুলি পরিষ্কার একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই বেশ ঘোল বা ছানার জল প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত উপায়ে প্রস্তুত ছানার জল প্রায় সকল প্রকার গোলমালযুক্ত পাকস্থলীতেই সহ্য পাইতে পারে। ইহা অতিশয় বলকারক পানীয় পদার্থ (যদিও ছাঁকিয়া লইবার সময়, পাকস্থলীতে সহ্য করাইবার জন্য, দুগ্ধের কতক বলকারক অংশ পরিত্যক্ত ছানার সহিত বিদূরিত হইয়া থাকে)। ২৪ ঘণ্টায় অবশ্য সেবনোপযোগী দুগ্ধ অপেক্ষা ইহা পরিমাণে অধিক সেবন করা উচিত নতুবা সম পরিমাণে ফল লাভ হইবে না।

ছানার জল বা ঘোল

দুগ্ধের মধ্যে গো দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা সমস্ত রোগ শান্তিকারক, বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, শীতল, সুমধুর ও গুরু। কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ, বায়ুনাশক ও বিশেষ গুণকারক; পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ, গুরু, কফজনক এবং রক্তপিত্ত ও বাতরোগে উপকারক। বালবৎসা ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক; যে গাভীর বাছুরের বয়ঃক্রম এক মাস হইয়াছে, সেই গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিজনক ও বলকারক। খল্লাহারজাত গাভীর

গো দুগ্ধের প্রকার

দুগ্ধ, গুরু ও কফজনক; এই দুগ্ধ সুস্থব্যক্তির পক্ষে উপকারক, কিন্তু রোগীর পক্ষে নহে। খড়, তৃণ ও কার্পাস বীজ প্রভৃতি ভোজনজাত গাভীর দুগ্ধ অতি সুপথ্য। দোহনান্তর উষ্ণাবস্থাতেই ফেণযুক্ত গোদুগ্ধ, বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য ও ত্রিদোষনাশক জানিবে; দোহনের পর শীতল হইয়া যাইলে, তখন আর উহা কাঁচা সেবন করা উচিত নহে। দুগ্ধ সহিত অর্দ্ধেক জল মিশাইয়া, অগ্নিতে জ্বাল দিবার সময়, জলভাগ মারিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট রাখিলে, উহা কাঁচা দুগ্ধাপেক্ষা লঘুতর হয় জানিবে। নির্জ্জলা দুগ্ধ জ্বাল দিয়া, যত ঘন করিবে, ততই উহা গুরুতর, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া শরীরে পুষ্টিবৃদ্ধি করিবার জন্য ইহা সকলের খাওয়া উচিৎ নহে।

গো দুগ্ধের পরই মাহিষ দুগ্ধ প্রচলিত দেখা যায়। বঙ্গদেশ অপেক্ষা বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলেই ইহার সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা, গুরু, নিদ্রাকারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক এবং শীতল। যাহাদের মাহিষদুগ্ধ খাওয়া অভ্যাস নহে, ইহা সেবনে তাহাদের প্রায়ই উদরের গোলযোগ ও শরীর ভার ভার বোধ হয় এবং এই জন্যই বোধ হয়, তাহারা অধিক সময় নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। ছাগদুগ্ধ লঘু, শীতল, কষায় এবং মলের তরলতানাশক; ইহা অতিসার, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়কাশ রোগীর পথ্য এবং সর্ব্বরোগনাশক; বিশেষতঃ রক্তামাশয়ে ইহা বড়ই উপকারক জানিবে। ভেড়ার দুগ্ধ সেবনে অশ্মরী রোগ অর্থাৎ কীড়্‌

অন্য জাতীয় দুগ্ধ

প্রদেশে "পাথুরী" (gravel) হইলে তাহা বিনষ্ট ও মুত্রকৃচ্ছে বাহ্য প্রয়োগে বিশেষে উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা গুরু, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মোৎপাদক কিন্তু বায়ুশান্তিকর। গর্দ্দভী দুগ্ধ ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক, লঘু, বলকারক এবং শিশুগণের পক্ষে একান্ত হিতকর; অনেক বলিয়া, থাকেন যে, ইহা বসন্ত রোগের কতক প্রতিষেধক। চারিদিকে বসন্ত হইতে থাকিলে, প্রত্যহ সামান্য পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। এই কথার মূলে অবশ্য কোন সত্য নিহিত আছে, নতুবা এত জন্তু থাকিতে এই গর্দ্দভই বা "মা শীতলাদেবীর" অর্থাৎ বসন্তরোগাধিষ্ঠাত্রীর বাহন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইবে কেন?

নারীদুগ্ধ লঘু, শীতল ও বায়ুপিত্তনাশক। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, নারীদুগ্ধ ও গর্দ্দভীদুগ্ধ প্রায় একজাতীয়; সুতরাং

নারী ও গর্দ্দভী দুগ্ধ

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, যদি কোন কারণ বশতঃ মাতৃস্তন্য পান করিতে না পায়, অর্থাৎ যদি মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকে বা উহা দোষজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, অন্য কোন প্রকার দুগ্ধের বদলে গর্দ্দভী দুগ্ধই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। মাতৃস্তন্য না পাইলে, শিশু ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে এবং বাড়িতে পায় না; কিন্তু গর্দ্দভীদুগ্ধ নারীদুগ্ধের সহিত সমজাতীয় হওয়ায়, উহা সেবনে শিশুর বর্দ্ধনের কোনই বাধা জন্মাইতে পায় না। নারীদুগ্ধ কাঁচা খাওয়াই হিতকর, ইহা উত্তপ্ত করিয়া সেবন করিলে অপকার করিয়া থাকে। গো ও মাহিষ

দুগ্ধ ভিন্ন, অন্য সকল দুগ্ধই অসিদ্ধাবস্থায় গুরু, শ্লেষ্মজনক, আমবর্দ্ধক ও অপথ্য। ছাগীদুগ্ধ সিদ্ধ করণান্তে শীতল করিয়া সেবনই প্রশস্ত। সিদ্ধাবস্থায় উষ্ণ দুগ্ধ বাতশ্লেষ্মনাশক এবং সিদ্ধ করা শীতল দুগ্ধ পিত্তনাশক। আমাদের মতে, নারীদুগ্ধ ব্যতীত সকল দুগ্ধই, এক বলকা জ্বাল দিয়া গরমাবস্থাতেই পান করা কর্ত্তব্য।

সিদ্ধ ও অসিদ্ধ দুগ্ধের গুণ

রাত্রিকালে স্নিগ্ধতা ও শারীরিক পরিশ্রমের বিরাম হেতু, সন্ধ্যাকালাপেক্ষা প্রাতঃকালীন দুগ্ধ, গুরু ও শীতল হইয়া থাকে এবং সূর্য্যকিরণ সেবন ও ব্যায়ামাদি জন্য সায়ংকালের দুগ্ধ, অপেক্ষাকৃত লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক হয়। উপরন্তু প্রাতঃকালীন দুগ্ধ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক এবং পুষ্টিজনক; মধ্যাহ্নে উহা বলকারক ও কফপিত্তনাশক এবং রাত্রিতে উহা পথ্য ও বহুদোষনাশক জানিবে। দুগ্ধ এতই হিতকর পথ্য যে, উহার সেবনে বালকের দেহবৃদ্ধি, বৃদ্ধের ক্ষয়রোগ শান্তি ও তেজবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সময় ভেদে দুগ্ধের গুণ

গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধের ফেণও ত্রিদোষঘ্ন, রুচিকারক, লঘু, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক এবং সদ্য তৃপ্তিকর। ইহা অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকারক। যদি দুগ্ধে কোন প্রকার বিবর্ণতা, অম্ল, দুর্গন্ধ, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাব, বা অম্ললবণযুক্ত পদার্থাদি মিশ্রিত থাকে, তবে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; কারণ উহা পরিপাকের হানি ত করিবেই, উপরন্তু বুদ্ধি প্রভৃতিও বিনাশ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ জলের পরিবর্ত্তে পানীয়রূপে দুগ্ধের ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হয় না; কিন্তু রোগবিশেষে বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে জলের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ ইহাই ব্যবহার জন্য আমরা উপদেশ দিয়া থাকি। যে সমুদয় পীড়ায় শরীরে জল বা রসসঞ্চয় অত্যধিক হইতে থাকে, তাহাতে জলের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে দুগ্ধও যাহাতে নির্জ্জলা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শোথ, উদরী, বেরি বেরি, স্কর্ভি অথবা উহা জনিত উদ্ভূতাদি রোগে, জলের ব্যবহার নিষেধ করিয়া আমরা অনেক স্থলে প্রভূত উপকার সাধিত হইতে দেখিয়াছি। সুস্থাবস্থায় অবশ্য জলের পিপাসা দুগ্ধে সফলরূপে নিবারিত হইতে পারে না, কিন্তু উপরি লিখিত পীড়াদিতে পিপাসা প্রায় থাকিতে দেখা যায় না। কাজেই সামান্য আয়াসে ঐ সময় জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ব্যবহারের অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে।

জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ

শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিতই হউক, মনুষ্যমাত্রেই দুগ্ধের উপকারিতার বিষয় সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছেন এবং আমরাও উপরে যথাসাধ্য তাহা পরিপাদন করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা কোন প্রকারেই অস্বীকার করিতে পারিব না যে, এই দুগ্ধই অধুনাতন যাবতীয় শিশুরোগের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সভ্যজগতের সমুদয় স্থানেরই—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণি, রুষিয়া,

অধুনাতন দুগ্ধই যাবতীয় শিশুরোগের আকর।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি সকল স্থানেরই—মৃত্যুসংখ্যার গড় হিসাব পরীক্ষায়, আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাইতেছি যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুগণের মধ্যেই, কালের করালকৃপাণ অপ্রতিহতগতিতে অত্যধিক কার্য্যতৎপরতার সহিত ধ্বংশকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছে। আধুনিক সভ্যতা সৃজিত পথানুচারিণী, বিগতযশঃশা, হতশোভনা, পূর্ব্বগৌরবাখ্যায়াম্বিতা "সোণার-ভারত" কি এ বিষয়ে কোনও সভ্যজগতের পশ্চাতে পড়িয়া আছে? না কখনই নহে! পাশ্চাত্য জগতের আহার বিহার, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ছল চাতুরী প্রভৃতির সঠিক অনুকরণকারী শিক্ষিত লোকের বাসস্থান হইয়া ভারত কি এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারে? কিন্তু ভারত যখন ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, সর্ব্বসভ্যতার আদি জননী, পুণ্যপূত পবিত্রতার আদর্শরূপে পরিগণিতা ছিল, যখন ভারতই জ্ঞান,

ভারতের পূর্ব্ব গৌরব।

ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের একমাত্র আকর ছিল,—যাহার রশ্মিকণা লইয়াই পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞান আজ পুরুষকার সাধনার চরম উৎকর্ষ ঘোষিত করিতেছে—যখন ভারতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ব্যবসায়ীগণ, স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিরত থাকিয়া, অধর্ম্ম হইবার ভয়ে সদাই শঙ্কিত থাকিত, তখন ভারতে এ দুর্দ্দিন আসিতে পারে নাই!!! বিষয় পরম্পরায় যাইবার দরকার নাই, এই দুগ্ধই যদি আজকালকার ন্যায় দুষ্প্রাপ্য, অথবা পাওয়া যাইলেও খাঁটি না মিলিত, তাহা হইলে ঘরে ঘরে যাগযজ্ঞ হোমাদি কখনই হইতে পারিত না! কেবলমাত্র খাঁটি

দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি হইতেই যে নিত্য দেবকার্য্য ও পিতৃ-কার্য্য সংসাধিত হইত এ কথা বলা বাহুল্য! কিন্তু পূর্ব্বকথা আলোচনায় আর ফল কি?

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতিঃ ক গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত মনঃ কুরু সুস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়" ॥

দুগ্ধপোষ্য শিশুগণের মধ্যে আমাদের দেশে—বঙ্গদেশে প্রধানতঃ—একটি বিশেষ পীড়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা আর কিছুই নহে—সেই সংঘাতিক "শিশু-যকৃৎ"।

শিশু যকৃৎ ও টুবারকুলোসিস্

আমরা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রীয় কোন গ্রন্থে, এই রোগের বিষয় উল্লিখিত দেখিতে পাই না। এই শিশু যকৃতের মূল কারণ হইতেছে—দূষিত দুগ্ধ। সহরের প্রায় ১৫ আনা শিশুরই শরীরে, অল্লাধিক পরিমাণে এই রোগের বর্ত্তমানতা দেখা যায় এবং ইহা হইতে মৃত্যুসংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহা ব্যতীত আর একটি বিষম ব্যাধিও জগতে শনৈঃ শনৈঃ প্রসারণ লাভ করিয়া বালক, যুবা ও বৃদ্ধের ধ্বংশকার্য্য সাধন করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম টিউবারকুলোসিস্ অর্থাৎ ক্ষয়-রোগ। শেষোক্ত এই রোগের উদ্ভূতির অন্যান্য কারণ মধ্যে, টুবারকুলোসিস্ আক্রান্ত গরুর দুগ্ধ পান করা, একটি প্রধানতম কারণ বলিয়া চিকিৎসা জগতে প্রমাণিত হইয়াছে। ভাল দুগ্ধ

না পাওয়াতেই যখন, উপরিউক্ত দুইটি বিষম ব্যাধির উদ্ভব সম্ভাবনা প্রমাণিত হইল, তখন সাধারণ লোকে যে, উহাদের হাত হইতে নিজ নিজ শিশুসন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্য, বিজ্ঞাপনের "ঢাক-ঢোলে" উদ্ঘোষিত, সুদূর সাগর পার হইতে আনীত, টিনের কৌটাবদ্ধ জমাইত অর্থাৎ কন্‌ডেন্‌সড দুগ্ধ. অবাধে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুদ্ধমাত্র শিশুগণের জন্যই যে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নহে, আজকাল চা খাইবার জন্য, বহুলোকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত ব্যক্তিরাও যে দুগ্ধের ভালমন্দ গুণ বিচারের জন্য বিলাতী দুগ্ধ ব্যবহার করেন, তাহা আমরা মনে করি না; বরং সময় অসময়ে কোথায় দুগ্ধ মিলিবে বা না মিলিবে, সেই জন্যই বিশেষতঃ ঝঞ্ঝা মিটাইবার ইচ্ছায়, অশেষ দোষের আকর এই বিলাতী টিনের আবদ্ধ দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিক দিবস আবদ্ধ থাকায়, উহা যে বিষময় হইয়া উঠে, তাহা জানিয়াও কেহ কেহ ভাল দুগ্ধ জোগাড় করার অসুবিধা এড়াইবার জন্য, ইহা ব্যবহার করা বন্ধ করেন না। কণ্ডেন্সড দুগ্ধের পরিবর্ত্তে, কোন কোন বিলাতী কোম্পানীর কলে প্রস্তুতীকৃত, শিশুর খাদ্য ব্যবহার করা আমরা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বলিয়া মনে করি—যেমন মেলিন্স, আলেনবরি, হর্‌লিক্‌স, গ্লাক্সো, স্যানাটোজেন, প্রভৃতি।

জমাট বাঁধান দুগ্ধ

কৃত্রিম বিলাতী দুগ্ধ

ইহাদের সকল গুলিই বিশেষ পরীক্ষিত এবং শুদ্ধমাত্র গরম জল অথবা তৎ সহ সামান্য দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, সেবন করাইলেই চলিতে পারে। চিকিৎসকের উপদেশ মত, শিশুর শরীরোপযোগী যাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, তাহাই ব্যবহার করান কর্ত্তব্য। শিশুর খাদ্য বলিয়া আজকাল আমাদের দেশেও, কতকগুলি কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুতীত হইয়া বাজারে প্রচলিত হইতেছে দেখিতে পাই, কিন্তু উহা সম্যক পরীক্ষিত নহে বলিয়া সহসা কাহাকেও অনুমোদন করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্য চিকিৎসকমণ্ডলীকে এখানে অনুযোগ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না! দেশীয় উপাদানে প্রস্তুতীত, শিশু ও রোগীর খাদ্যগুলির রীতিমত পরীক্ষা হইয়া, উহার দোষগুণ প্রস্তুতকারকগণকে জ্ঞাত করাইলে, আমাদিগের বিশ্বাস ঐ গুলিও বিলাতী

দেশীয় কৃত্রিম ফুড্.

খাদ্যাদি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট থাকিতে পারে না! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ দেশীয় চিকিৎসকগণ ও বিষয়ে সামান্য পরিমাণও চেষ্টা করেন না এবং প্রস্তুতকারকগণও চিকিৎসক ও রাসায়নিক বিদ্যায় পারদর্শীগণের সাহায্য লওয়া উচিত মনে করেন না। ইহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে!! যে সে একজন কোন কৃত্রিম খাদ্য বাহির করিলেই, সাধারণ লোকে কোন্ সাহসে তাহা রোগী বা শিশুকে অবাধে খাওয়াইতে পারে?

ভাল দুগ্ধ না পাওয়া যাইলে, যে ব্যবস্থা করা দরকার তাহা ত বলা হইল, কিন্তু যাহাতে ভাল দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে

তাহার বিষয়ও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ইহার প্রতিকার করে গো জাতীর উন্নতি সাধণ করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে এ দেশে গো-সেবা গৃহস্থের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল, অর্থাৎ ধর্ম্মোদ্দেশে গো-জাতীর প্রতিপালন এবং সংবৃদ্ধিসাধন সকল লোকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত ছিল। গো-জাতির দুগ্ধসেবনে, যখন আবালবৃদ্ধ আমরা সকলেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকি,তখন তাহাদিগকে মাতৃস্থানীয়া মনে ধারণকরতঃ সেবা করায়, ন্যায়তঃ যে ধর্ম্ম আচরিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যদি উহা

গো-জাতির সেবা গৃহস্থ ধর্ম্ম

ধর্ম্মের ভাবে দেখিতে আমরা অনিচ্ছুক হই, তথাপি কি অন্য ভাবেও ইহাদের সেবা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? উহাদের উন্নতিসাধন অর্থে আমরা এই বুঝি যে, যাহাতে উহারা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার সম্পন্ন করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা মাত্র। এই প্রকারে পরিপুষ্ট হইলেই, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উহারা আমাদিগকে দুগ্ধ দিতে পারিবে এবং তাহা সেবন করিয়া আমরা, আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল,—শিশু সন্তানগণ,—এবং রোগী প্রভৃতি সকলেই সুস্থদেহ লাভ করিতে পারিব। তবেই দেখুন, গো-জাতির সেবায় কাহাদের লাভ হইয়া থাকে।

আজকাল গো-সেবা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, যদিও এখন আর গৃহস্থের নিত্য হোম-যাগ-যজ্ঞের

জন্য দুগ্ধ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু শিশুসন্তান ও নিজে-দের শরীরপোষণের জন্য ত উহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য রহিয়াছে ; সুতরাং গৃহস্থ দুগ্ধের জন্য গোয়ালাগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন। এই গোয়ালাগণ ব্যবসায়ে লাভ-বান হইবার জন্য, গো-জাতির সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কি করিয়া কেবল দুগ্ধ অধিক পরিমাণে সংগ্রহ হইতে পারে, তাহারই কৌশল উদ্ভাবনায় প্রকৃতই "গোয়ালা বুদ্ধির" পরিচয় দিয়া থাকে। তাহারা "ফুকা দিয়া" বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে ; এই "ফুকা দেওয়া" দুগ্ধ সম্পূর্ণ অপকারী, উপরন্তু গো-জাতি ইহাতে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যে গরুর প্রতি এই প্রকার "ফুকা দিয়া" দোহণ ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা কোন প্রকারেই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না এবং স্বল্পদিনেই মারা যায়। বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ অথবা যে গাভীর বৎসের বয়স এক মাসের অনধিক, তাহার দুগ্ধ নিতান্ত অপকারী। বাড়ীতে যদি গরু না থাকে, তবে গোয়ালার নিকট হইতে দুগ্ধ লইবার সময় এ বিষয়ে সন্ধান লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ফুকা দেওয়া দুগ্ধ

শিশুকে গোদুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া রাখিতে হইলে, আরও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, নিয়মিত একই গাভীর দুগ্ধ, উহাকে প্রত্যহ সেবন জন্য দেওয়া হইতেছে এবং ঐ গাভী বৎসবতী ; গাভীর আহার জন্য কি কি দেওয়া হয় এবং তাহাও পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিতে পায় কিনা,

পথের দুগ্ধ সংগ্রহের উপায়

তাহারও সংবাদ রাখা প্রয়োজন। ঐ গাভীর শরীরে কোন পীড়াদি আছে কিনা, অথবা যে গোশালায় ঐ গাভী থাকে, তথায় কোন অন্য গাভীর সংস্পর্শদোষ যুক্ত রোগ, যেমন টাইফয়েড, টুবারকুলোসিস্ প্রভৃতি আছে কিনা, সে সম্বন্ধেও বিশেষ পরীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য।

পল্লীগ্রামে গো-জাতি কতকটা স্বচ্ছন্দতার সহিত বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু সহরে উহার সম্পূর্ণ অভাব; গাভীকুল সহরে দিবারাত্র একই স্থানে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া যায়, কাজেই উহাদের দুগ্ধে তদাহারীদেরও বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইতে দেখা যায় না। আজকাল পল্লীগ্রামেও, বিশেষতঃ যেখানে মিউনিসিপালিটি আছে তথায়, "পাউণ্ডে" যাইবার ভয়ে গৃহস্থ বা গোয়ালাগণ গাভীদিগকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দিতে পারে না। যদিও বা নির্দ্দিষ্ট কোন মাঠে গোচারণের ব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বড়ই দুঃখের

গোচারণ স্থানের আবশ্যকতা।

বিষয় যে, উহা হয় একেবারে তৃণ-লতাদিবিহীন অথবা কেবলমাত্র শুষ্ক ঘাসে পরিণত!! কচি তৃণ এবং লতাদিভোজন করিতে পাইলে, উহারা যেমন পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে, তেমন অন্য কোন খাদ্যেই নহে! কিন্তু অগণিত মাটঘাটে পরিপূর্ণ এদেশেও, গো-জাতির বিচারণ জন্য কোন প্রকার বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশিত দেখা যায় না!

গো-জাতির উন্নতি কল্পে ইহা কম প্রতিবন্ধক নহে; যদি প্রত্যেক জমীদার স্ব স্ব জমীদারী মধ্যে, প্রতি পরগণা বা মৌজায় কয়েক শত বিঘা করিয়া জমী গোচারণের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, তাহা হইলে অবলা গো-জাতির অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে এবং তাহার পরিণাম ফলে, তাঁহাদেরই সকলের শিশুসন্তানগণ, সুদুগ্ধ সেবনে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে!!

আজকাল চা, কাফি, অথবা কোকা বা চোকোলেটও আরামপ্রদ পানীয়ের অন্তর্গত হইয়া, সভ্যজগতে সর্ব্বস্থানে আদৃত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা সেবন আমাদের মতবিরুদ্ধ হইলেও পানীয় প্রস্তাব হইতে, উহা বাদ দিয়া ফেলিতে পারিব না। চা শ্রমহর,

চা'র, সাধারণ গুণ

আরামপ্রদ, ঘর্ম্মোৎপাদক এবং উষ্ণ; ইহা অবসাদ পরিমিতহারী অথচ নিত্য যাহারা অভ্যস্ত নহে, তাহাদিগের জন্যই জানিবে। অতিমাত্রায় অথবা অধিক দিবস ব্যবহারে, ইহাতে হৃদয়, মস্তিষ্ক, চালক-স্নায়ু এবং পাকস্থলীর বিকৃতি জন্মাইয়া থাকে। এই যান্ত্রিক বিকৃতির ফলে বিবমিষা, বমন, বায়ুপূর্ণ অজীর্ণতা, হস্তপদের কম্পন, মুখমণ্ডলের মলিনতা, ক্ষীণ নাড়ী, ভ্রূর উপরিভাগে কপালপীড়া, স্ফূর্ত্তীর উন্মত্ততা এবং বুকচাপাবোধক দুঃস্বপ্নদর্শন প্রভৃতি অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের ক্ষয় নাশ করে বলিয়া, ইহা পরোক্ষভাবে কাহার কাহারও মতে পোষক বলিয়া পরিগণিত হয়। মাংস ও উত্তাপোৎপাদক

খাদ্য পরিপাক করিবার পক্ষে, চা পান প্রশস্ত ; সর্দি, জ্বর বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর অসুস্থ বোধ করিলে, এক পেয়ালা চা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই উপকার নিত্য চা সেবীগণের উপভোগ্য নহে ! চা সেবনে উপকার পাইতে হইলে, উহার প্রস্তুতীকরণ (৩৭ পাতা দেখ) সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা। যদি চা সেবন করিতেই হয়, তাহা হইলে উহা যাহাতে ভাল জিনিষ হয়, সে পক্ষেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ সস্তাদরের চা নানাপ্রকার মিশ্রণ জন্ত অপকারী হইয়া থাকে। চা সহ দুগ্ধ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সামান্ত চিনি (যদি উহা আস্বাদের বিরক্তিকর না হয়) মিশ্রিত করিবে। সকল সময়েই চা গাঢ় অর্থাৎ কড়া না করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য, নতুবা পাকস্থলীর গোলযোগ, নিদ্রাশূন্যতা এবং সাধারণ স্নায়বিক গোলযোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই কারণবশতঃই শীতল চা অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার গরম করিয়া বা যেমন পথে পথে অগ্নির আলের উপর রাখিয়াই, বিক্রীত হইতে দেখা যায়, সেই প্রকারের চা খাওয়া উচিৎ নহে।

চা প্রস্তুতকরণ

চা অপকারী কেন ?

পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে "থিনি" thiene নামক চা'র উপাদান শরীরের ক্ষয় হ্রাসকারক, সুতরাং ক্ষয় হ্রাস করিবার শক্তি যাহার বর্ত্তমান থাকে, তাহা যে আহারের আবশ্যকতাও

কিয়ৎ পরিমাণে নাশ করিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই শক্তি চা'য়ে নিহিত থাকার জন্যই, প্রকারান্তরে ইহাকে পোষক বস্তুর সামিল করিয়া ধরা হয়। কিন্তু এডওয়ার্ড স্মিথ্ (Edward Smith) নামক একজন ডাক্তার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চা ক্ষয় হ্রাস করার পরিবর্ত্তে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির উত্তেজন এবং অন্যান্য প্রকারে শরীরের ক্ষয় বর্দ্ধিত করিয়াই থাকে। চা ব্যবহারের পোষকতায় দ্বিতীয় দফায় বলা হইয়া থাকে যে, উহাতে গ্লুটেন্ Gluten নামক পদার্থ বিদ্যমান থাকায়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহা পোষক (nutrient) বস্তুর অন্তর্গত, কিন্তু সচরাচর যে ভাবে চা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ গ্লুটেন সামান্য পরিমাণেও নিষ্কাশিত হয় না দেখা গিয়াছে। ডাঃ স্মিথ্ আরও বলেন যে, চা সেবনের ফলে, মাংস এবং উত্তাপোৎপাদক খাদ্য বিশেষরূপে পরিপাক হইয়া যায়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারের সংস্থানোপায় থাকিলে ইহা পোষনক্রিয়া বর্দ্ধনও করিতে সমর্থ; কিন্তু পক্ষান্তরে প্রচুর অথবা সম্যক দেহধারণোপযুক্ত আহারের অভাব হইলে, উহাই শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে।

আহারের অব্যবহিত পরেই চা খাওয়া উচিৎ নহে, কারণ উহা স্বয়ং বলশালী সঙ্কোচক পদার্থ; খাদ্যবস্তুর "জিলাটিনের" সহ, উহার ট্যানিক্ আসিড্ মিশ্রিত হইয়া অজীর্ণতা উৎপাদন করিতে পারে; এই জন্যই অধিক দিবস চা পানে, কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মাইতে পারে। অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, মৃগীরোগ বা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অথবা অন্য কোন প্রকার স্নায়ুবিধানের উত্তেজনা প্রকাশক রোগে পীড়িত

ব্যক্তিগণের পক্ষে, ইহা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাথাধরা, স্নায়বিক বেদনা অথবা স্নায়ু-বিধানের বলক্ষয়জাত অন্যান্য পীড়ায়, ইহা স্নায়ুবিধানের উত্তেজক পানীয়রূপে সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইলে ফললাভ হইতে দেখা যায়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, অভ্যস্ত চা সেবীগণের এ ফললাভ করিতে দাবী করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

চা সেবনে সাবধানতা

সভ্যজগতে বিদিত হইবার জন্য, আমরা অধুনা বিলক্ষণ চা পায়ী হইয়াছি! ডাঃ স্মিথ্ সাহেব বলিয়াছেন, "উহা পর্য্যাপ্ত ভোজনাভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শরীরক্ষয় বৃদ্ধিই করিয়া থাকে" কিন্তু এ বিষয় কি আমরা কখন উপযুক্তভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছি? অনেক ব্যক্তিকে চা খাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায়, আমরা সবিস্ময়ে অবগত হইয়াছি যে, সামান্য জলখাবারে ক্ষুধা নিবৃত্তি না হওয়ায়, এক গ্লাস বা পেয়ালা চা অর্থাৎ গরম জলে যেমন তেমন করিয়া চা সিদ্ধ করতঃ, দুগ্ধ বা তদভাবেই, চিনি সংযোগে খাইয়া, ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া থাকি"!!! চা যে ক্ষুধা-নাশে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ইহা আমরা দেখাইয়াছি, আবার ইহা যে স্বল্পাহারী অথবা অভাবপ্রযুক্ত অপ্রচুর ভোজনে অভ্যস্ত ব্যক্তির শরীরে ক্ষয় বর্দ্ধিত করিয়াই থাকে, তাহাও ডাঃ স্মিথের কথায় আমরা দেখাইয়াছি। আমাদের দেশের অধি-বাসীর মধ্যে, প্রায় বার আনা লোক যে উদর পুরিয়া খাইতে পায় না, তাহাও সকলে বিশেষরূপে বিদিত আছেন। এখন

আমাদের চা খাওয়া

আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন, আমাদের পক্ষে চা উপকারী কি অপকারী!

অনেকে বলিয়া থাকেন যে আসাম, জলপাইগুড়ি, দারজিলিং প্রভৃতি স্থানে চা বিশেষ উপকারী—এমন কি তত্তৎ প্রদেশস্থ ম্যালেরিয়া অথবা তড়াই জ্বরেও, জ্বরনাশক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা এ কথার যথার্থতা কতক স্বীকার করিয়া থাকি; কারণ ঐ সব প্রদেশে যদি উহা বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি কখনই প্রচুরভাবে তথায় উহা উৎপন্ন হইতে দিত না। যে বস্তু যথায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঐ প্রদেশস্থ লোকের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

স্থানিক উপকারিতা

কাফি:—সেবনে মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, ও বৃক্কদ্বয়ের উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা উৎকৃষ্ট পচননিবারক (antiseptic) প্রচুর মূত্রনিঃসারক এবং অশ্মরী সঞ্চয়ে বাধাপ্রদানক। কাফি সিদ্ধ করিয়া পরিমিত মাত্রায়, সময় বিশেষে সেবন করিলে, শরীরের উত্তেজনা, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি, ও অন্ত্রের তরঙ্গায়মান (peristoltic) গতির উৎকৃষ্টতা সাধন হইতে দেখা যায়। অধিকন্তু ইহা শরীরের ক্ষয় এবং মূত্র সহ ইউরিক্ আসিডের নির্গম হ্রাস করিয়া থাকে এবং শ্রম জন্য শরীর ও মনের অবসাদভাব অনুভূত হইতে দেয় না; কিছুক্ষণের জন্য, বিনা আয়াসে, নিদ্রাজয় করাইবারও

কাফির গুণাগুণ

ক্ষমতা ইহার বর্ত্তমান আছে দেখা যায় এবং মনকে সতেজ রাখে। কিন্তু ইহাও অধিক মাত্রায়, অথবা নিত্য সেবনে অভ্যস্ত হইলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বুক ধড়্ ফড়্ করা, নিতান্ত অস্থিরতা, আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত জন্মায়। শিশু কাফির সহিত সম পরিমাণ এক বল্কা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিৎ; উহারও প্রস্তুতকরণ চা এর ন্যায় হওয়া প্রয়োজনীয় এবং সদ্য প্রস্তুত, গরম ও চিনি সংযোগে খাওয়া কর্ত্তব্য। আহারের পর, ইহা দুগ্ধ দিয়া অথবা না দিয়া, আদবেই খাওয়া উচিৎ নহে, কারণ উহা পরিপাক শক্তিকে বাধা জন্মান ব্যতীতও অজীর্ণতা এবং অনিদ্রার উৎপাদক কারণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রাতঃকালে কাফি সেবনে পরিপাকশক্তি গোলযোগযুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু অপরাহ্নে ইহা সেবনে তেমন দোষ ঘটিতে দেখা যায় না।

কাফি সেবন প্রথা

অনেক সময় ঔষধার্থেও কাফি প্রযুক্ত হইয়া থাকে; শারীরিক ক্লান্তি, হৃদয় ও মনের অবসাদতা, স্নায়বিক বেদনা, স্নায়ুর বিকৃতি ঘটিত শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা এবং পুরাতন মদাত্যয়জনিত অনিদ্রায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপিচ ইহা বমন নিবারণ, অতিসার প্রশমন, শ্বাসের টান নিবৃত্তি ও মাদক-দ্রব্য সেবন জন্য শিথ ক্রিয়ার দৌর্ব্বল্যনাশ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃদয় সম্বন্ধীয় রোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে অনেক সময়ে উপকার দৃষ্ট হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার

কোকোয়া:—দুগ্ধের সহিত অথবা জল মিশ্রিত দুগ্ধ বা শুদ্ধ জলের সহিত প্রস্তুত করিয়া, ইহা সেবন করা যাইতে পারে ; কিন্তু যে প্রকারেরই প্রস্তুত হউক না কেন,উত্তমরূপে সিদ্ধ হওয়া চাই। অজীর্ণতা দোষসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে, দুই তৃতীয়াংশ গরম জল এবং এক তৃতীয়াংশ গরম দুগ্ধ সহ, ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। চা বা কাফির ন্যায়, ইহাও যেন বেশী কড়া বা উগ্র করিয়া প্রস্তুত করা না হয় ; ইহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন দুগ্ধ অপেক্ষা সামান্য ঘনতর হয় এবং পেয়ালা শূন্য হইলে, তাহাতে সামান্য অধঃক্ষেপ দৃষ্ট হইতে পারে। চোকোলেট পুষ্টি-

কোকোয়া ও চোকোলেট

কারক এবং ইহাও খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু অজীর্ণরোগীর পক্ষে নহে ; ইহাও অনুগ্র করিয়া প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য।

এখন এক কথা উঠিতে পারে যে, চা কাফি ইত্যাদি চারিটী পানীয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ত ? আমরা পৃথকভাবে কয়টিরই গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু সমালোচনায় কোন্‌টি প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ তাহা দেখাই নাই। চা অপেক্ষা কাফি অতি সত্বরে স্নায়ুবিধান গোলযোগযুক্ত করিয়া দেয় ; কোকোয়া উহাদের অপেক্ষা অধিক পোষক হই-লেও সহজ পরিপাচ্য নহে, উপরন্তু উহা একপ্রকার বিশ্রী আস্বাদ-যুক্ত হওয়ায়, অনেকের পছন্দনীয়ও নহে ; চোকোলেট আবার কোকোয়া অপেক্ষাও, স্বল্প উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়।

স্নায়বীয় প্রকৃতির লোকে কাফি, বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে। এই তুলনা দৃষ্টে, ইহা বেশ উপলব্ধ হইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে অনুগ্র চা'ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর্ত্তব্য; কিন্তু

চা কাফি প্রভৃতির পরস্পর তুলনা

ইহা দ্রব্যের গুণবত্তায় নহে, সেবনকারীর শরীরের উপযোগীতায় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ইহার পরে কাফি দ্বিতীয়, কোকোয়া তৃতীয় এবং চোকোলেট চতুর্থ আসন পাইবার উপযুক্ত। কাহারও কাহারও মতে, কোকোয়া কোন প্রকার তরুণ রোগোৎপন্ন অজীর্ণতায় ব্যবহৃত হইতেও পারে, কিন্তু প্রকৃত অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য।

এইবার আমরা মদ্যের বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া পানীয় প্রস্তাব শেষ করিব। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে, মদ খাওয়ার প্রবৃত্তি প্রতিনিয়তই শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছ। অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ মতই, প্রথমে সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিয়া পরিশেষে পূর্ণ মাতাল রূপে পরিগণিত হইতেছেন! এ দৃশ্যও দেখিতে পাওয়া বিরল নহে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, যাঁহারা ইহাকে পানীয় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার মহৌষধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তির অসারতা দর্শন করাইবার জন্য, পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক মনিষীগণের গবেষনার ফল এই স্থানে সাধারণের গোচর করাইতে ইচ্ছা হয়;

মদ্যের সাধারণ গুণ আলোচনায়, আমরা দেখিতে পাই যে,

ইহা রুচিকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলকর, স্বরসংশোধক, শোক-ভয়-শ্রান্তি নিবারক, প্রীতিকারক, অনিদ্রা প্রকাশক, অতিনিদ্রা নিবারক, মলাদিরোধপীড়িত ব্যক্তিগণের কোষ্ঠশোধক, মুখের জড়তানাশক, উদ্বেগাদি বিস্মারক এবং অতিশয় কামোত্তেজনাবর্দ্ধক। অধিক শোকাতুর ব্যক্তি অনেক সময় সন্তঃদুঃখ বিনাশ করিবার জন্য, সামান্য মাত্রায় মদ্যপান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কার্য্য অধিকক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতেই, স্থায়ীভাবে বিস্মৃতি আনাইবার জন্য, বারে বারে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া থাকেন; সুতরাং অনতিবিলম্বে একটি বদ্ধ মাতালে পরিণত হইয়া পড়েন!

মদ্যের সাধারণ গুণ

মদ্যের সাধারণ গুণ সমালোচনায়, উহাকে কোন প্রকারেই মন্দ জিনিষ বলিয়া ধারণা জন্মাইতে পারে না। অনেক সময় এই ধারণা হইতেই মদ্যপানের স্পৃহা যে, বলবত্তর হইতে থাকে তাহার প্রমাণ অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মদ্যপানের ফলে শরীরে কি প্রকার অবস্থা বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নিখুঁত চিত্র এখানে দিতে ইচ্ছা করি। মদ খাওয়ায় তিন প্রকার অবস্থা ক্রমশঃ শরীরে বিকশিত হইতে দেখা যায়। অল্প উত্তেজনাবস্থাকে প্রথম মদ, তদপেক্ষা মত্ততর অবস্থাকে দ্বিতীয় বা মধ্যম মদ ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ লুপ্তাবস্থাকে তৃতীয় বা অন্ত্য মদাবস্থা কথিত হয়। এখন এই তিন অবস্থার বিশেষ লক্ষণগুলিও জানিয়া রাখা

মদ্যপানজনিত অবস্থা বিপর্য্যয়

আবশ্যক। (১) প্রথম মদাবস্থায়, মনে বেশ একটু স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয় ও গীতবাদ্য, হাস্য প্রভৃতি বিষয়ে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পায়; ইহাতে পান ভোজনের ক্রিয়ায় কোন প্রকার বৈলক্ষণ্যভাব বা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির গোলমাল দৃষ্ট হয় না এবং কার্য্যাদি সম্পাদানেও শক্তির লোপ না হইয়া, বরং স্নায়ুবিধান সকল উহার সম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াই থাকে। এই জন্যই এই মদাবস্থা, অতিশয় সুখপ্রদ, এমন কি জগতের কোন প্রকার সুখই ইহার সমতুল নহে বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঠিক এই অবস্থা উৎপাদক মদ্যের মাত্রা খুবই সামান্য এবং পরিমিত; এই জন্যই অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে অভ্যস্তগণ পরিমিত মাত্রায় মদ্যের ব্যবহারে সংকোচ বোধ করেন না।

(২) মদের দ্বিতীয় অবস্থায়, ক্ষণে ২ স্মৃতি এবং ক্ষণে ২ মোহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়; কখনও বা ঐ স্মৃতি বেশ পরিস্ফুট হইয়া পুনরায় লোপ পাইয়া থাকে। সর্ব্বদা সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রলাপ বকা, বেড়াইবার কালে টলিয়া পড়া, এমন কি বসিয়া থাকা অবস্থাতেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টলিতে থাকা, পান ভোজন বা পরস্পর কথোপকথনে সাম্যভাবের অভাব প্রভৃতিও লক্ষিত হয়। তৃতীয় বা অন্ত্য মদাবস্থায়,(৩) মদ্যপায়ী সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত ভূমী দখল করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে! স্থান অস্থানের বিচার করিবার শক্তিও থাকে না। যে আমোদ, আহ্লাদ বা সুখ, পর্য্যায়স্বরূপ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে মদ্য পান করিয়া থাকে তাহা লাভ করিতেও সমর্থ হয় না। যে অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, সুখদুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে, সেই-

অবস্থা পাইতে কোন্ ব্যক্তি স্বতঃ ইচ্ছা করিয়া থাকেন? কিন্তু হায়! অধুনা অধিকাংশ মদ্যপায়ী ব্যক্তিকেই এই অবস্থাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল দেশে, বিশেষতঃ সহরে, মদের দোকানের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনই মদ্য-পায়ীর সংখ্যাও হু হু বাড়িয়া যাইতেছে! কে বলিতে পারে ইহার পরিণাম কোথায়!

"ঔষধার্থ সুরাপানে দোষ নাই" নামে আমাদের দেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য মদ্যপায়ী-গণকে বিদ্রূপচ্ছলেই বলা হইয়া থাকে, কারণ ঐ বিষয়ে কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিলে, উত্তর করিয়া থাকে যে, চিকিৎ-সকের নির্দ্দেশমত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই তাহারা মদ্যপান করিয়া থাকে! কিন্তু প্রকৃতই চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট মাত্রা, তাঁহারা বজায় রাখেন কিনা তাহা স্বীকার করেন না, অথচ ফলে বেশ ধরা পড়িয়া যান! সে যাহা হউক, সুরা যে প্রকৃতই ঔষধার্থ ব্যব হৃত হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের

ঔষধার্থে সুরাপান

মতে ঔষধ প্রস্তুতার্থে, ভেষজ দ্রব্যের সহিত বাধ্য হইয়া, যে পরিমাণ সুরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ব্যতীত পৃথকভাবে, রোগীকে কেবলমাত্র বল প্রদান (Stimulate) করিবার জন্য সুরা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে! কিন্তু আজকাল এলোপ্যাথী-মতে, রোগীর অবস্থা নিস্তেজকর হইলেই, তাহাকে প্রথমতঃ ষ্টিমুলেন্ট অর্থাৎ শরীরে বাহ্যিক উত্তেজনাশক্তি বর্দ্ধন করিবার জন্য মদ (ব্রাণ্ডি), প্রদান করা হইয়া থাকে। এইরূপে উদ্ভূত

দৈহিক উত্তেজনা শক্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, সুতরাং ঘন ঘন (সময় বিশেষে প্রতি ৫।১০ মিনিট অন্তর) ষ্টিমূলেণ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ! কিন্তু প্রতিক্রিয়া শক্তির প্রভাবে, কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত উত্তেজনা শক্তি সত্বরেই, বিশেষ প্রকারে, হঠাৎ অবনমিত হইয়া পড়িতে দেখা দেখা যায় এবং তাহার ফলে মৃত্যু আসিয়া পড়ে। যে কোন দ্রব্যেরই, দৈহিক উত্তেজনা শক্তি বর্দ্ধনের ক্ষমতা বর্ত্তমান আছে, তাহাই উত্তরোত্তর প্রযুক্ত হইতে থাকিলে, যে সময়ে তাহারই প্রতিক্রিয়া শক্তির বলে উহা হঠাৎ অবনমিত হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না ! তথাপি দেহস্থ রক্তমোক্ষণ, ফোস্কা করিয়া দেওয়া প্রভৃতির স্থায় মদ্যপ্রয়োগ ব্যবস্থাও এলোপ্যাথীমতে যথেষ্ট প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার এই অবনমনকারী শক্তির অস্তিত্ব পাশ্চাত্য-জগৎ পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন না ! সম্প্রতি জর্ম্মনির অন্তঃপাতী বার্লিন নগরীর প্রফেসার স্মিমিড্‌বার্গ (Schimidberg) পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মদ্য উচ্চতর স্নায়বিক কেন্দ্রের অবসাদক বস্তু। উক্ত জর্ম্মান্‌ প্রফেসারের নূতন মত ঘোষণার ফলে, সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ চমকিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক মতিমান্‌ পণ্ডিত ঐ মতের সমর্থনও করিতেছেন। হায় ! পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষম আনন্দপ্রদায়ক এই মদ্যাসক্তিপ্রভাবেই ভারতবাসীর জীবনীও ক্রমশঃ ক্ষয়

পাশ্চাত্যের ভ্রম

পাইতেছে! অনেকের ধারণা আছে যে, নিয়মিত ভাবে মদ্য-পান করা, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বড়ই প্রয়োজন, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক আহারীয় পদার্থের অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন! এ ধারণা যে ভ্রমপূর্ণ তাহাও পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে; ইহার প্রভাবে জান্তব শরীরে কেবলমাত্র চর্বিময় তন্তুরই (fatty tissue) পরিপোষণ হইয়া থাকে, অন্য কিছুরই নহে।

দৈহিক উত্তেজনাশক্তি বর্দ্ধণের চেষ্টায়, মদ্য কর্তৃক যে পরিণাম ফল উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা দেখান হইয়াছে; এখন আর একজন পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও যে, উহার ব্যবহার আবশ্যকীয় নহে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রফেসর জি, সিম্‌স উড্‌হেড্ এম্, এ, এম্, ডি মহোদয় কিছুদিন পূর্ব্বেই ইহার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহারই প্রকৃত অনুবাদ দেওয়া গেল :—"প্রতিদিন কি পরিমাণ মদ্য পান করিলে, দৈহিক সুস্থতা রক্ষা হইয়া, মদ্যপান জনিত বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে না পারে, এই বিষয়ের মীমাংসায় উপ-

মদ্যপানে স্বাস্থ্যরক্ষা

নীত হইবার জন্য, বহুদিবস হইতেই সাধারণ লোকের, এমন কি চিকিৎসকগণের মধ্যেও বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে যতই গভীর চিন্তা করা যায়, ততই প্রতিকূল মতাবলম্বী হইয়া পড়িতে হয়! কিছুদিবস পূর্ব্বে, নৈমিত্তিক ভাবে, ২ ঔন্স মদ্যপান করা, পানেচ্ছুগণের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ বলিয়া কথিত হইত; কিন্তু এখন

জর্মানী ও সুইট্সারল্যাণ্ডের নিদানতত্ত্ববিদ, শারীরতত্ত্ববিদ, এবং স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানবিদগণের পরামর্শানুসারে, জর্মান সমিতি কর্তৃক মদ্যপান কৃত মাদকতানিবারণোদ্দেশে, যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, ১-১। ঔন্স মদ্যপানই আবশ্যক স্থলে যথেষ্ট এবং অনপকারক, কিন্তু এই সামান্য পরিমাণও নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, মদ্য, যে কোন প্রকারই হউক না কেন—ব্রাণ্ডী, ওয়াইন, বিয়ার, যেনো—এবং যত অল্পই হউক না কেন, মনুষ্যদেহের পক্ষে বিষ বলিয়াই জানিবে। মদ্যের যদিই কোন প্রকার বলপ্রদানক বা পরিপোষক ক্ষমতা থাকে (যাহার সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে) তাহা অতি সামান্য এবং কোনই কার্য্যের নহে। যিনি জীবনে কদাচ মদ্যপান করেন নাই, তাঁহাকেই প্রকৃত সদাচারী ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি বলিতে পারা যায়। সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটেন্‌কফারের (Pettenkofer) স্থলাভিষিক্ত মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ডাক্তার ম্যাক্স গ্রবার (Max Gruber), মহাশয় বলেন যে, পরিমিত মদ্যপানের অনুকূলে কোনই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উহা নিত্য পান করিলে যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, এরূপ উপদেশ দেওয়া বড়ই অন্যায়!! তিনি বলেন যে, সামান্য পরিমাণে (এমন কি ১-১। ঔন্স) মদ্যপানেও মনুষ্যসমাজে প্রকৃত অপকার সাধিত হইতেছে।

সমুদয় প্রকার ওয়াইন ও স্পীরীট মাত্রেতেই, অল্পাধিক পরিমাণে এল্‌কোহল বর্ত্তমান থাকে এবং এল্‌কোহলের পরি-

মদ্যে এলকোহলের মাত্রা

মাণ যতই অধিক থাকে, উহা ততই উগ্রতর ও অপরিপাচক হইয়া পড়ে। প্রুভ স্পীরিটে যে পরিমাণ এল্‌কোহল থাকে, তদপেক্ষা স্বল্প বা অধিক এল্‌কোহল সমেত মদ্যকে, প্রুভ স্পীরীটের উচ্চ (above) অথবা নিম্ন (below) নামে বর্ণনা করা হয়। হুইস্কি, ব্রাণ্ডি বা রম্ ইত্যাদিতে কি পরিমাণ এল্‌কোহল মিশ্রিত করিতে পারা যাইবে, তাহা আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করা আছে, অর্থাৎ সেই মাত্রায় এল্‌কোহল সেবনে বিশেষ কোনই দোষ হয় না, কিন্তু ব্যবসাদারগণ তাহা ঠিক রাখে না। ইহার অধিক পরিমাণ বিশিষ্ট এল্‌কোহল সংযুক্ত মদ্যপান করিলেই, যকৃৎ ও পাকাশয়ের গোলযোগ দেখা দিবার সম্ভাবনা।

মদ্যপানে সাবধানতা

অনিচ্ছাসত্বেও আমরা এখানে মদ্যপানের বিষয়ে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করাইতে চাহি। পাশ্চাত্যগণের মতে, স্পীরিট কিংবা ওয়াইন নিয়মিত এবং স্বল্প মাত্রায় ব্যবহারে পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত করে। কিন্তু "শূন্য উদরে" (অর্থাৎ যখন পাকস্থলীতে অন্য কোন ভুক্তবস্তু বর্ত্তমান না থাকে) ইহার পান অতিশয় দোষজনক, কারণ পাকস্থলীর আবরণ পাত্র মদ্য সংযোগে ক্ষরিয়া যায় এবং পরিপাক শক্তিও লোপ পায়। লালবর্ণের মদ্যে ট্যানিন নামক পদার্থ আছে। এই ট্যানিন্ যে পরিমাণেই থাকুক না কেন, পাকাশয়ে যাইলেই উহা পরিপাকশক্তির হানি জন্মায়। কোন ২ প্রকার মদ্যে চিনির

ভাগ বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং চিনিতে যে, অনেক লোকের পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, এমত স্থলে সেই সমুদয় মদ্যের ব্যবহারে সংযত হইয়া চলা কর্ত্তব্য। সাদাবর্ণের মদ্য সমুদয়ই অম্ল-মদ্য ; ইহাতে সামান্য পরিমাণেই ট্যানিন্ বা চিনি থাকে, সুতরাং লালবর্ণের মদ্যাপেক্ষা ইহাই অজীর্ণরোগীর পক্ষে উপকারক। কিন্তু এই সাদা মদ্যও নিয়ম করিয়া, সোডা জলের সহ মিশাইয়া খাইতে হইবে। পোর্ট নামক মদ্য লালবর্ণের, সেইজন্য অনেকে উহা অজীর্ণরোগীর পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই অজীর্ণতার সহ যদি উদরাময়প্রবণতা বর্ত্তমান থাকে, তবে ইহা অনায়াসে ব্যবহার করান যাইতে পারে এবং আমরা ২।১ স্থলে ইহা ব্যবহার করাইয়া বেশ ফল পাইয়াছি। বিলাতী অর্থাৎ পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থেই আবার ইহাও দেখা যায় যে,"যদি ষ্টিমুলেণ্ট অর্থাৎ উত্তেজক পানীয় সেবন তেমন প্রয়োজন না থাকে, তবে শুদ্ধ জল পান করিলেই চলিতে পারে ; জলের ন্যায় বিশুদ্ধ উপকারক পানীয় আর নাই"। তাহা হইলে এখন বেশ উপলব্ধ হইতেছে যে, মদ্যাদি যে নিতান্তই আবশ্যক এমন নহে, তবে সখের খাতিরে স্বাস্থ্যরক্ষার নাম করিয়া, অল্পমাত্রায় সেবনে বিশেষ দোষ না হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রলোভনময়ী শক্তিকে বিদূরণ করিতে পারা বড় সহজ নহে, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হইতে হইতেই, কখন যে পূর্ণ মদভ্যাস হইয়া পড়ে তাহা বলা যায় না।

বিভিন্ন মদ্য

কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ লিউকিস্‌ও এই মত তাঁহার নব প্রকাশিত Tropical Hygiene নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রীষ্মপ্রধাণদেশে (ভারতবর্ষে) নবাগত ও অবস্থানকারী সাহেবগণকে উদ্দেশ করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা যে মদ্য পান করি তাহা ভালবাসি বলিয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষণ জন্য উহার কোনই মূল্য দেখা যায় না, বরং উহা ব্যবহার না করায় উপকার আছে"।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল

অতিরিক্তমদ্যপানের ফলে প্রধাণতঃ যকৃত এবং পাকস্থলীই বিকৃত হইয়া পড়ে এবং এই দুইটি যন্ত্রের সহ, শরীরস্থ অন্যান্য যন্ত্রের বিশেষরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃত পক্ষে সমুদয় দেহই বিকল হইয়া যায়। মদাত্যয় নামক পীড়া, যকৃতের মধ্যে চর্ব্বি সংঘটন, পাকাশয়িক প্রতিশ্যায় (catarrhs), তরুণ যকৃতপ্রদাহ, যকৃতের সিরোসিস্ ইত্যাদি পীড়াই অধিক স্থলে দৃষ্ট হয় জানিবে। মদমত্ত পিতার ঔরসজাত সন্তানের, মৃগীরোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে; মাতালগণের উপদংশ রোগও সহজে সারিতে চাহে না। বংশে একজন মাতাল থাকিলে তাহার অনুকরণে বংশীয় অন্য লোকেও মাতাল হইতে পারে; যদিও তাহার মন্দ পরিণাম দেখিয়া, বরং উহাতে ঘৃণা জন্মিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু অধঃপতনে যাইবার প্রলোভন পথ এতই আপাতমনোহারী যে, সমাজস্থ কেহ সহজে তাহা ছাড়াইয়া আসিতে পারে না! মদ্যপানাভ্যাসের আর একটি মজা এই যে, প্রথম ২

সামান্য পান করিলেই বেশ পরিতৃপ্তি এবং শরীরে একটু বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তরোত্তর যতই মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই উহার পরিতৃপ্তির ভাগ কমিয়া আইসে, সুতরাং পূর্ব্বের সুখময় ভাব পাইবার জন্য, আরও পান করিতে ইচ্ছা হয় ও অসংযত পানের ফলে, পরিশেষে সংজ্ঞা হারাইয়া মৃতবৎ যথায় তথায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়!!! এখন আর তাহার সেই সুখময় অবস্থাও মনে করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই ঘৃণ্য অবস্থার দৃশ্য প্রতিনিয়ত দেখিয়াও মদ্যপায়ী বা সাধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না! যে সমাজে অন্যের স্বাস্থ্যকামনা করিয়া, সভাসমিতিতে প্রকাশ্য ভাবে মদ্যপান প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমাজের কথা ধরি না! কিন্তু আমাদের সমাজেও, (যেখানে ইহার আস্বাদ লওয়া এখন পর্য্যন্ত লোকে কুকার্য্য বলিয়া জানে), যে দিন দিন এই মদ্যপানাশক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে চলিল, তাহার কি কোন প্রতিবিধান হয় না!

যকৃৎ ও পাকস্থলী ব্যতীত হৃৎপিণ্ডও, বিশেষ ভাবে ইহাতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে; এক ঔন্স এল্‌কোহল সেবনে, নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৩ বার বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ শরীরে মদ্যের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৩ বার অথবা ২৪ ঘণ্টায় ৪৩০০ বার অধিক স্পন্দিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনাধিক এই কার্য্য করিতে যে, হৃৎপিণ্ড বিশেষরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুমেয়। মস্তিষ্কও

পানের সঙ্গফলে বিকৃত হইয়া যায়। যকৃত, মস্তিষ্ক এবং বৃক্ক যন্ত্রের টিস্যুর উপর মদ্যের বিশেষ ক্রিয়াশক্তি আছে, সুতরাং পরিমিত মাত্রায় সেবন করিতে থাকিলেও, ঐ সকল যন্ত্রের টিস্যু সমুদয়ের প্রকৃতই অনিষ্ট সাধিত হয়। অনেক স্ত্রীলোক প্রসবের পর, নির্ব্বোধ ধাত্রী অথবা শুশ্রূষা-কারিণীর প্ররোচনায় সুনিদ্রা হইবার জন্য, প্রত্যহ একটু করিয়া মদ্যপান করিয়া থাকেন! এমন কি সদ্যজাত শিশুকে পর্য্যন্ত উহা ২।১ কোঁটা করিয়া সেবন করাইয়া থাকেন! এ প্রথা বড়ই দোষাবহ; ইহার ফলে ভবিষ্যতে ঐ সন্তানের মাতাল হইবার সম্ভাবনা বিশেষরূপে, এই সুতিকাগারেই সূচিত হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যহ চিনি ব্যবহারে মদ্যপানাশক্তি কমিতে পারে; চিনির সরবৎ যে অতিশয় তৃষ্ণানিবারক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এবং এই জন্যই জর্ম্মানীর সৈন্যগণের "শীঘ্র-গতির" (Quick march) সময়ে তাহাদিগকে ইহা সবৃহ পরিমাণ সেবন করিতে দেওয়া হয়। অন্য কোন খাদ্য জিনিষই ইহার সমতুল নহে। বিশেষ পরীক্ষায় অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বিশেষতঃ উষ্ণপ্রধান-দেশে, অধিক পরিমাণে চিনি অথবা শর্করাবাহুল্য খাদ্য জিনিষ ভোজনে, এলকোহল অথবা অন্য কোন প্রকার ষ্টিমুলেণ্ট পানীয় সেবনের স্পৃহা কমিয়া যায়। যে জাতি অধিক শর্করা অথবা তাহাধিক্যযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করে, তাহাদিগের অপেক্ষা

মদ ছাড়িবার উপায়

যাহারা উহা স্বল্পভাবে আহার করিয়া থাকে, তাহারা অধিক মদ্যপায়ী হইয়া থাকে বলিয়া পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। দেশীয় মদ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কমাইবার ক্ষমতা শর্করায় আছে বলিয়াই, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট, সর্ব্বাধিক পরিমাণে ইহা ক্রয় করিয়া, ফিলিপাইনের সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার জন্য প্রতি বৎসর পাঠাইতেছেন। সল্‌ফিউরিক আসিড্ ২।৪ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ সেবনেও, মদের আশক্তি কমিয়া যায়। অতিরিক্ত মদের নেশা হইলে, শীতল জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া বা ৩।৪ হস্ত উপর হইতে, শরীরে জল ঢালিতে থাকিলে, সত্বর নেশার ঘোর কাটিয়া সংজ্ঞালাভ হইতে পারে; সংজ্ঞা পাইলে তখন উগ্র কাফি খানিকটা সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাদক দ্রব্য প্রস্তাব।

তামাক, অহিফেন, গাঁজা, কোকেন ইত্যাদি।

এই প্রস্তাবে বর্ণিতব্য বিষয়ের বর্ণনার পূর্ব্বেই, মদ্যকে যাহাকে সম্পূর্ণ মাদকদ্রব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য,—কেন এই প্রস্তাবের মধ্যে না ধরিয়া পূর্ব্ব অর্থাৎ পানীয় প্রস্তা

মদ্য পানীয়রূপেই সমাজে কতকটা অবৈধভাবে চলিয়া যাই-তেছে, তাই উহাকে পানীয়পদার্থের মধ্যেই ধরা গিয়াছে। সুতরাং এই প্রস্তাবে অহিফেন, গাঁজা, সিদ্ধি; তামাক ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া যাইব; অজীর্ণতার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই —আহার্য্য, পানীয় অথবা ধূমগ্রহণীয়, যে কোন দ্রব্যেরই হউক না কেন,—সমুদয় দ্রব্যের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া যাইবার ইচ্ছাবশতঃই, নিত্য ব্যবহার্য্য না হইলেও, আমাদের সমাজে যাহা যাহা অল্পবিস্তরও সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছি।

তামাক :—জগতে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ, স্ত্রী (স্থলবিশেষে), সকলেই শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদন জন্য ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরিমিত মাত্রায় ধূমপান করিলে, ইহা হৃদ্য,কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং শ্রম ও ক্লান্তিনাশক ;লালাস্রাব,আন্ত্রিক রসক্ষরণ ও মূত্রনিঃসরণ বর্দ্ধনকারকও বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। ইহা

তামাকের গুণ

অধিক দিবস এবং অধিক পরিমাণে সেবনে কাহারও ২ কম্প, মৃগীরোগের ন্যায় আক্ষেপ, অক্ষিতারার সঙ্কোচন, হৃদয়ের অব-সাদভাব, ত্বকের অস্বাভাবিক শীতলতা ও প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায়। তামাকের পাতার রস অবসাদক এবং আক্ষেপ নিবা-রক; ইহার শুষ্ক পত্র, উত্তেজক, বিষমিষাজনক, বমনকারক, এবং কখন ২ বিরেচক। বিষমাত্রায় ইহা "কোমা" উৎপাদন করিয়া হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসের অসাড়াবস্থা আনয়ন করে

গ্রহণ অথবা উহার পাতা চর্ব্বণ করিলে, গলদেশ, স্বরনলী, এবং পাকস্থলীর উত্তেজনা জন্মে এবং পরিণামে অজীর্ণতা, স্নায়বিক অবসাদতা, কামোত্তেজনার খর্ব্বতা এবং এমন কি বক্ষশূল (angina) পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। ইহা ব্যতীত পরিপোষণ এবং পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাতও ইহা উপস্থিত করে; এই জন্য স্বল্পবয়স্ক বালক বা যুবকের পক্ষে ইহার ধূমগ্রহণ বড়ই ক্ষতিকারক। সময়ে সময়ে ইহা হইতে হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্ফীততা প্রভৃতিও জন্মিতে পারে।

ইহার অতিরিক্ত ব্যবহারে, যে সমুদয় বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে তাহার বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, কি কি অবয়বে ইহা আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বৃদ্ধগণ প্রায়ই তামাকু এবং নস্যরূপে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, বালক এবং যুবকগণ সিগারেট, বার্ডসাই, নস্য (আজকাল), তামাকু এবং পানের সহিত গুণ্ডি, চোয়া, সুরতি, ইত্যাদি প্রকারে এবং স্ত্রীলোকেরা তামাক পাতা (পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকেই বিশেষতঃ), সুরতি, চোয়া এবং গুণ্ডি প্রভৃতি প্রকারে পানের সহিত, দিবা রাত্র ইহা সেবন করিয়া থাকেন। ইহাও এক প্রকার নেশা, সুতরাং অভ্যাস যত বাড়াইতে থাক, ততই বাড়িয়া যায়। উড়িষ্যা দেশীয়েরা গুণ্ডি এবং পশ্চিমপ্রদেশীরা খয়সান্ অর্থাৎ তামাকের শুষ্ক পত্র অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রকার ভেদে তামাক গ্রহণ

বাঙ্গালী চিরদিনই অনুকরণ বিদ্যায় পটিয়সী, সুতরাং ইংরাজের নিকট সিগারেট, সিগার, উড়িয়ার নিকট গুড়ি, পশ্চিমাদের হইতে সুরতি এবং নিজ দেশীয়ের তামাকু ও নস্য সকলি ব্যবহার প্রথা বজায় রাখিয়াছে। ইহার বিষময় ফল সকলে বিদিত না থাকায়, স্ত্রীমহলে পর্য্যন্ত ইহার প্রসার বৃদ্ধি জ্ঞাত থাকিয়াও প্রতিরোধ করে না।

অধুনা বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি তালিকায় দেখিতে পাইবে, প্রতি বৎসর ৫০।৬০ লক্ষ টাকার সিগারেটের ধ্বংশ আমরা করিয়া থাকি !! কিন্তু ইহা কি আমাদের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ? না কখনই নহে !! বরং আমাদের মজ্জাগত ব্যাধি আনয়নের ইহাই প্রধান কারণ। তামাকুসেবন শ্রমজীবীগণের পক্ষে বিশেষ আরাম-

তামাক খাওয়া সখের জিনিষ!

দায়ক, অথবা শারিরীক বা মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি জন্য সেবনে, তৃপ্তি ও শান্তিপ্রদ, কিন্তু সখের খাতিরে উহা খাওয়ার অভ্যাস বড়ই দূষনীয়। আজকাল যুবক ও বালকগণের মধ্যে যে, অত্যাধিক পরিমাণে তামাকুসেবন প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে সম্পূর্ণ সখের খাতিরে ইহা বোধ হয় সকলেই বিদিত আছেন। যে স্কুল কলেজে, আমরা নিসঙ্কোচে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া থাকি, তথা হইতেই যে অপরিণত বুদ্ধির বালকগণ, এই কু অভ্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাও সর্ব্ব বিদিত। কিন্তু অস্থিরমতি বালকগণের দোষ কি? তাহা-

দিগকে ত নীতিশিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয় নাই? অথবা এই সমুদয় ব্যবহার করিলে যে, শরীরের পক্ষে অপকার হইতে পারে তাহাও ত বলিয়া দেওয়া হয় নাই! তারপর একবার অভ্যস্ত হইলে, সমুদয় নেশার ন্যায় ইহার ব্যবহারও সহজে আর ছাড়িয়া দিতে পারে না!

পরিমিত মাত্রায় তামাকের ধূমগ্রহণ যে, অনেকের পক্ষে অনিষ্টকারক নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আবার কোন কোন লোকের শরীরে তামাক যে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাও অবিশ্বাস্য নহে! তামাক পাতা চর্ব্বণ বা নস্য লইলে, পাকস্থলীর প্রদাহ সংঘটনের সম্ভাবনা, কিন্তু উহার ধূমে স্নায়বীয় শূল জন্মিতে পারে। অধিকন্তু ইহাতে দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল এবং প্রতিহত করিয়া দেয়, সম্মুখস্থ বস্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যায় না—এমন কি চক্ষে ছানি পড়া পর্য্যন্ত ঘটিয়া অন্ধতা আসিয়া পড়িতে পারে। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য, কাণ ভোঁ ভোঁ করা, মাথায় প্রবলবেগে রক্তধাবণ, শিরোঘূর্ণন, চিত্তনিবিষ্ট হইয়া মানসিক কার্য্য সম্পাদনে অক্ষমতা ও মেলাঙ্কলিয়া এবং আত্মপ্রতি অবিশ্বাসভাবও ইহাতে সংঘটিত হইতে পারে। নিদ্রাবস্থা গভীর না হইয়া, ভয়জনক স্বপ্নমালায় বিজড়িত হইয়া পড়ে। এই সব জন্য পরিপোষণের বিঘ্ন এবং স্নায়ুমণ্ডলীর বলক্ষয় হওয়ায়, সম—কার্য্যকারিত্বের (co-ordination) অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়া, মাংসপেশীর বর্দ্ধণ ও তাহাতে মেদসঞ্চয়ের ক্রিয়া স্বল্পতর হইয়া

তামাকের ব্যবহার ও অপব্যবহার ফল

আইসে। স্বাভাবিক ক্ষুধা মন্দীভূত হওয়া এবং পরিপাক শক্তির হ্রাস, গলার স্বরের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়াও বিরল নহে। ডাঃ লডার ব্রণ্টন (Laudar Brunton) বলেন যে, তামাকে নিকোটিন নামক উহার তীক্ষবীর্য্য বর্ত্তমান থাকা হেতুই, ইহা সেবনে অপকার করিয়া থাকে, কারণ নিকোটিন বিষবৎ অনিষ্টকরী জিনিষ। কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে,তামাকের পচনাবস্থা (decomposition) হইতে উদ্ভূত পাইরিডিন্ (pyridine) ও কলিডিন্ (collidine) পদার্থদ্বয়ের অবস্থিতি জন্যই যত অপকার সংঘটিত হয়।

বিলাতী প্রথামত "পাইপ" যোগে তামাকের ধূমগ্রহণে, পূর্ব্বোক্ত পাইরিডিন্ নামক পদার্থই অধিকভাবে ধূমপায়ীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু "সিগার" রূপে উহা গ্রহণে, বাহ্য বায়ুর সংযোগ অধিকতর পাওয়ায়, তামাকের কলিডিন্ পদার্থই অধিক গৃহীত হইয়া থাকে। এই কলিডিন পদার্থ পাইরিডিন অপেক্ষা স্বল্প হানিজনক, সেজন্য ভারতবাসী ইয়ুরোপীয়গণ, পাইপ অপেক্ষা সিগার অধিক গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহাতে বিশেষ অপকার করে না। দেশীয় প্রথামতে, তামাকের সহিত গুড় ও অন্যান্য মসলা সংযুক্ত থাকায়, শুষ্ক তামাক অথবা উহার পাতায় ধূমগ্রহণ অপেক্ষা, অল্প ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। এ কারণ তামাকুসেবন যদিই কেহ প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে বিলাতী আদর্শে সঞ্চালিত

বিলাতী ও দেশী ধূমপান প্রথা

না হইয়া, দেশীয় প্রথামত খাঁটি তামাক সাজিয়া ধূমপান করাই প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সিগারেটের অনিষ্টকারীতার কথাও আলোচনা করা আবশ্যক; এই সিগারেট সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকরী; ইহাতে অজীর্ণতা, ফুস্‌ফুসের দৌর্ব্বল্য, হৃৎস্পন্দন, এমন কি থাইসিস্ পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে পারে। এমন অপকারী জিনিষই আবার, অত্যধিক মাত্রায় আমাদের বালক ও যুবকগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!! বিলাতী প্রথামত "পাইপ" ধূমগ্রহণও, সিগার ও সিগারেট অপেক্ষা প্রশস্ততর। সকল সিগার ও সিগারেট সমান শক্তিবিশিষ্ট থাকে না, ব্যবহারকারীগণের জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ইজিপ্‌সিয়ান অথবা তুরস্কের সিগারাদি অপেক্ষা, আমেরিকার সিগার অপেক্ষাকৃত স্বল্প হানিজনক এবং ঘরের মধ্যে বসিয়া উহার ধূমগ্রহণ অপেক্ষা, বাহিরের মুক্তবায়ুতে ধূমগ্রহণই প্রশস্ততর।

সিগারেট ও সিগার

তামাকের ধূমগ্রহণ সময়, যাহাতে উহা নিশ্বাসের সহ ফুস্‌ফুস্ মধ্যে যাইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অজীর্ণতা রোগগ্রস্তগণ ইহার আস্বাদ গ্রহণে যেন একেবারে বিরত থাকেন; যদি সামান্য অজীর্ণতা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে দিবারাত্রির মধ্যে ২।১ বার মাত্র, খুব নরম তামাকু সেবন চলিতে পারে। সিগার অথবা সিগা-

তামাকু ব্যবহারে সাবধানতা

রেট মোটেই স্পর্শ করিওনা এবং তামাকুর ধূম পরিপূর্ণ স্থানে আহার করিবেনা; তামাকুর ধূম পরিপূর্ণ স্থানে থাকাও যাহা, তামাকুসেবনও তাহাই জানিবে। প্রাতে উঠিয়াই তামাকু সেবন, অজীর্ণরোগীর পক্ষে উপযুক্ত নহে; আহারের পূর্ব্বে বা পরক্ষণেও তামাকু গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে পরিপাকশক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়।

একই উদ্ভিদ হইতে সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস উৎপন্ন হইয়া থাকে; পাতার নাম সিদ্ধি, মঞ্জরীর নাম গাঁজা এবং উহা হইতে নিঃস্রুত রসের নাম চরস্ জানিবে। সিদ্ধি প্রধানতঃ কামবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক, হর্ষদায়ক ও বহু রজঃস্রাবনাশক; অজীর্ণতা ও গনোরিয়া পীড়ায়, সামান্য মাত্রায় ইহা ব্যবহারে অনেক স্থলে উপকার হইতে দেখা যায়; কিন্তু নিয়মিত-রূপে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, উহা সেবন-কারীকে রুক্ষস্বভাবযুক্ত করিয়া ফেলে। স্বাভাবিক নম্র স্বভাবও ইহার প্রভাবে বদ্‌মেজাজী হইয়া পড়িয়াছে দেখা গিয়াছে। ইহার ক্কাথ দ্বারা স্নায়বিক বেদনাযুক্ত স্থান, এরিসিপ্যালস ও অর্শ স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ওলা-উঠার পূর্ব্ব অবস্থায়, ইহা প্রয়োগে আফিমের ন্যায় সুফল প্রদান করিয়া থাকে অনেকে বলেন, কিন্তু আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, কারণ অনেক সময় দেখিয়াছি উহা প্রযুক্ত হইলে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। গাঁজাও সিদ্ধির ন্যায় নিদ্রাকারক, বেদনাহর এবং ক্ষুধা ও সাহসবর্দ্ধক। আফি-

সিদ্ধি, গাঁজা, চরস

মের ন্যায়, ইহা কোষ্ঠবদ্ধকারক বা অগ্নিমান্দ্যজনক নহে, অথবা অহিফেণের ন্যায়, তাহার সহচর কষ্টপ্রদ উপসর্গাদিও আনয়ন করে না। মদ ও আফিমের ন্যায় ইহাও, অনেকে নেশা রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। পুরাতন বাতরোগ, কষ্টরজঃ বা অতিরজঃ এবং শিঃরপীড়াদিতে ইহা ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যস্তভাবে কিংবা দীর্ঘকাল সেবনে, ইহা মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ করে, স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা এবং হস্তপদের কম্প ও ক্ষীণতাও আনয়ন করিয়া থাকে। চরসেরও সাধারণ গুণ এই জানিবে।

দ্রব্যের ভেষজ গুণ

দ্রব্যমাত্রেই গুণসম্পন্ন, এবং তাহা কেবলমাত্র পীড়াকালেই প্রযুক্ত হইলে উপশমপ্রদায়ক হয়, কিন্তু যদি তাহা শরীরে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর উহার সে গুণ বর্ত্তমান থাকে না, বরং অপব্যবহারজনিত মন্দ ফলরাজিই উৎপন্ন করিয়া থাকে।

অহিফেণ

অহিফেণ :— ঔষধার্থ পরিমিত মাত্রায় সেবনে, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রথমে উত্তেজনা জন্মাইয়া, পরে সমুদয় শরীরের অবসাদতা আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ নিদ্রাজনক, বেদনাহর, আক্ষেপনাশক, ঘর্ম্মকারক, মাদক ও মস্তিষ্কের অবসাদক। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া থাকায়, স্নায়ু দ্বারা ইহা দেহের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া থাকে। আফিম স্বল্পমাত্রায়ও কিছু দিন সেবনে, শুক্র ও ঘর্ম্মস্রাব বর্দ্ধিত হয়, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রসাদি স্রাব হ্রাস প্রাপ্ত

হয় ও মুখগহ্বর ও গলদেশের শুষ্কতা জন্মায়। পাকাশয়িক রসের স্রাব হ্রাসযুক্ত হয়সুতরাং ক্ষুধাও কমিয়া যায়; পিত্তরসের ক্ষরণ কমিয়া যাওয়ায়, পরিণামে কোষ্ঠবদ্ধতা আসিয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবর্দ্ধন জন্য, নাড়ী বেগবতী হয়, ঘোর তন্দ্রাভাব আইসার পূর্ব্বেই,কাল্পনিক চিন্তাবিকাশে মন নানা প্রকার অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত হয়। নিদ্রা ভালরূপ না হইয়া, ঘোর তন্দ্রাপূর্ণ—সুতরাং স্বপ্নবিজড়িত হয় এবং জাগরিত হইলে দেখা যায় যে, হয় মাথা ধরিয়াছে, নয় উত্তম জীর্ণ হয় নাই, কোষ্ঠও পরিষ্কার হইতেছে না এবং শরীর স্ফূর্ত্তীশূন্য বোধ হয়।

আমাদের দেশে অহিফেণ বিশেষরূপে প্রচলিত দেখিবে; চীনদেশেও আবালবৃদ্ধবনিতার আরামদায়ক পদার্থ বলিয়া বিশেষতমরূপে এতদিন ইহা আদৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান চীনা গবর্ণমেণ্ট উহার বিষময় ফলে, চীনাজাতির জীবনীশক্তি দিন দিন অবসাদগ্রস্ত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, দেশ হইতে একেবারে অহিফেণ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অহিফেণ প্রভাবে চীনাগণ এতই অবসাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সমগ্র জগতের অর্দ্ধসংখ্যক অধিবাসীর বাসস্থান এবং চিরদিন শৌর্য্যবীর্য্যে গরীয়ান্ থাকা সত্ত্বেও, আজ চীনাগণ জগতে সকলের নিকট অপদস্থ এবং বিধ্বস্ত! উপর্য্যুপরি এইরূপে বিধ্বস্ত হইয়াই, চীনা গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন যে, অহিফেণ সেবনই তাঁহাদের জাতীয়শক্তি খর্ব্বের এবং জাতীয় জীবনের উদ্দীপনা নাশের কারণ—সুতরাং দেশে নবশক্তি সমুত্থান

করিতে হইলে, জাতীয় জীবননাশের মূলোচ্ছেদ করাই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু বহুদিবসের অভ্যাস একেবারে ছাড়িবার উপায় নাই এবং সে চেষ্টায় অপকার ভিন্ন উপকারের কোনই আশা নাই; তাই চীনা গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, দশ বৎসরের মধ্যে উহা সেবনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেই হইতে, নতুবা সেবনকারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

অহিফেণে চীন

অহিফেণের ব্যবহার দূষনীয় বলিয়া আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, আদৌ কোন প্রকারেই উহার ব্যবহার করা উচিত নহে; ঔষধরূপে ইহা সমুদয় প্রকার বেদনার উপশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু মস্তিষ্কের প্রদাহে ব্যবহার করা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। সকল প্রকার উত্তে-জনা কিংবা আক্ষেপ, সাময়িক বিদূরণে ইহা এলো-প্যাথির প্রধান ঔষধ। প্রধাণতঃ অনিদ্রা, সায়াটিকা, কটিবাত, ক্যান্সার, রেনাল কলিক অথবা পিত্তশূল প্রভৃতিতে ইহা প্রযুক্ত হইলে, উত্তেজনার উপশম হইয়া নিদ্রা আসিয়া পড়ে। অহিফেণের এই উপশমকারক ক্ষমতা আর কিছুই নহে—ইহা কেবলমাত্র নেশা জন্মাইয়া শরীর অবসন্ন এবং বেদনাদির বোধশক্তি হ্রাস করে মাত্র। এই শক্তি অহিফেণের ক্রিয়া বর্ত্তমান কালাবধিই দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে মাত্র উহার ক্রিয়া হ্রাস হইতে থাকে, পূর্ব্ব বেদনা ও পুনরায়

ঔষধে অহিফেণ

করিতে হয়। ফলে এমন সময় আসিয়া পড়ে যে, আর অহিফেণেও কাজ দেয় না এবং অন্য কোন ঔষধেও (যতক্ষণ অহিফেণের ক্রিয়ানাশক ঔষধ না পড়িতেছে) বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। বেদনা উপশমকারক রূপে ব্যতীতও গ্রহণী, আম ও রক্তাতিসার, অতিরিক্ত শ্লেষ্মানির্গম, বহুমূত্র, প্রচুর লালাস্রাব ও প্রদরস্রাবের প্রাচুর্য্য হ্রাস করিবার জন্যও অহিফেণ ব্যবহৃত হইতে সদাই দেখা যায়। কিন্তু ফল সেই একই অর্থাৎ প্রথমে স্বল্প কমিয়া, পরিশেষে আর কার্য্যকরী হয় না; কারণ নিত্য ব্যবহারে উহার পৃথক ভেষজগুণ নষ্টীভূত হইয়া, শরীরের প্রকৃতিগত পদার্থ মধ্যেই উহা পরিগণিত হইয়া যায়।

অহিফেণ অন্যান্য মাদক দ্রব্যের স্পৃহানাশক

আফিমের আর একটি গুণ এই যে, একবার ইহার প্রেমে মজিতে পারিলে, আর অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের, (যেমন মদ্য, গাঁজা, কোকেন ইত্যাদি) স্পৃহা থাকে না। অন্যান্য মাদক দ্রব্যের সহিত ইহার বিভিন্নতা এই যে, ইহা মানুষকে উন্মাদ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে মারপিট, গৃহবস্তুর অপচয় অথবা "টাকা উড়াইবার" সহায়তা করে না! নির্দ্দিষ্ট সময়ে, অভ্যাস পরিমিত আফিম পাইলেই তৎসেবী সন্তুষ্ট, এমন কি জগৎ সংসার ভুলিয়া, কাল্পনিক সুখচিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে!

মাত্রাধিক্যতায় অহিফেণ প্রাণনাশক—তাই আমাদের দেশে

দেশের বৃদ্ধগণ প্রায়ই ইহার সেবক এবং অনুসন্ধানে প্রায়ই অবগত হইতে পারা যায় যে, কোন প্রকার পীড়া শান্তির জন্য, সর্ব্বপ্রথম উহার ব্যবহারে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া, পরিশেষে আর ত্যাগ করিতে পারেন নাই! এই বিষময় জিনিষ কদাচ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; অভ্যাস অধিক দিনের হইলে, আর ছাড়িতে পারা যায় না—সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হইয়া ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না ছাড়িয়া, ক্রমে মাত্রা কম করিয়া আনিতে হয় এবং তাহাতে বিশেষ অপকারও করে না। আফিম খাইয়া নেশার ঘোর লাগিলে, খানিকটা কাফি সেবন করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কাফি অহিফেণের উত্তম প্রতিষেধক।

অহিফেণ পরিত্যাগের উপায়

কোকেন নামক একপ্রকার মাদকদ্রব্য আজকাল এত অধিকরূপে প্রচলিত দেখা যাইতেছে যে, বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসকের ব্যবস্থা ভিন্ন, সাধারণে ইহা বিক্রিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু গোপনে ইহা এত অধিক বিক্রয় হইতেছে যে, আইন করা বা না করা সমান দাঁড়াইয়াছে। কোকেনসেবী ইহা সেবন করিতে পাইলে, ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে ভুলিয়া, কেবল ইহাই খাইতে থাকে। যে কয়দিন ইহার বশে থাকে, তখন অন্য কোন জিনিষ খাইতেও পারে না,—কেবল কচুরি, চানাচুর এবং পান সদা চর্ব্বণ করিতে চাহে। কোকেনের ক্রিয়ায়, সমুদয় শরীরে দোলন ও অঙ্গ বিকৃতি (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের), হইতে থাকে

কোকেন

চুরি করিতে স্পৃহা হয়। অন্য সমুদয় নেশার ন্যায় ইহাও অভ্যাসকারী পরিত্যাগ করিতে পারে না। চুরি করিতে প্রবৃত্তি কেবল ইহা ও "গুলি"তেই উদ্ভব করায়। অধুনা সহরে ইহা প্রায় প্রত্যেক পানের দোকানেই গোপনে বিক্রীত হইয়া থাকে। পাকস্থলী বিকৃতি, জিহ্বার জড়তা, ভীতিপূর্ণ স্বভাব, বুদ্ধিবিকৃতি ও শারীরিক অবসাদতা জন্য গভীর অচেতনবৎ নিদ্রা হইার ফলে সংঘটিত ইহাতে দেখা যায়। কত ভদ্রলোকের সন্তান যে, কুসংসর্গে মিশিয়া ইহা খাইতে শিখায় অধঃপতিত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। অধিক দিবস খাইলে পরিণামে ইহাতে পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত দেখা দিতে পারে।

মাদকদ্রব্য মাত্রেই বর্জ্জন করিতে চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা পরিণামে উহা হইতে নানা গোলমাল উপস্থিত হইতে পারে!

নবম পরিচ্ছেদ।

খাদ্য পদার্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাধারণতঃ আমরা অনেক সময়ে, ক্ষুধার অনুরোধে আহার করিয়া থাকি, কিন্তু কোন্ কোন্ জাতীয় পদার্থ আহার করা কর্ত্তব্য, তাহার বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক মনে করি না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আহার করিয়া যাই মাত্র। সুস্থশরীরীগণের পক্ষে এই প্রকার আহারে কোনই অপকার

ঘটিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু অসুস্থশরীরে বিষম ক্ষতি করিয়া থাকে দেখা গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ের উপর একটু দৃষ্টি সকলেরই রাখা আবশ্যক, বিশেষতঃ চিকিৎসকের— কারণ তাঁহার ব্যবস্থামতই রোগী আহার করিয়া থাকে।

বিভিন্ন দেশীয়ের আহার

বিভিন্ন দেশে মনুষ্যের খাদ্যপদার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নির্দ্দিষ্ট থাকিতে দেখা যায়; ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানের শ্বেতাঙ্গগণের আহার্য্য প্রধানতঃ রুটী ও মাংস; এস্কুইমো প্রভৃতি উত্তর মেরুপ্রদেশের লোকেরা, সহজেই সর্ব্বপ্রকার চর্ব্বিসংযুক্ত আহার্য্য খাইয়া জীবনধারণ করে! এসিয়াবাসী, চীন, জাপান, পারস্য, আফগান প্রভৃতি প্রায় সমুদয় জাতীরই—বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়গণের—প্রধান খাদ্য, অন্ন ব্যঞ্জন, ঘৃত, দুগ্ধ, ফল ও মূল দৃষ্ট হয়। আরব্যগণের ন্যায় মরুদেশবাসীগণ, রুটি, কলাই এবং খর্জ্জুরাদি খাইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর যে প্রদেশে, যেরূপ খাদ্যই প্রচলিত থাকুক না কেন, প্রত্যেকেরই আহার্য্য পদার্থের মধ্যে শরীররক্ষণ ও পোষণোপযোগী আবশ্যকীয় সকল উপাদানই প্রধানতঃ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

এই উপাদান সকল সর্ব্বপ্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, যথা, (১) নাইট্রোজেনস্ বা প্রোটিড্ পদার্থ এবং (২) অ-নাইট্রোজেনাস্ (নাইট্রোজেন রহিত) পদার্থ। চর্ব্বিজাতীয়, শ্বেতসার-জাতীয়, খনিজজাতীয় এবং জল, এই কয়টি পৃথক পদার্থ লইয়া দ্বিতীয় বিভাগটি গঠিত

জানিবে। নাইট্রোজেনস্ বা প্রেটিড্ পদার্থ আবার (ক) জান্তব ও (খ) উদ্ভিজ্জ প্রকারে দুই ভাগে বিভক্ত। এই নাইট্রোজেনস্ পদার্থ আমাদের শরীর সংগঠন ও সম্পূরণ করিবার জন্য, বিশেষ প্রকারে আবশ্যক হইয়া থাকে—সুতরাং ইহার বিষয় একটু বিশদভাবে জানা কর্ত্তব্য। নাইট্রোজেন বিভাগ যথা:—

খাদ্যের উপাদান

নাইট্রোজেন

জান্তব

এলবুমিন, কেসিন, জিলাটিন, মোবিউলিন, কণ্ডিৃণ

গ্লুটেন, এলবুমেন, লেগুমেন

আমাদের খাদ্য অন্তর্গত প্রোটিড পদার্থ যথা:—মৎস্য, মাংস, ডিম এবং দুগ্ধ ও ভেজিটেবেল (vegitable) নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ। এখানে আমরা এই উদ্ভিজ্জ নাইট্রোজেনের কথাই বলিব। উপরের তালিকা হইতে ইহার অন্তর্গত আমরা ৩টি জিনিষের নাম দেখিতে পাই; এখন দেখিতে হইবে কোন্ ২ প্রচলিত খাদ্যে উহা দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিজ্জ প্রটিড

বিশেষ পরীক্ষায় জানা জানা গিয়াছে যে, গ্লুটেন Gluten নামক পদার্থ, ময়দায় শতকরা ১১ ভাগ, ছোলার ছাতুতে ১২॥ এবং চাউল মধ্যে ৫ ভাগ দৃষ্ট হয়। (ময়দায় চাপ বাঁধাইয়া, ক্রমে ক্রমে শ্বেতসারীয় অংশ বিধৌত করিয়া ফেলিলেই, এই গ্লুটেন পাওয়া যাইতে পারে)। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্যপদার্থ। এল্‌বুমেন্ albumen নামক পদার্থ আলুতে শতকরা ১·৫ভাগ এবং মটর বা তদ্রূপ শুঁটিজাতীয় পদার্থে

শতকরা প্রায় ২২ ভাগ লেগুমেন legumen নামক পদার্থ পাওয়া যায়। বার্লি, ময়দা ও আটায় গ্লুটেনের পরিমাণ অধিক ও শ্বেতসারের অংশ স্বল্প দেখিবে। সরিষার মধ্যে, শ্বেতসার অধিক এবং প্রোটিড্ স্বল্প। রাসায়নিক পরিমাণ দৃষ্টে শুঁটি-জাতীয় পদার্থ, অতিশয় পুষ্টিকর বলিয়া প্রতীত হইলেও, রুটি প্রভৃতি অপেক্ষা ইহারা বিলম্বে পরিপাক পাইয়া থাকে, সুতরাং উহাদের ব্যবহারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা মৎস্য, মাংস বা ডিম্ব আহার করে না, এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ প্রোটিড পদার্থ নিয়ন্ত্রিত আহার করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের খাদ্যসামগ্রীতে ১ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত এবং ৪ ভাগ নাইট্রোজেন রহিত পদার্থের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক।

খাদ্য পদার্থের মধ্যে, যে পরিমাণ দ্রব্য শরীরের পরিপাচক digestive এবং সমীকারক assimilative কার্য্যপ্রণালী দ্বারা গৃহীত হইয়া শরীরবিধানের গঠন, টিসু সমুদয়ের মেরামত repairs এবং মাংসপেশীয় ও জৈবনিক vital শক্তি energy সরবরাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে অর্থাৎ সেই পরিমাণকে ঐ খাদ্যপদার্থের মূল্য Food-value কহে। প্রত্যেক খাদ্য পদার্থের, এইরূপে মূল্য value নিরূপক আদর্শ পরিমাণকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ক্যালরি Calorie বলে। যতদূর সম্ভব এইরূপে প্রত্যেক খাদ্যপদার্থের মূল্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, যে সকল দ্রব্য সহজে পরিপাক পায়, স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং প্রচুর, অথচ সহজলভ্য তাহাই আহার করা কর্ত্তব্য। সময়ে সময়ে আবার

আহার্য্য পদার্থের নির্ব্বাচন

আহার্য্যপদার্থের পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা অরুচি জন্মাইতে পারে।

খাদ্য হিসাবে, নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ মাত্রেরই সমান গুণ দেখা যায় না; এলবুমিনস্ ও কেসিন জাতীয় এই পদার্থই বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে দেখা যায়। জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং দুগ্ধ ও পানীয় জলের সহিত, নানা প্রকারে আমরা খনিজপদার্থও ভোজন করিয়া থাকি। জল আমাদের খাদ্য পদার্থের মধ্যে একটি প্রধাণতম জিনিষ। ইহা আমাদের শরীর ওজনের, শতকরা ৩০ভাগ অধিকার করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা ফুস্ফুস, কীডনী ও ত্বক দ্বারা বহিঃনিসৃত হইয়া যাই-তেছে। এইজন্য প্রত্যহ তিন সের বা পাঁচ পাঁইট জল সর্ব্ব-প্রকারে আমাদের নিত্য পান করা কর্ত্তব্য। পানীয় হিসাবে যে, বিশুদ্ধ জলই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর তাহা যথা স্থানে বলিয়া আসিয়াছি।

ডাঃ কারপেন্টার Carpentar বলেন যে, সময়ে সময়ে শ্বেতসারজাতীয় আহার্য্য. পদার্থের পরিবর্ত্তনের ন্যায়, আমিষ-জাতীয় ভক্ষ্যদ্রব্যেরও পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক।

মৎস্য ও মাংস

মৎস্য আহারের প্রথা, আমিষ আহারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নানা বৈজ্ঞানিকের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। ডাঃ জন্ ডেভী John Davy বলেন যে, মৎস্যভোজীরা যেমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, তেমন আর কোন শ্রেণীর লোকে হইতে দেখা যায় না। অবশ্য সকল শ্রেণীর মৎস্য যে, সহজ পরিপাচ্য (সুতরাং

স্বাস্থ্যকর) নহে তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মধ্যমজাতীয় অর্থাৎ নাতিক্ষুদ্র বা নাতি বৃহৎ মৎস্যই, যে সহজ পরিপাচ্য তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক বৃদ্ধি-বৃত্তির সঞ্চালনজনিত শ্রান্তি দূর করিতে, মৎস্য অপেক্ষা উপাদেয় শ্রেষ্ঠ খাদ্য উপদান আর নাই বলিলেও চলে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। মৎস্য মধ্যে ফস্‌ফরাস নামক পদার্থের অস্তিত্বই এরূপ ধারণার প্রধাণ কারণ, কিন্তু মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ডাঃ লিউকিস সাহেবের মতে ইহা ভ্রমমূলক ? অপিচ তিনি বলেন যে, ফস্‌ফরস অধিক ভক্ষণে শরীরের অপকার ভিন্ন উপকার বড় দেখা যায় না। রোমের সমৃদ্ধি-কালে ধর্ম্মযাজকগণ, তথায় মাংসের পরিবর্ত্তে প্রায়ই মৎস্যাহার করিতেন এবং তাহার ফলে বহু চিন্তাশীল এবং কর্ম্মঠ কার্য্য সম্পাদন করা সত্বেও তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! আমাদের বিশ্বাস এখনও যদি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, অতিরিক্ত মাংসাহারের বদলে মৎস্য অধিক পরিমাণে ভোজন ও সুরার পরিবর্ত্তে, পানীয়রূপে নির্ম্মল জল ব্যবহার কবিতে পারেন, তাহা হইলে আজকাল-কার ন্যায়, ডায়াবিটিস্‌, বাত,ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের আতিশয্য তাঁহাদের মধ্যে আর বর্ত্তমান থাকিতে পারে না !!

নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত খাদ্য পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ যুক্ত তালিকা দেওয়া গেল :—

নাম	নাইট্রোজেন	কার্ব্বণ	ধাতব	জল
চাউল	৭	৭৮	১	১৪
এরারুট, সাগুদানা, পানিফল	৪	৮২	১	১৩
লাল আলু	২	২৮	৩	৬৭
গোল আলু	২	২৩	১	৭৪
বাঁধা কপি	১	৫	১	৯৩
বাদাম	২৯	৪৮	৪	১৯
নারিকেল	৬	৪৪	১	৪৯
কলা	৫	২১	১	৭৩
খেজুর	৯	৫৮	০	৩৩
আঙ্গুর	১	১৫	১	৮৩
আপেল	০	১১	০	৮৯
পেয়ারা	০	১১	০	৮৯
কুল	০	৯	১	৯০
ফুলকপি	৬·৪	৩·৬	০	৮৯
শশা	১·৫	১·৫	০	৯৭

N.B. কাঁচা কল শ্বেতসারজাতীয়, কিন্তু পাকা কলে তৈলাক্ত পদার্থই অধিক থাকে।

নাম	নাইট্রোজেন	কার্ব্বণ	ধাতব	জল
চিনি	০	১০০	০	০
গুড়	০	৮২	০	১৮
মাখন ও ঘৃত	০	১০০	০	০
গম	১৩	৭২	২	১৩
জনার	৯	৭৫	২	১৪
যব	১১	৭২	২	১৫
মৎস্য	১৪	৭	১	৭৮
মাংস	২২	১৪	১	৬৩
ডিম্ব	১৪	০	১	৮৫
ডাইল, ছোলা	১৯	৬২	৩	১৬
অরহর	২০	৬১	৩	১৬
মটর	২৫	৫৮	২	১৫
মসুর	২৪	৫৯	২	১৫
খেঁসারী	২৮	৫৬	৩	১৩
বরবটি	২৪	৫৯	৩	১৪
মুগ	২৪	৬০	৩	১৩
মাস কলাই	২২	৬২	৩	১৩
কলাই সুটি	৭	৩৬	২	৫৫
দুগ্ধ	৫	৮	১	৮৬

N. B প্রত্যেক খাদ্য পদার্থের ১০০ ভাগের পরিমাণ ইহাতে বুঝিতে হইবে।

রাসায়নিক তালিকা দিবার সময় দুগ্ধের, সদা ব্যবহৃত প্রকার কয়টির বিশেষ তালিকা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি; এই দুগ্ধ আমরা প্রধাণতঃ দুই প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকি (১) শিশুবয়সে মাতৃস্তন্য এবং পরবর্ত্তী সময়ে (২) গাভীদুগ্ধ—সময় বিশেষে মাহিষ, গর্দ্দভী এবং ছাগীদুগ্ধও আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি (দুগ্ধ প্রস্তাবে ইহাদের বর্ণনা দেখ)।

বিভিন্ন দুগ্ধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

	নারী	মাহিষ	গর্দ্দভী	গাভী	ছাগী
জল……………	৮৮।৮৯	৮৪.১০	৮৯.১	৮৭।৮৮	৮৫।৮৬
অতরল পদার্থ……	১১।১২	১৩.৫০	৮।৯	১২।১৩	১৩।১৪
নাইট্রোজেনস্ পদার্থ (কেসিনোজেন ও আল্‌বুমিন)	১।২	৪.৬০	৩.৫৭	৩.৫	৩.৭৯
দুগ্ধ শর্করা…………	৬	৪	৪.৫০	৫	৩.৭৮
চর্ব্বি……………	৩ ৫।৪	৭.১০	১.৮৫	৩.৫	৪.৩৪
ভস্ম (ash)	.2	.৫	.৬	.৭	5

এই তালিকা দৃষ্টে আমরা পাইলাম যে, নারীদুগ্ধ অপেক্ষা গাভী-দুগ্ধে অধিক পরিমাণে কেসিনোজেন Casinogen আছে এবং সত্বর জমাট (ছানা হইয়া) বাঁধিয়া যায়; ইহার অধঃস্থ কেসিন্ নারীদুগ্ধের কেসিন হইতে, অপেক্ষাকৃত ভারী ও অতরল, কিন্তু শর্করার পরিমাণে গাভীদুগ্ধ নারীদুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মাহিষদুগ্ধে চর্ব্বি এবং প্রোটিড্ পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক দৃষ্ট হয়। মাহিষ কিংবা গো দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে, তবে নারী দুগ্ধের সহিত সম উপাদান বিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু গর্দ্দভী ও ছাগীদুগ্ধ স্বয়ংই নারীদুগ্ধের সহ প্রায় সমপ্রকৃতি-সম্পন্ন। প্রথমটি সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায় না এবং শেষোক্তটিতে কেমন এক প্রকার গন্ধ থাকার জন্য, সকলে পান করিতে চাহে না। এইজন্য উহারা প্রায়ই শিশুর দৈনিক আহার রূপে ব্যবহৃত হয় না। ছাগীদুগ্ধ শিশুকে সেবন করাইতে হইলে ছাগী স্বগৃহে রাখিয়া পালন করা কর্ত্তব্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

এই পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, কেমন করিয়া খাদ্য অথবা পানীয় পদার্থ মুখগহ্বর,

পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে একে একে উপনীত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকে। প্রকৃতির এই আরব্ধ কার্য্যে কেমন করিয়া আমরা বিশেষ সাহায্য করিতে পারি তাহা, এবং কোন্ কোন্ জিনিষ পরিত্যাগ করায়, প্রকৃতির নৈমিত্তিক পরিপাচন ক্রিয়া সহজসাধ্য হইয়া উঠে তাহাও, যথাস্থানে বিদিত করা হইয়াছে। অজীর্ণতা যে সংক্রামক ব্যাধি নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন এবং পূর্ব্ববর্ণিত অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, চেষ্টা করিলে অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যথাসাধ্য পালন করিলেই, উহার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া অবশ্য যাইতে পারে।

অজীর্ণতা

যদিই বা কোন প্রকার অনিয়ম বা অত্যাচারে অজীর্ণতা দেখা দেয়, তাহা হইলে প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা জন্য যে সমুদয় প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সাধনে যত্নবান হইলেই দেখিবে যে, অজীর্ণতা আর ক্লেশ দিতে পারিবে না। প্রকৃতির নির্দ্দেশিতে পথে যাইয়া, তাহারই কার্য্যে যদি সহায়তা করা যায়, তাহা হইলে কেন সে আমাকে ক্লেশ দিবে? তবে অবাধ্য হইলে আমাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে!

আমরা জ্ঞানবুদ্ধিতে যতই কেন গরীয়ান্ হই না, প্রকৃতিকে আমাদের বশে কখনই আনিতে সমর্থ হইব না; উপরন্তু সেই চেষ্টা করিতে যাইয়াই, উপর্য্যুপরি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, শেষে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই। এখন বিজিতের উপর বিজেতা, (সকল স্থানেই যাহা করিয়া থাকে) আপন আধিপত্য বিস্তার

পূর্ব্বক নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে! কিন্তু যদি বিজিত সহজেই তাহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক, তাহার নিয়োগ মত চলিতে অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে বিজেতা সখ্যস্থাপন করিয়া বিজিতের সহ Co operative মিলিয়া কার্য্য করিতে পারে এবং তাহাতেই সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যায়; প্রকৃতির সহিত তোমারও সেই সম্বন্ধ জানিবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার ফলে, অজীর্ণতারূপ নির্য্যাতনের ভোগ তোমাকে সহিতেই হইবে এবং তোমার অবাধ্যতাও যত অধিক হইতে থাকিবে, অজীর্ণতাও স্তরে স্তরে ভীষণ হইতে ভীষণতরভাবে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই, তোমাকে কষ্টপ্রদান করিবে। নির্য্যাতনের মাত্রা চরমে উঠিবার পূর্ব্বেই, যদি তুমি নিজ দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া, প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করিতে পার, তাহা হইলে সহজেই তাহার সখ্যতা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তোমাকে স্ববশে আনিবার জন্য, প্রকৃতিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় তাহা হইলে, জেদের বশে, সবল যেমন দুর্ব্বলকে যাতনা প্রদান করিয়াই আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে, —স্ববশে আসিয়াছে জানিয়াও যেমন সহজে তাহার সহিত সুব্যবহার করিতে চাহেনা—সেইরূপ প্রকৃতিও তোমার বশ্যতাভাব দেখিয়াও, যেন কতকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, সহজে তাহার নির্য্যাতন প্রণালী উঠাইয়া লইতে চাহে না! এই জন্যই অজীর্ণতা (সঙ্গি পাঙ্গ সহ) একবার বিশেষ প্রকারে, তোমার শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, সুনিয়মে চলিলেও তখন আর ২।১

প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ

দিনেই তাহার গ্রাস হইতে তুমি নিস্তার পাইতে পার না! সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া চলা কর্ত্তব্য!

বাহ্য জগতে অগ্নিতে যেমন ইন্ধন না যোগাইলে, উহা প্রজ্বলিত রাখা যায় না, সেইরূপ দৈহিক অগ্নি বজায় রাখিতে হইলেই খাদ্য-পানীয় রূপ ইন্ধনের আবশ্যকতা দেখা যায়। প্রকৃতির এই খাদ্যপদার্থাদি পরিপাক ও প্রসর্পন absorption করিবার শক্তি বড়ই সুকৌশলময় দেখা যায়; মুখগহ্বর হইতে অন্ত্র পর্য্যন্ত পথে, ঐ খাদ্যপদার্থাদি বিচরণ করিবার সময়ে, যেমন উহার সারাংশ শরীরে গৃহীত হইয়া থাকে, তেমনি অবশিষ্টাংশ দেহ মধ্য হইতে মলরূপে প্রত্যহ বাহির্নিঃসৃত হইয়া যায়। প্রকৃতির এই নিয়ম শৃঙ্খলায়, যদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেই, উহা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আজকালকার

কোষ্ঠবদ্ধতা

সভ্যতানির্দ্দেশক নানা প্রকারের রন্ধনযুক্ত খাদ্যপদার্থাদি ভোজন, বাসগৃহ ও শয্যাগৃহের প্রায়শঃ বায়ু চলাচলের অভাব, পাঠ বা মজলিস্ গৃহেই বসিয়া অধিক সময় যাপন, অথবা কর্ম্মসূত্রে অধিকক্ষণ যাবৎ এক অবস্থাতেই থাকা হেতু, সকলকে বাধ্য হইয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়। সুতরাং প্রকৃতির সহজসাধ্য কার্য্যও, বাধা প্রাপ্তি জন্য সুসাধিত হইতে না পারিয়া, প্রত্যহ খাদ্য পদার্থের অবশিষ্ট অসাড় অংশ বহির্নিঃসৃত করাইতে পারে না—ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা দাঁড়াইয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, এক, দুই বা তিন দিবস অন্তর মলপদার্থ নিঃসৃত হওয়া; কোন কোন স্ত্রীলো-

কোষ্ঠবদ্ধতার পরিণাম

কের এই কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হওয়া, সপ্তাহে একবার করিয়া হই-তেও দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি? প্রকৃতির নিয়ম নির্দ্দেশিত সময়ের (যাহা প্রত্যহ একবার অথবা সময়ে এক দিনান্তর পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায়) অধিকক্ষণ যাবৎ অন্ত্রমধ্যে মল-পদার্থ সঞ্চিত থাকায়, তথায় পচিতে decomposed আরম্ভ হয় ও তাহার ফলে এক বিষময় পদার্থের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। এই বিষময় পদার্থকে টোমেন ptomains নামে অভিহিত করা হয়। অন্ত্রের কার্য্য নীরব থাকায়, এই টোমেন বিষ শরীরবিধানে প্রসর্পিত হইয়া যায় এবং রক্তক্ষীণতা, অবসাদতা, দুর্ব্বলতা, শিরঃপীড়া, ও কেমন একপ্রকার সাধারণ অসুখভাব, উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রধাণতঃ ক্ষুধা-লোপ, অজীর্ণতা, মনোবিকার এবং অনিদ্রাভাব জন্মাইতে দেখা যায়। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, এই সামান্য কোষ্ঠবদ্ধতা (যাহা পীড়া বা উপসর্গ বলিয়া ধর্ত্তব্যই নহে) হইতে কখনই উক্ত প্রকারের অনিষ্টকর ফলরাজী উৎপন্ন হইতে পারে না! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোষ্ঠবদ্ধতা উপেক্ষার জিনিস নহে; ইহাই উপরোক্ত পীড়াদি আনয়ন পক্ষে বিশেষ কার্য্যসাধক জানিবে। উপরন্তু অন্ত্রমধ্যে মল, আবদ্ধাবস্থায় অধিক সময় থাকা হেতু, পচিয়া বিষাক্ত পদার্থ সকল উৎপন্ন করতঃ, পূর্ব্বোক্ত-রূপ ক্ষতি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না; ঐ কঠিন, সঞ্চিত মলপদার্থ সকল নিজেরাই স্বাস্থ্যের বড়ই হানিজনক জানিবে। সঞ্চিত এই কঠিন পদার্থগুলি. অন্ত্রের শিরার উপর চাপ প্রয়োগ

করিয়া, হৃৎপিণ্ড মধ্যে নিয়মিত রক্তের প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা জন্মাইয়া দেয় এবং ঐ শিরা সমুদয় অপ্রাকৃতিক চাপ পাইয়া স্ফীত ও বিবৃদ্ধ হইয়া পড়ে। পরিশেষে শিরার এই বিবৃদ্ধ অংশ সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকায় tumour পরিণত হইয়া পড়ে। এই টিউমার গুলিকেই সাধারণতঃ অর্শের ইংপ্রি

অর্শ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এই সমুদয় জন্যই, যদি স্বাস্থ্যবান হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে অধিক দিবস জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে এই কোষ্ঠবদ্ধতারূপ, দৈহিক সাম্যভাবনাশকারী শত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, মুখগহ্বর, পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে ভুক্তপদার্থ পরিপাক পাইয়া, তাহার সারাংশ শরীরে প্রসর্পন ও অবশিষ্ট অসাড় অংশ মলরূপে বহির্গমন করানই প্রকৃতির একটি নিত্যকার্য্য। ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলেই জানিতে হইবে যে, তাহা সুস্থতার চিহ্ন নহে। কোষ্ঠবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা সময়, রোগীর কোষ্ঠ পরিত্যাগের সাধারণ অভ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ বিভিন্ন

লোকে বিভিন্ন প্রকারে কোষ্ঠবদ্ধতার কথা বলিয়া থাকে। কেহবা দিবসের মধ্যে ২।৩ বার কোষ্ঠত্যাগ করিয়াও বলিয়া থাকে যে, তাহার কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, অথচ কেহ বা সপ্তাহে একবার যাইয়াই তাহাতে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে মনে করে! সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, তবে উহার প্রতিকারের চেষ্টা

কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার চেষ্টা

করিতে হইবে। এই প্রতিকার চেষ্টা আবার দুই প্রকারের করিতে পারা যায়, ১ম প্রতিষেধক অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধতা যাহাতে জন্মাইতে না পারে এবং ২য় প্রতিবিধান অর্থাৎ উহা বিকাশ পাইলে, কেমন করিয়া বিদূরণ করিতে হয়, তাহার চেষ্টা করা। এখানে আমরা প্রথম প্রকারের উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখিব, কারণ রোগের চিকিৎসা করা অপেক্ষা, রোগ যাহাতে না জন্মাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই সমীচীন বলিয়া বোধ করি। পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহার জন্য, অনেকে মধ্যে মধ্যে সুবিখ্যাত ঝরণার জলপানের জন্য তত্তৎ স্থানে যাইয়া থাকেন—তথাকার ঝরণার জল কয়েক দিবস পান করিলেই, সহজে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে থাকে দেখা যায়। আজকাল বাজারে ঐ সমুদয় ঝরণার জল (অকৃত্রিম ও কৃত্রিম) ভাবে সদাই বিক্রয় হইতেছে; প্রায়ই পরিষ্কার জলের সহিত বাই কার্ব্বনেট অফ সোডা bicarbonate of Soda অথবা Carbonate of magnesia কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্‌নেশিয়া মিশ্রণে কৃত্রিম ঝরণার জল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে একস্থানে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে প্রাতে উঠিয়াই, এই প্রকারের ঝরণার, অকৃত্রিম অথবা কৃত্রিম জল, পূর্ণ এক গ্লাস পান অভ্যাস করিলে পাকাশয়ের গাত্র পরিষ্কৃত হইয়া, পাকস্থলীকে নিজকার্য্য সাধনে সম্যক উপযুক্ত করিয়া দেয় এবং তাহা হইতেই অজীর্ণতা বিদূরীত হইয়া যায়। (১) শয্যা হইতে উঠিয়াই যদি এইরূপে পূর্ণ এক গ্লাস জল পান

করা যায়, তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধতাও দূর হইতে পারে। অন্ত্রের মধ্যে এই জল যাইয়া, মলকে অতিরিক্ত কঠিনতা পাইতে বাধা দেয় এবং অন্ত্রকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশে উত্তেজিত করিয়া, উহার আধারস্থ মল বাহির করিয়া দিবার সহায়তা করে। কোষ্ঠবদ্ধতা যদি সামান্য ভাবের হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ শীতল জল, এক গ্লাস প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়াই পান করিলে, অনেক সময় বিশেষ ফললাভ হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু ইহা একটু স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাবের হইলে, শীতল জল না খাইয়া, গরম জলের সহিত একটু লেবুর রস দিয়া খাইলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। (২) মুক্তবায়ুতে পর্য্যাপ্তরূপে ব্যায়াম করা (৩) প্রাতে শীতল জলে স্নান, (৪) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তরল পদার্থ ভোজন করিয়া, অন্ত্রের মধ্যস্থ মলকে ভিজাইয়া moist রাখা প্রভৃতি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখাও বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার ব্যবস্থা, কেবলমাত্র অতি[illegible]ঃস্রাবী ব্যক্তিগণের পক্ষেই প্রশস্ত, সাধারণের পক্ষে নহে জানিবে।

বিভিন্ন পন্থা

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে, একবার করিয়া পায়খানায় যাইয়া কোষ্ঠ পরিত্যাগের অভ্যাস বড়ই সুন্দর নিয়ম এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণের একটি প্রধান উপায়। দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫ মিনিট যাবৎ সময়, ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা অতিশয় কর্ত্তব্য এবং তাহা প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই

নিয়মিত সময়ে কোষ্ঠত্যাগ

রাখিতে পারিলে ভাল হয়। শরীরের অসাড় বস্তু নিঃসরণ করিবার জন্য, নির্দ্দিষ্ট এই সামান্য সময় যাহাতে কোন প্রকার কার্য্যগতিকে বাধা প্রাপ্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিত্য যদিও সেই সময়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তথাপি নিয়ম করিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই সময়টি ঐ কার্য্যে নিয়োজিত নিশ্চয়ই রাখিতে হইবে; কয়েক দিবস উপর্য্যুপরি এই ভাবে অভ্যাস করিলেই দেখিবে যে, উহা বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিবে এবং ঠিক সেই সময়ে স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে থাকিবে। কোষ্ঠত্যাগের সময় বেগ দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত,

কোষ্ঠত্যাগে বেগ দেওয়া অনুচিত

অথবা কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইতেছে না বলিয়া, অধিক সময় যাবৎ পায়খানায় বসিয়া থাকা অভ্যাস বড়ই দূষনীয়। উপরে বর্ণিত উপদেশ পালন করা হইলে, কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, (যদি বেগ দেওয়া বা অধিক সময় পায়খানায় বসিয়া থাকা অভ্যাস থাকে) যে উহার আর আবশ্যকই থাকিবে না।

পায়খানায় বসিয়া অতিরিক্ত বেগ দিলে, ঐ বেগ দেহের অন্যান্য যন্ত্র এবং রক্তাধারের উপর পতিত হইয়া, নানা প্রকার বিষময় ফল উৎপন্ন করিতে পারে। এই প্রকারে বেগ দেওয়ায়, অনেক সময় বৃদ্ধগণের মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হইয়া এপোপ্লেক্সি (appoplexy) বা সংন্যাস রোগে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে; অন্ত্রবৃদ্ধি (hernia) এবং অর্শও

ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে জানিবে। সুতরাং কোষ্ঠ-পরিত্যাগের সময় বেগ না দেওয়া, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই কর্ত্তব্য। অধিকক্ষণ যাবৎ বসিয়া কোষ্ঠ পরিত্যাগে, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাণের হানি বড় দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে অর্শ এবং কোষ্ঠবদ্ধতাকে সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করিয়া, বদ্ধমূল করিয়া দেয় বলিয়া এই বদভ্যাসও পরিত্যাজ্য জানিবে।

কোষ্ঠবদ্ধতাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে, আহার ও পানীয় সম্বন্ধে কোন প্রকার বাচবিচার করা আবশ্যক কিনা তাহাই এখন দেখা যাউক। একটু পূর্ব্বেই একস্থানে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরণ জন্য ভোজ্য ও পেয় বস্তুর মধ্যে তরল পদার্থ পর্য্যাপ্তরূপে থাকা দরকার ; কিন্তু আবার অজীর্ণতা প্রস্তাব সমালোচনা কালে বলা হইয়াছে, আহারের সময় যেন অধিক তরল জিনিষ, যেমন জল, চা, মদ্য ইত্যাদি, খাওয়া না হয়, কারণ তাহাতে জীর্ণক্রিয়ায় বাধা জন্মাইতে পারে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, একবার তরল পদার্থ পর্য্যাপ্তরূপে খাওয়া কর্ত্তব্য বলা হইতেছে, আবার অন্যস্থলে তাহা নিষেধ করা হইতেছে, তবে কোন্ পথ ধরিয়া চলা কর্ত্তব্য ? যাহার পক্ষে পানীয় সেবন অতি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে, তাহার পক্ষে ঠিক অতরল পদার্থ আহারের সময় উহা না খাইয়া, একটু (১৫।২০ মিনিট) পূর্ব্বে অথবা পরে পান করাই ব্যবস্থা। (৪৩-৪৪ পাতায় বর্ণনা দেখ)। এখানে আহার বলিতে, অতরল পদার্থ অর্থাৎ ভুই

কোষ্ঠবদ্ধতায় ধূমপান ও খাদ্য-পানীয় বিচার

বেলায় আমাদিগের প্রধাণ আহার্য্য, ভাতই অথবা রুটি বুঝাইতেছে জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই, তামাকুসেবনে অনেকের কোষ্ঠত্যাগের চেষ্টা হইতে শুনা যায়; যদি তামাকুসেবনে তাহার কোনই অপকার হইতে দেখা না যায়, তবে এ প্রথা দূষনীয় বলিয়া বর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা নাই। অতিরিক্ত তামাকুসেবনেই অপকার করিয়া থাকে, আবশ্যক স্থলে, নিয়মিত সময়ে উহার পরিমিত ব্যবহারে কোনই দোষ দেখা যায় না। তাহা বলিয়া যাহার তামাকুসেবন অভ্যাস নাই, তাহাকে কোষ্ঠবদ্ধতা নিদূরণ জন্য, তামাকুসেবন অভ্যাস করিতে হইবে, একথা বলা হইতেছে না জানিবেন।

সমুদয় প্রকার ফলমূলাদি (টাট্‌কা হইলেই ভাল হয়)—আপেল, নাস্‌পাতি, পেয়ারা, আতা, আঙ্গুর, কমলালেবু, মেওয়া ফলাদি, ডুমুর জাতীয় বিদেশী ফলাদি), ভোজন করা কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণের সহজ উপায়; জড়ান আচারাদি (বিভিন্ন ফল সমুদয়ের), খোসা, বিচি ইত্যাদি সমন্বিত থাকায়, অন্ত্রের উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া, কোষ্ঠ পরিস্কারে সহায়তা করিয়া থাকে। এই আচার ইত্যাদি জড়ান পদার্থ সকল, অজীর্ণরোগীর পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ। তরী তরকারী, শাকসব্জী সমুদয়ও কোষ্ঠবদ্ধতানাশক জানিবে; এই কারণে শশা, সাঁক আলু, কপি, আলু, ইত্যাদি পর্য্যাপ্তভাবে সেবন করা প্রয়োজন। প্রাতে রুটির সহিত

গুড় খাইতে দিলে বালকবালিকাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিতে দেখা গিয়াছে।

মাংসাদি না খাইলেই ভাল হয়, অথবা যদিই খাইতে হয়, তবে কদাচিৎ এবং স্বল্পমাত্রায়; অধিক লবণ সংযুক্ত দ্রব্যাদি আহার না করা (পাশ্চাত্য দেশেই ইহার অধিক প্রচলন দেখা যায়); ভোজ্যবস্তু পর্য্যাপ্ত চর্ব্বণ করা—দাঁত না থাকিলে উহা বেশ কুচি কুচি করিয়া যেন থেৎলাইয়া রন্ধন করা হয়, তাহা হইলেই আর চর্ব্বণের বিশেষ দরকার হইবে না—উগ্র চা, এবং মাদকদ্রব্যাদি ব্যবহার না করা, এবং আহার শেষ হওয়ার পরই ফলভোজন করা সকল কোষ্ঠবদ্ধ রোগী-রই কর্ত্তব্য। রাত্রিতে শয়নের সময় এক গ্লাস গরম অথবা শীতল জল পান করিয়া শয়নেও, পরদিন প্রাতে অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে দেখা গিয়াছে। এখানে একটি বিষয় আমরা সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছা করি; কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরণের জন্য যে সমুদয় নিয়ম লেখা হইল, তাহা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তখন উহা তোমার স্বভাবের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িবে সুতরাং উহার উপকারীতা আর বুঝিতে পারিবে না। তবে আহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা বলা হইল, তাহা প্রতি-পালনে কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশে তরী তরকারী বা ফলমূলের অভাব নাই, ইচ্ছা করিলে নিত্য নূতন দ্রব্য ভোজন করা যাইতে পারে, কাজেই একঘেয়েত্ব হিসাবেও উহা স্বভাবে পরিণত হইবার ভয় থাকে না।

কোষ্ঠবদ্ধতায় সাবধানতা

বসিয়া বসিয়া অধিক সময় নিশ্চল অবস্থায় জীবন-যাপন করা কোষ্ঠবদ্ধতার একটি বিশেষ কারণ; উপযুক্তরূপে নিত্য ব্যায়াম করা, শুদ্ধ যে কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরণ অথবা তাহার প্রতিষেধকরূপেই আবশ্যক তাহা নহে, সমুদয় শরীরবিধানই ইহাতে সুস্থ এবং শান্তিময় থাকে জানিবে। খাদ্য এবং পানীয় যেমন শরীরের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, তেমনি ব্যায়াম করাও শরীর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জানিয়া, শরীরে অতিরিক্ত মেদ ও মাংস সঞ্চয়ের পূর্ব্বেই, ব্যায়ামে অভ্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য—চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগের প্রতিবিধানে যত্নবান হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য জানিবে। যদি তোমার শরীর পূর্ব্ব হইতেই মোটা থাকে, ব্যায়াম করা তাহা হইলে তোমার মাংসপেশী সকল এবং শারীরিক যন্ত্রাদি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম সম্পাদনে সমর্থ হইবে না; পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা না লইলে, মেদ সঞ্চিত শরীর, অনভ্যস্ত অতিরিক্ত শ্রমজন্য সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কাহারও পক্ষে, মোটা, থল্‌থলে শরীরী হওয়া কর্ত্তব্য নহে, হাড়ে মাসে জড়িত আঁটা শরীরই সুস্থতা এবং সবলের লক্ষণ জানিবে। সুতরাং স্বাস্থ্যসুখ বজায় রাখা, পরিপাচন শক্তি সমুদ্দীপ্ত করা, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সম্যকরূপে সাধিত হইতে দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি অন্ত্রের নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে, সুযোগ ঘটাইয়া দিবার জন্য উপযুক্ত রূপ ব্যায়াম দ্বারা, আমাদিগের মাংসপেশী সকল সবল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করিয়া

রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীরস্থ পেশী সকলকে সদা কার্য্যলিপ্ত রাখিতে পারিলেই, উহা বিকশিত এবং সবল হইয়া, যে কার্য্য সাধনের জন্য সৃজিত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, নতুবা নিশ্চেষ্ট থাকিলেই পেশী সকল পাতলা হইয়া শুকাইয়া যায় -এই অবস্থাকে atrophy শুষ্কভাব বলে—এবং স্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনেও সক্ষম হয় না। হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রপ্রদেশও কতকভাবে, পেশীসমষ্টি বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে, সুতরাং উহাদের স্বকার্য্যে নিবিষ্ট রাখার জন্য ব্যায়াম একান্ত প্রয়োজন।

এখন কথা হইতেছে যে, এই ব্যায়াম কি ভাবে করা যাইতে পারে। শারীরিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যয়াম শিক্ষক স্যাণ্ডো প্রভৃতির অনুমোদিত প্রথাই আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করি; কারণ ইহার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়, শরীরস্থ যাবতীয় পেশীরই রীতিমত চালনা হইয়া থাকে। গুরুভার বিশিষ্ট দ্রব্য লইয়া ব্যায়াম করিলেই যে, সত্বর দেহ সবল হইয়া উঠে তাহা নহে; কিন্তু যে সে সামান্য দ্রব্য হাতে লইয়া (যে পেশী সমষ্টির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে) পূর্ণ-শক্তিতে তাহার পরিচালনা করিতে পারিলেই, সহজে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিবে। এই শরীর পরিচালনার সময়, তোমার মন যাহাতে একমাত্র উহাতেই নিবিষ্ট থাকে, তাহা করা একান্ত আবশ্যক জানিবে—চিত্তনিবেশ না করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। স্যাণ্ডোর প্রথা এবিষয়েও

স্যাণ্ডোর প্রথা

বিশেষ অনুকূল দেখা গিয়াছে - স্প্রীং ডম্বেল (Spring dumbel) ব্যবহার করা এবং সম্মুখে একখানি বড় আয়না রাখিয়া শরীর পরিচালনা করিতে উপদেশ দেওয়া, শুধুমাত্র এক-চিত্ততা করাইবার জন্যই জানিবে। হাতে কোন দ্রব্য না রাখিয়াও, শুধুমাত্র পূর্ণশক্তির সহিত বিভিন্ন প্রকার শরীর পরিচালনায়ও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে; কিন্তু কি প্রকারের পরিচালনায়, কোন্ কোন্ পেশী সম্যক পরিচালিত হইয়া উৎকর্ষলাভ করিতে পারে, তাহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জন্য বিশিষ্ট ব্যায়াম শিক্ষকের অনুমোদিত প্রথা অনুযায়ীই উহা করা আবশ্যক।

পাদ ভ্রমণ

পাদভ্রমন অর্থাৎ পদব্রজে বেড়াইয়া বেড়ান, অতি সহজ উপায়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যায়াম বলিয়াই সকলে অভিমত দিয়া থাকেন। (এ সম্বন্ধে মন্তব্য ২০ পাতায় দেখ)

যে কোন প্রকারের ব্যায়ামই করা হউক না, যদি নিত্য নিয়মিত অভ্যাস রাখা না হয়, তাহা হইলে সবই বৃথা। খামখেয়ালি ভাবে ২।১০ দিনের ব্যায়ামের পরই, যদি শরীর একেবারে বলিষ্ঠ দেখিতে ইচ্ছা কর এবং তাহা না দেখিতে পাইলেই, ভগ্নোৎসাহ হইয়া সকল ব্যায়ামই অফলদায়ক মনে কর, তাহা হইলে হইবে না। রামমূর্ত্তী, স্যাণ্ডো প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যায়াম শিক্ষকের জীবনী আলোচনায় জানিতে পারা যায় যে, শৈশবে সকলেই নিরতিশয় দুর্ব্বল ও পীড়াকাতর ছিলেন, কিন্তু একমাত্র অধ্যবসায় এবং

নিয়মিত অভ্যাসের ফলেই, এখন জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন! নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম সকলকেই যে উহাদের ন্যায় বীর হইতে হইবে তাহা নহে, তবে শরীররক্ষার জন্য দৈনিক ব্যায়াম প্রয়োজন, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, নতুবা শারীরিক সুস্থতালাভ করিতে পারা দুর্ঘট জানিবে।

এই কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণ জন্য, অনেকে জোলাপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোষ্ঠবদ্ধতা নিজে একটি রোগবিশেষ itself a Disease) নহে, কিন্তু শরীরবিধানের কোন কোন যন্ত্রাদির বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই, তাহার আনুসঙ্গিক লক্ষণরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। এই সামান্য বিষয় ভালরূপে অবগত না থাকাতেই সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা-কেই রোগ মনে করিয়া, উহা দূরীকরণের জন্য জোলা-পাদি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ফলস্বরূপ তখন-কার মত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহাই বারে বারে ব্যবহৃত হওয়ায়, পরিণামে কোষ্ঠবদ্ধতা শরীর-বিধানে বিধিবদ্ধ করিয়া দেয় এবং শুধু তাহাতেই নিরস্ত না হইয়া, ভবিষ্যতে কঠিনতর রোগ উৎপত্তির বীজ নিহিত করিয়া রাখে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সুস্থাবস্থায় বা অসুখ অবস্থাতেই হউক, জোলাপ লইয়া মধ্যে মধ্যে শরী-রস্থ ময়লা সকল, অন্ত্র হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক; এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক এবং

জোলাপের আবশ্যকতায় ভুল বিশ্বাস

ভিত্তিহীন বলিয়া জানিবে। এলো-প্যাথিক চিকিৎসকেরা এই যুক্তি মতই কার্য্য করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের শাস্ত্রে রক্তমোক্ষণ, বিরেচক এবং বমনকারক ঔষধ প্রদান ও অজ্ঞান করিয়া যাতনার অনুভবশক্তি লোপ করান ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই! জোলাপের জন্য যে সমুদয় ভেষজপদার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে (ক্যাষ্টার অয়েল, কালমেল্ ম্যাগ্নেসিয়া, রুবার্ব্ব, এলোজ, পডোফাইলম্, অন্যান্য সল্ট (Salt) অর্থাৎ লাবনিক পদার্থ ইত্যাদি) তাহার সমুদয়ই অল্পাধিক পরিমাণে বিষের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। তীব্র বিষ সামান্য পরিমাণে খাইলেও, বমন ও বিরেচন উৎপাদন করে, অথবা পাকস্থলীর অনিষ্ট সাধন করে জানিবে; স্বল্পতর তীব্র বিষপদার্থ সকলই বিরেচক ঔষধ বলিয়া সাধা-রণতঃ গণ্য হয়।

এইরূপ জোলাপ লওয়া অভ্যাস হইতেই ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। উপর্য্যুপরি জোলাপ লইতে থাকিলেই, সকল সময় উহা আশাপ্রদ ফলদায়ক হয় না, কারণ তখন কোষ্ঠ উন্মোচনকারী পদার্থ সকল শরীরের নিত্য স্বভাবজ দ্রব্যের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া পড়ে। সুতরাং অভ্যাস মত জোলাপ প্রয়োগেও, যখন কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইল না দেখা গেল, তখনই উগ্রতর বস্তুর সাহায্যে উহা করাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়! উপর্য্যুপরি কষাঘাতে নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া, অন্ত্রের কার্য্য এতই সতেজে হইতে

থাকে যে, উহা আবার অস্ত্রের সাহায্যে বন্ধ করা প্রয়োজন হইয়া উঠে। অন্ত্রের এই অতিরিক্ত উত্তেজনাবস্থা হইতেই কঠিন ওলা-উঠা পীড়া উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব অযথা জোলাপ লইয়া, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন দেখি না; তবে যদি উহার একান্তই আবশ্যকতা বোধ কর, তাহা হইলে গ্লীসারিণ Glycerine সহ জল মিশ্রিত করিয়া, তাহার পিচ্‌কারী অথবা কেবল মাত্র ঈষদুষ্ণ জল কিম্বা সাবানগোলা জল দিয়া পিচ্‌কারী করাইয়া দিতে পার। কিন্তু এই ব্যবস্থাও যেন ঘন ঘন করা না হয়। মৃদু বিরেচক স্বরূপ রাত্রিতে এক পোয়া দুগ্ধের সহিত সামান্য কিস্‌মিস্‌ অথবা মনক্কা এবং শুষ্ক গোলাপের পাতা কয়েকটা সিদ্ধ করিয়া খাইলেই, পর দিবস প্রাতে সুন্দর ভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

জোলাপের পরিণাম

উগ্র ঔষধাদি সেবনে অন্ত্রকে অতিশয় উত্তেজিত না করিয়া, আমাদের ব্যবস্থা মত কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিষেধক অনুষ্ঠান গুলি এবং প্রকৃতই উহা উপস্থিত হইয়া ক্লেশদায়ক হইতেছে বুঝিতে পারিলে "এনিমা" অর্থাৎ গ্লিসারীনাদির সামান্য পিচ্‌-কারী ব্যবহার করিলে, প্রায়স্থলেই সুফল উৎপন্ন হইতে দেখিবে। মাসে ২।৩ বার জোলাপ ব্যবহার করা অভ্যাস-যুক্ত অনেকে, আমাদের এই ব্যবস্থামত চলিয়া ঐ কু অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন আর কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যও তাঁহারা কোন ক্লেশ উপলব্ধি করেন না জানিতে পারিয়াছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

খাদ্যের রাসায়নিক তথ্য বিচার।

প্রাণীমাত্রেরই শরীরের বিভিন্ন টিস্থ সমুদয়, কৃত্রিম যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়, সদাই ক্ষয়প্রবণ থাকিতে দেখা যায়। মাংস-পেশীয় সঞ্চলনক্রিয়াদি সম্পাদন এবং দৈহিক তাপ জননের জন্য, সর্ব্বদাই একটি শক্তি শরীর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে দেখিবে। এই দুই কার্য্যের জন্য প্রতিদিন ১৫০,০০০+৮০০,০০০=১, ০০০,০০০) কিলোগ্রাম [১ কিলোগ্রাম=১০০০ গ্রাম, ১ গ্রাম =১৫০৪৩ গ্রেণ] মিটার শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং কার্য্যনিরত পূর্ণদেহীর শরীরস্থ টিস্থ সমুদয় যে, ইহাতে বিশেষ রূপে ক্ষয় এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই এই জন্যই মস্তিষ্ককোষ, গ্লাণ্ডুলার এপিথেলিয়ম ও রক্তকণিকা সকল, সময়ে সময়ে বদলাইয়া দেওয়া এবং নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন জন্য, সদা নূতন উপাদান সংগ্রহ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবের দেহ সর্ব্বদাই তাহার পরিপোষণ ও বর্দ্ধন জন্য নূতন নূতন পদার্থের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে জানিবে। টিস্থ সমুদয়ের ক্ষয় প্রাপ্ত অবশিষ্ট অংশ এবং শরীরবিধানে সদা যে আহুতি (Combustion) চলিতে

আহারের আবশ্যকতা

থাকে, তাহার পরিণাম স্বরূপ উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের ফুস্‌ফুস, চর্ম্ম এবং কিড্‌নী দ্বারা শরীরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া আইসে। মোটামুটি হিসাবে একজন পূর্ণ বয়স্কের শরীরাভ্যন্তর হইতে ২৪ ঘণ্টায় নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি নির্গত হইয়া থাকে, যথা :—

নাইট্রোজেন	২০	গ্র্যাম
কার্ব্বণ	২৮০	,,
লাবণিক পদার্থ	২৪	,,
জল	২০০০	,,

উপরি বর্ণিত এই ক্ষতি পরিপোষণ জন্যই, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়; এই খাদ্যপদার্থ শরীরাভ্যন্তরে যাইয়া, উত্তাপজনন, ক্ষয়লোপ এবং (যাহারা পূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের) পরিবর্দ্ধণের সাহায্য করিয়া থাকে; সুতরাং ইহার বিশেষরূপ ব্যবহারিক প্রণালী স্বল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই জানা থাকা আবশ্যক। আবার খাদ্যপদার্থ সকলেই কিছু এক ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, কোন্ খাদ্যপদার্থ দ্বারা তাপজনন ক্রিয়া ভালরূপে সাধিত হয়, কাহারও দ্বারা টিস্যুর ক্ষয় পরিপূরণ হইয়া থাকে, কাহারও দ্বারা বা শরীরস্থ বর্দ্ধণক্রিয়া (Growth) সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং সমুদয় খাদ্যপদার্থকে প্রকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়া, আমাদের শরীরপোষণ ও ক্ষয় নিবারণ এবং পরিবর্দ্ধনের জন্য, যে যে প্রকার খাদ্যপদার্থ বিশেষ আবশ্যক, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিশ্লেষণ ক্রিয়া কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে? কোন ব্যক্তি

খাদ্য পদার্থের নিরূপণ

বিশেষের রুচি বা মতানুযায়ী কি ইহা করা যাইতে পারে? না কখনই নহে। "জীবন ধারণ জন্য আমাদের যে প্রকার খাদ্যপদার্থের প্রয়োজন, তাহা আমরা কেমন করিয়া, প্রথমে জানিতে পারিব? প্রকৃতি বা অন্য কেহ আমাদিগকে উহা ত বলিয়া দেয় নাই! কাজেই যেমন হয় একটা সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে"। একথা বুদ্ধিমানের উপযুক্ত নহে! আমরা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতিই স্পষ্টতঃ উহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে, সুতরাং আন্দাজী বা যেমন তেমন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, এই অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপদার্থ নিরূপণ না করিয়া, প্রকৃতি নির্দ্দেশিত পথেই আমাদের চলা কর্ত্তব্য।

জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, অসহায় শিশু যখন অন্য কোন প্রকার খাদ্যপদার্থ ভোজনে সম্পূর্ণ অসমর্থ থাকে, তখন তাহার শরীর রক্ষা ও পোষণের জন্য দেখা যায় যে, প্রকৃতি মাতৃস্তনে, তাহার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই, দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন! ইহা দেখিয়া মনে হয় না কি যে, ঐ নবজাত শিশুর শরীর সম্পূরণের জন্য যে সকল বিভিন্নজাতীয় পদার্থ প্রয়োজনে আসিতে পারে, তাহার সমুদয়ই এই দুগ্ধে যথাপরিমাণে সঞ্চাত আছে? সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যে, আমরা দুগ্ধকেই একমাত্র পূর্ণ খাদ্য রূপে গ্রাহ্য করিতে পারি, কিন্তু ইহা একমাত্র শিশুর পক্ষেই সুপ্রশস্ত। শিশু ব্যতীত অপরের পক্ষে কেবল দুগ্ধেরই উপর নির্ভর করা চলে না, কারণ তাহা হইলে

দুগ্ধই পূর্ণ খাদ্য

অত্যধিক পরিমাণে দুগ্ধ সেবন করিতে হয়। সম্ভবমত কার্য্য-নিরত পূর্ণবয়স্ক লোকের,যদি শুদ্ধ দুগ্ধপানে জীবন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ ৮ পাইন্ট (প্রায় ৫ সের) দুগ্ধপানের আবশ্যক হয়; কিন্তু উহার পরিমাণ অধিক সেবিত হইলে জল, ও অন্য ২।১টি উপাদান প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে শরীরে গ্রহণ করা হইয়া যায়; সুতরাং পরিণামে ইহাতে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পূরা স্বাস্থ্যলাভে ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে। আরও দেখা গিয়াছে যে, একজাতীয় খাদ্য প্রত্যহ ব্যবহারে, আহারে বিতৃষ্ণা ও স্বাস্থ্য-হানিও হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়া যায়। শিশুর পক্ষে কিন্তু এই দুগ্ধই একমাত্র আহার; দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে তাহাকে অন্য কোন প্রকার খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ লালারস এবং ক্লোমরস তখন পর্য্যন্ত তাহার শরীরে নির্গত হইতে আরম্ভ হয় না। দুগ্ধ অবশ্য সহজে পরিপাক হইয়া যায় এবং অসুস্থ অবস্থায় অধিক পরিমানেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানে দেখিতেছি বিষম এক গোলযোগ উপস্থিত হইল; প্রকৃতি নির্দ্দেশিত পথে যাইয়া, আমরা জানিতে পারিলাম যে, দুগ্ধই একমাত্র পূর্ণ খাদ্য—কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, শুদ্ধ উহা শিশুরই উপযোগী, পূর্ণ বয়স্কের নহে! তবে উপায়? অবশ্য হতাশ হইবার আবশ্যক নাই, একটু চিন্তা করিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে।

আমরা অবগত হইয়াছি যে, শরীরবর্দ্ধণ ও পোষণের উপযোগী সকল উপাদানই দুগ্ধে যথোপযুক্ত ভাবে নিহিত আছে; যদি শুদ্ধ একমাত্র দুগ্ধ গ্রহণে পরিণত বয়স্কের শরীর পোষণ না হয়, তাহা হইলে এমন কোন খাদ্য পদার্থ আহাদিগের

গ্রহণ করিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে দুগ্ধের সমুদয় উপাদানই বিদ্যমান থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ analyse করিয়া দেখা গিয়াছে যে

দুগ্ধের বিশ্লেষণ

দুগ্ধে, ছানা, মাখন, চিনি, কতকগুলি লবণ পদার্থ এবং জল আছে, (রাসায়নিক তালিকা ১৯৩ পাতা দেখ)। দুগ্ধ মন্থন করিলে মাখন উৎপন্ন হয়; ছানা ও মাখন তুলিয়া লইলে, উহাতে যে জলীয়াংশ পতিত থাকে, তাহাতে দুগ্ধশর্করা ও বিভিন্নজাতীয় লবণপদার্থ দ্রব অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং দুগ্ধের বদলে (শিশু ভিন্ন অন্যের পক্ষে) নানাজাতীয় খাদ্য-পদার্থ হইতে, শরীরপোষণের উপযোগী, (দুগ্ধ মধ্যে বিশ্লেষণ করিয়া প্রাপ্ত) উপাদানাদি সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ দুগ্ধের বদলে ভাত, ডাল, রুটি, মাছ, মাংস, ডিম্ব, তরীতরকারী, ফল ও মূল হইতেই আমরা ঐ সমুদয় উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। মাছ, মাংস, ডিম, ডাইল ছানা প্রভৃতি পদার্থ হইতে মাংসগঠক ছানাজাতীয় পদার্থ; ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি, মাছের তৈল ইত্যাদি হইতে তাপ ও শক্তি উৎপাদক মাখনজাতীয় উপাদান এবং ভাত, রুটি, আলু, যব, চিনি, গুড় প্রভৃতি খাদ্যপদার্থ হইতে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ হইতে পারে। এই সকল খাদ্যের মধ্যে যে লবণজাতীয় পদার্থ আছে এবং খাদ্য পদার্থের সহিত প্রয়োজন মত যে লবণ সচরাচর যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহার দ্বারা এবং যথা প্রয়োজনীয় জল পান করিয়া আমরা দুগ্ধস্থিত লবণ ও জলের অভাব নিত্য দূর করিতে সমর্থ হই জানিবে। এই

রূপে বিভিন্ন খাদ্যপদার্থ আহারের জন্যই পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে দুগ্ধ ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে এবং তাহাতে শরীর পোষণের কোনই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না জানিবে।

দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা (১) ছানাজাতীয় উপাদান, (২) মাখনজাতীয় উপাদান, (৩) শর্করাজাতীয় উপাদান এবং (৪) লবণজাতীয় উপাদান ইত্যাদি ৪ প্রকারের উপাদান পাইয়া থাকি; এবং তাহাতেই অবগত হইতে পরিয়াছি যে ঐ চারি প্রকার উপাদান যথোপযুক্ত পরিমাণে আমাদিগের নিত্য খাদ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক। এখন জানা আবশ্যক যে, উক্ত চারি জাতীয় উপাদানের গুণ ও বিশেষত্ব কি এবং কোন্ প্রকার খাদ্যপদার্থে তাহা পাওয়া যাইতে পারে? এই বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যই যে একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে স্বতন্ত্র তাহা নহে; একটির দ্বারা অন্যটির কার্য্যও কতক পরিমাণে হইয়া থাকে, তথাপি প্রত্যেক রকমেরই এক একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। খাদ্যপদার্থের রাসায়নিক এই বিভাগের পৃথকীকৃত দ্রব্যগুলিকে Food Stuffs বা খাদ্যপদার্থের উপাদান নিচয় বলা হয়।

খাদ্যনিহিত উপাদান নিচয়ের বিভিন্ন গুণ

(১) ছানাজাতীয় উপাদান :—ইংরাজীতে ইহাকে Protied substance বলে এবং ইহাতে নাইট্রোজেন সমধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। মাংসপেশী ও দৈহিক অন্যান্য যন্ত্রাদির ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন করাই ইহার প্রধান কার্য্য। মৎস্য, মাংস, ডিমের শ্বেতাংশ, পনীর, ছানা, নানাবিধ ডাইল

গম ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত জানিবে। ময়দা, যবের ছাতু, চাউল প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধাণ খাদ্যপদার্থ মধ্যেও ইহা অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। আমাদের শরীরপোষণ জন্য এই জাতীয় খাদ্য পদার্থের সমধিক প্রয়োজনীয়তা জানিয়া রাখিবে, কারণ ইহার দ্বারাই শরীর মধ্যে নিয়ত যে ক্ষয় সাধিত হইতেছে, তাহার সম্পূরণ হয়। এই পদার্থনিচয় পাকাশয় এবং অন্ত্রের মধ্যে জীর্ণ হইয়া পেপ্‌টোনে পরিণত হয়; এই পেপ্‌টোন পোর্টাল (Portal) শিরায় প্রবেশ করে, কিন্তু সাধারণ রক্তাবর্ত্তনের (circulation) মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু যে উপায়ে ইহা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ (Protoplasm) গঠন করে, অথবা বিভাজিত হইয়া অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা আজিও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

২। মাখনজাতীয় উপাদান :—ইংরাজীতে ইহাকে fats চর্ব্বি বা Hydro-carbons বলে; ইহাতে নাইট্রোজেন থাকে না, কেবল কার্ব্বণ, (carbon) জলজান (Hydrogen) এবং অম্লজান (oxygen) থাকে। শর্করাজাতীয় খাদ্যপদার্থ অপেক্ষা ইহাতে অম্লজান অল্প থাকে জানিবে। শারীরিক তাপ উৎপাদন করাই ইহার প্রধাণ কার্য্য। এই তাপই আমাদিগকে কার্য্যশক্তি (energy) দান করিয়া থাকে। মাছ, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় পদার্থের তাপ ও শক্তি উৎপাদক এই ক্ষমতা নিতান্ত অল্প। মাখন ও শর্করাজাতীয় উপাদানযুক্ত খাদ্যপদার্থ হইতেই আমরা শরীর রক্ষনোপযোগী তাপ ও কার্য্যশক্তি (energy) প্রাপ্ত হই। সুতরাং মাংস না

খাইলে শরীরে বলাধান হয় না, এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি, তৈল ইত্যাদি পদার্থ এই জাতীয় খাদ্য পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। পাকাশয়িক রস (Gastric Juice) এই জাতীয় পদার্থের সংযোজক টিসু (Connective Tissue) দ্রব করিয়া লইয়া, চর্ব্বি পদার্থটি পৃথক করিয়া দেয়; পরে উহা অন্ত্রের মধ্যে পতিত হইয়া, ক্লোম এবং স্বল্পমাত্রায় অন্যান্য রসের মিশ্রণে দুগ্ধবৎ পদার্থে পরিণত হয় এবং অধিকাংশই অন্ত্রের ল্যাক্‌টিয়াল্ (Lacteal) মধ্যে প্রবেশ করে; সামান্য অংশই পোর্টাল শিরায় যাইয়া থাকে। ইহা শারীরিক তাপ জননিত করিয়া যে মাংসপেশীর কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

২। শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় উপাদান :—

ইংরাজীতে ইহাকে carbo-hydrates বলে; ইহাতেও নাইট্রোজেন নাই এবং মাখনজাতীয় উপাদান পদার্থের ন্যায়, কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন (অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়) থাকিতে দেখা গিয়াছে। মাখনজাতীয় উপাদান পদার্থের ন্যায় ইহারও প্রধান কার্য্য শারীরিক তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা; তবে প্রথমোক্ত উপাদানে এই তাপ ও শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা অধিক নিহিত জানিবে। চাউল, আলু, ময়দা, চিনি, গুড়, এরারুট, যব ইত্যাদি পদার্থ এই শ্রেণী ভুক্ত। মুখগহ্বর এবং পাকস্থলীতে ইহা পরিপাক পাইয়া, দ্রাক্ষা শর্করায় grape-sugar পরিণত হয় এবং ক্রমে পোর্টাল শিরা দিয়া শরীরে শোষিত হইয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্যের

আধিক্যে শরীরকে স্থূল করিয়া ফেলে; সুতরাং যাহাদিগের মোটা হইবার আবশ্যক থাকে, তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্য অধিক খাইয়া, বসিয়া সময় কাটাইলেই সহজে উহা সাধিত হইতে পারে।

৪। লবণজাতীয় উপাদান :—ইংরাজীতে ইহাকে salts বলে; নিত্য ব্যবহার্য্য লবণই ইহার প্রধাণ জিনিষ। সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যেই, অল্পাধিক পরিমাণে লবণ বিদ্যমাণ থাকায়, খাদ্যপদার্থের সহিত লবণ মিশ্রিত না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু সকল খাদ্যপদার্থে সমান পরিমাণে লবণ থাকে না, কাজেই দ্রব্যবিশেষে স্বল্প বা অধিক লবণ মিশ্রণ করিয়া লইতে হয়। জল ও অক্সিজেনকেও সচরাচর ইহারই মধ্যে গণনা করা হয় জানিবে। লবণজাতীয় উপাদানে মুখের লালা অধিক নিঃসরণ করায় এবং যকৃৎকে পিত্ত প্রস্তুতকরণে সহায়তা করিয়া থাকে। পাকাশয় হইতে যে পাচকরস Gastric-juice নিঃসৃত হয় তাহার অম্লাংশ Hydro-chloric Acid ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লবণজাতীয় উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যপদার্থ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ আমাদিগের বিশেষ আবশ্যকীয় জানিবে; ফলমূল এবং তরী তরকারীতে ইহা যথেষ্টই পাওয়া যায়। শিশুদের বাড়িবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ খাদ্যদ্রব্য (লবণজাতীয়) খাইতে দেওয়া উচিত, নতুবা তাহাদের অস্থি, দন্ত প্রভৃতি কঠিন অংশ সকল সম্যকরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না। উত্তাপ ও শক্তি প্রদান করা ইহার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও, শরীরস্থ কঠিন অংশ সকলের গঠন করাই ইহার প্রধাণ কার্য্য জানিবে।

উহাদের তুলনায় সমালোচনা

উপরে বর্ণিত চারিজাতীয় উপাদান পদার্থ সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মাছ ও মাংসের মধ্যে লবণজাতীয় ও মাখনজাতীয় পদার্থ স্বল্পমাত্রায় থাকে এবং শর্করাজাতীয় পদার্থ মোটেই থাকে না; সুতরাং ইহাকে নাইট্রোজেন-প্রধাণ খাদ্য বলা হয়। চাউলে ছানা ও মাখনজাতীয় উপাদান স্বল্প থাকে, কিন্তু শর্করাজাতীয় উপাদান অতিশয় অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায়, ইহাকে শর্করা বা কার্ব্বো-হাইড্রেট-প্রধাণ খাদ্য বলা হয়। চাউলে ছানা, মাখন ও লবণ-জাতীয় উপদান স্বল্প থাকার জন্যই, ইহার সহিত যথা পরিমাণে ডাইল, মাংস, মাছ, ঘৃত, তৈল, তরী তরকারী, বা দুধ না খাইলে চলে না। চিনি ও গুড়ে ছানা ও মাখনজাতীয় উপা-দান মোটেই নাই, কেবলমাত্র শর্করাজাতীয় উপাদানই বর্ত্ত-মান, এই জন্য ইহাও চাউলের ন্যায় কার্ব্বো-হাইড্রেট প্রধাণ খাদ্যরূপে পরিগণিত জানিবে। ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি ইত্যাদি পদার্থে কেবল মাখনজাতীয় পদাথই থাকে, অন্য কিছু থাকে না এইজন্য ইহাকে হাইড্রো-কার্ব্বন জাতীয় খাদ্য বলা হয়। ডাইল, ময়দা, যবের ছাতু ইত্যাদি পদার্থে ছানাজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদানই সমধিক এবং মাখন ও লবণজাতীয় পদার্থ অল্প থাকে। ডাইলের সহিত ঘৃত বা তৈল যথোপ-যুক্ত ভাবে যোগ করিয়া লওয়া প্রয়োজন, কারণ ইহাতে মাখন-জাতীয় পদার্থ অল্প থাকে (৭৮ পাতা দেখ)। তরী তরকারী, দুধ, এবং পানীয় জলে লবণজাতীয় পদার্থই অধিক থাকে, অন্য জাতীয় পদার্থ কম জানিবে।

মাত্রাধিক্যের বিষম ফল

এই সকল খাদ্যপদার্থের সমালোচনায় আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম যে, কোন একজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। শুদ্ধ মাংস অথবা ভাত খাইলে, আমাদের শরীর সুস্থ থাকে না; কারণ মাংসে ছানাজাতীয় উপাদান প্রচুর থাকিলেও, উহাতে অন্যান্য উপাদানের সমুচিৎ অভাব দৃষ্ট হইতে আমরা দেখিয়াছি। আবার অন্নে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট থাকিলেও, ছানা, মাখন ও লবণজাতীয় উপাদান অল্প থাকে। ছানাজাতীয় খাদ্যপদার্থ অতিরিক্ত খাইতে থাকিলে, ইউরিয়া এবং ইউরিক আসিড্ অতি অধিক পরিমাণে সঞ্জাত হইয়া, শরীরস্থ বহিঃনিসারক যন্ত্রাদির কার্য্য (যেমন যকৃত ও কিড্নীর) অতিরিক্ত বাড়াইয়া দেয়। অঙ্গুষ্ঠবাত, লিথিমিয়া, যকৃতের এবং কিড্নীর গোলযোগ এবং অজীর্ণতা ইত্যাদিও দেখা দিতে থাকে। আবার যদি তৈল, ঘৃতযুক্ত অথবা শ্বেত-সারীয় Starchy পদার্থ অধিক খাওয়া হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িবার সম্ভব এবং পরিণামে অজীর্ণতাও দেখা দিতে পারে। আমাদিগের খাদ্যাহারের মধ্যে যদি একেবারে নাইট্রোজেনস্ অর্থাৎ ছানাজাতীয় পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে মানুষ অধিক দিবস বাঁচিতেই পারে না। এই ছানাজাতীয় পদার্থই আমাদের শরীরস্থ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ক্লান্ত টিসু সমুদয় যে, নূতন করিয়া দেয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শীতপ্রধাণ দেশের লোকে, সহজেই সকল প্রকার চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য আহার করিয়া হজম করিতে পারে, কিন্তু এই

উষ্ণপ্রধান দেশের লোকের প্রধান খাদ্য, অধিক পরিমাণে শর্করাজাতীয় এবং farinacious তরল প্রকারের হওয়াই কর্ত্তব্য।

শিশু অথবা পূর্ণবয়স্ক লোকে যদি স্বল্পাহারে কাল কাটাইতে থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সে মলিন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; সময়ে ২ ঐ দুর্ব্বল অবস্থা হইতে উৎপন্ন উদরাময় অথবা রক্তামাশয় হইয়া মারাও যাইতে পারে। অনুপযুক্ত খাদ্য আহারে অভ্যস্ত শিশুগণে. মন ও Starchy শ্বেতসারীয় দ্রব্য ব্যবহৃত হইলেই, প্রধানতঃ দেখা যায় যে, অজীর্ণতা, পেটে বাতাস জমা, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা উদরাময় উৎপন্ন হইয়াছে। আরও দেখিবে যে ঐ শিশু খিট্‌খিটে, বিরক্ত, নিদ্রাশূন্য হইয়া শুকাইয়া যাইতে থাকে, চর্ম্মে স্ফোটক Eruption দেখা দেয় এবং প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব্বে উৎক্ষেপ convulsion আরম্ভ হয়। অনাহারে :—থাকিলে প্রধানতঃ প্রথমে কুক্ষিপ্রদেশে বেদনা (চাপে উপশমিত) লক্ষিত হয়; কিন্তু দুই এক দিবসের মধ্যে উহা মিলাইয়া যায় (Subsides) এবং এক প্রকার দুর্ব্বলতা ও তীব্র পিপাসা অনুভব করিতে থাকে। এখন মুখমণ্ডল মলিন, দেহ হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গমন এবং শারীরিক শক্তি সত্বর সত্বর কমিতে আরম্ভ করে। গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিকাপেক্ষা কমিয়া যায়; মানসিক শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রথমে বোকাটে ভাব, পরে ভীতভাব, এবং তাহা হইতে পরে উন্মাদের ভাব উৎপন্নও হইতে পারে। শক্তিহীনতার এই ভাব ক্রমশঃ লক্ষিত

আহারের পরিণাম

হইতে হইতে, কখন বা কন্‌ভল্‌সন্ হইয়াও প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। একেবারে খাদ্য ও পানীয় না খাইলে ৮।১০ দিনের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে; তবে যদি জলপান করিতে পারে, তাহা হইলে এই সময়ের অধিক কালও বাঁচিয়া থাকা যায়।

এইমাত্র আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, অত্যধিক, স্বল্প, অনুপযুক্ত অথবা অনাহারে থাকিলে শরীরের পক্ষে তাহা হানিজনক হইয়া থাকে; সুতরাং শরীরের ক্ষয় নিবারণ এবং তাপজনন ও সম্পূরণ জন্য যাহা প্রকৃতভাবে প্রয়োজন, তাহাই আমাদিগের উপযুক্ত এবং স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। বহুতর সুস্থদেহীর শরীর সুপরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে যে:——

নাইট্রোজেনস	১৩০	গ্রাম	বা	৪·৫	ঔন্স
ঘৃত-তৈল-চর্ব্বিময়	৮৪	„	বা	৩	
শর্করাজাতীয়	৪০৪	„	বা	১৪·২	
লাবণিক পদার্থ	৩০	„	বা	১	
	৬৪৮	গ্রাম	বা	২৩	ঔন্স

উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য একজন ম্বস্থবমত পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির, স্বাস্থ্য সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। গাভী দুগ্ধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সহিত পূর্ব্ব লিখিত পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের তুলনায় আমরা জানিতে পারি যে,উহার চর্ব্বিজাতীয় অংশমাত্র পূর্ণবয়স্কের খাদ্যপদার্থের শ্বেতসারীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে (পাতা দেখ)

বিভিন্ন প্রকার পরিশ্রমীর খাদ্য

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, সমুদয় খাদ্যপদার্থের একের পাঁচ ভাগ, নাইট্রোজিনস্ বা প্রোটিড পদার্থ

হওয়া আবশ্যক এবং মোটের উপর এই খাদ্যপদার্থ সর্ব্ব সাকুল্যে প্রায় ২৩ ঔন্স শুষ্ক অতরল খাদ্য পদার্থের সমান পরিমাণযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি ধরা যায় যে, আমাদের সাধারণ খাদ্যের সহিত, আমরা তৎনিহিত শতকরা ৫০ ভাগ জল সেবন করিয়া থাকি, তাহা হইলে শুষ্ক এই ২৩ঔন্স অতরল পদার্থ, সাধারণ খাদ্য-পদার্থের ৪৬ ঔন্সের সহিত সমান হইল। খাদ্যপদার্থের সহিত জল খাওয়া ব্যতীতও, আমরা সচরাচর ৫০।৮০ ঔন্স খাঁটি জল পৃথকভাবে খাইয়া থাকি। এইরূপ আদর্শ ব্যবস্থামত খাদ্য পদার্থের ৪০০০ ফুট টন শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থিত আদর্শ খাদ্যপদার্থের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে।

একারণ যে সকল ব্যক্তি অলসে বসিয়া জীবন কাটায়, তাহাদের উপযোগী খাদ্যপদার্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :— —

নাইট্রোজেনস্ পদার্থ	৭৭	গ্রাম	বা	২·৫	ঔন্স
ঘৃত তৈল চর্ব্বিময় „	২৮	„	বা	১	
শর্করাজাতীয় „	৩৪০	„	বা	১২	
লাবণিক পদার্থ	১৪	„	বা	·৫	
	৪৫৯			১৬.২	

এই ব্যবস্থার খাদ্য, অলস ব্যক্তির জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট বটে, কিন্তু কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে থাকিলে ইহা যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।

আবার একজন কঠিন পরিশ্রমীর পক্ষে উপযোগী খাদ্য

পদার্থ নিরূপণ করিতে হইলে, নিম্ন প্রকারের হওয়া উচিৎ বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে, যথা :—

নাইট্রোজেনস্ পদার্থ	১৪২	গ্র্যাম	বা	৫	ঔন্স
চর্ব্বি, ঘৃত তৈল "	৪৮০	"	বা	৩	"
শর্করা জাতীয় "	৬৩০	"	বা	২২·২	"

এইরূপ খাদ্য ৫·৩২ ফুট টন শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইতে পারে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত তালিকা লিখিত খাদ্য পরিমাণ খাটিবে না, কারণ শীতপ্রধানদেশের পক্ষে যে পরিমাণ দৈহিক উত্তাপের আবশ্যক, আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধানদেশে তাহা আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বোক্ত তালিকা সমুদয়ই শীতপ্রধানদেশের উপযোগী করিয়া লিখিত।

স্ত্রীলোক পুরুষের সমান কার্য্য করিলেও, তাহার আহার পুরুষের অপেক্ষা দশভাগের এক ভাগ অংশ স্বল্প হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অল্প পরিশ্রমী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, এক তৃতীয় বা এক চতুর্থ অংশ কম হইলেই ভাল হয়। ১০ বৎসর বয়সের বালিকাকে, পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের আহারের অর্দ্ধ পরিমাণ খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ১৪ বৎসরের বালক কিন্তু পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোকের সমান আহার করিয়া থাকে দেখা গিয়াছে।

আরও একটু বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বাভাবিক পরিশ্রমী মনুষ্যের সচরাচর ব্যবহৃত উপযুক্ত খাদ্যে :—

		০	না		কা	
নাইট্রোজেনস্ পদার্থ	ঔন্স	৪.৫	৩১৬	গ্রেণ	১০৬৮	গ্রেণ
চর্ব্বিময়	,,	,,	৩	,,	,, ১০২৪	,,
শর্করা জাতীয়	,,	,,	১৪.২৫	,,	,, ২৭৬৮	,,
			৩১৬		৪৮৬০	

থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন এবং ৪৮০০ গ্রেণ কার্ব্বণ (২০ গ্র্যাম নাইট্রোজেন এবং ৩২০ গ্র্যাম কার্ব্বণ) মোটের উপর আমাদের প্রয়োজন জানা যাইতেছে। ইহাদের অনুপাত ১:১৫।

কোন একটি খাদ্যপদার্থ হইতেই আমরা এই অনুপাত অনুযায়ী দেহস্থ নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি না; যে কোন পদার্থই ধরা যাউক না কেন, বিশ্লেষণ analyse করিলেই দেখা যাইবে যে, হয় নাইট্রোজেন অধিক হইতেছে, না হয় কার্ব্বণ অধিক হইতেছে। সুতরাং এমন কয়েকটি পদার্থ আহার করা প্রয়োজন, যাহাদের বিশ্লেষণ সমষ্টি একত্র করিলে, পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক আবশ্যকীয় পদার্থ (যাহা শরীর হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া যাইতেছে) সংগ্রহ হইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, মিশ্র খাদ্যপদার্থই শরীর সংরক্ষণ পক্ষে একান্ত উপযোগী। খাদ্যপদার্থের উপাদান আধিক্যে যাহা পরিণাম হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন এই মিশ্র খাদ্যপদার্থ কি ভাবের

মিশ্র খাদ্য পদার্থই আবশ্যক

এক ঔন্স—পাকি আধ ছটাক।

হইতে পারে তাহাই আলোচনার বিষয়। ইউরোপীয় প্রথানুযায়ী ১সের রুটি এবং ।॥ পোয়া মাংস খাইলেই, পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পরিপূরণ হইতে পারে, কিন্তু উহার সহিত যদি ১ বা ২ ঔন্স মাখন থাকে, তবে ত আর কথাই নাই!

প্রধান খাদ্য।

	কা	না
অর্দ্ধ সের রুটী	১১০	৫.৫
১ পোয়া মাংস	৩৪	৭.৫
অর্দ্ধপোয়া ঘৃত বা তৈল	৮৪	

আনুসঙ্গিক।

	কা	না
অর্দ্ধ সের আলু	৪৫	১.৩
অর্দ্ধ পাইণ্ট দুগ্ধ	২০	১.৭
অর্দ্ধ পোয়া ডিম্ব	১৫	২
১ ছটাক পনীর	২০	৩
	৩৩৫	২১

কিন্তু ইউরোপীয় প্রথার খাদ্য আমাদের দেশের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে; অবশ্য আমরা পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সহজেই উহা আমাদের উপযোগী করিয়া লইতে পারি! স্বচ্ছলাবস্থার লোকের পক্ষে ঐ হিসাব মত আহারও চলিতে পারে, তবে মাংসের স্থানে নিত্য ব্যবহার জন্য মৎস্য এবং ডিম্বের পরিবর্ত্তে ছানাজাতীয় অন্য কোন পদার্থ বসাইয়া লইলেই ভাল হয়। মাংস এবং ডিম্ব উষ্ণপ্রধানদেশে লোকের প্রত্যহ আহার করা উচিত নহে। মাংসে ছানাজাতীয় পদার্থ

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যমান থাকায় উহা যে, আমাদের শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু উপকারীতার সহিত যদি অপকারীতাও বর্ত্তমান দেখা যায়, তবে মাংসাহার তাহা বর্জ্জন করিয়া, যাহাতে বিশুদ্ধ উপকারীতা আছে, তাহা ব্যবহার করাই সমীচীন নহে কি?

কোন প্রকার রাসায়নিক অনুপাতের প্রতি না তাকাইয়া, আমাদের মতে নিম্ন প্রকারের আহারই এই দেশীয়ের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা :—

দিবসে।

ভাত·····························১ বা দেড় পোয়া চাউলের।
(ডাইল, মাছের ঝোল, ভাজা ও ২।৪টি ব্যঞ্জন পদার্থ যথোপযুক্ত পরিমাণে)।
দুগ্ধ···আধ সের।

রাত্রিতে।

রুটি, লুচি বা পরোটা······১ বা দেড় পোয়া আটা বা ময়দার।
(ডাইল, বা মাছের ঝোল, ভাজা ও ১।২ টি ব্যঞ্জন পদার্থ) দিবাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে)।
দুগ্ধ···আধ সের।

দুই বেলাই ব্যঞ্জন বা তরকারীতে আলু যেন দেওয়া থাকে, সময়ে সময়ে উহা সিদ্ধ বা ভাতে দিয়াও খাওয়া কর্ত্তব্য। কলা কাঁচা বা পাকা, যাহাই হউক প্রত্যহ বা ২।১ দিন অন্তর সেবন করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে রুটি বা লুচির বদলে অনেকে ভাতই

খাইয়া থাকেন। আহার অনেকটা অভ্যাসগত জানিবে, যেমনটি অভ্যাস করিবে, তাহাই চালাইতে হইবে, নতুবা নূতন দ্রব্য ব্যবহার করিতে যাইলেই অসুখ হইবার সম্ভাবনা। একই জিনিষ প্রত্যহ না খাইয়া, ডাইল, মৎস্য বা তরী তরকারী, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা করিলেই, আর অনবরত একই জিনিষ সেবনে অরুচি জন্মাইবার ভয় থাকিবে না। রাত্রিতে ভাত না খাইয়া, রুটি বা লুচির ব্যবস্থা অনেকে এই একঘয়েমি নাশ জন্যও করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহাকেও বা বাধ্য হইয়াই ইহা করিতে হয়, কারণ ভাতে জলীয়াংশ অধিক থাকায়, রাত্রিতে অনেকের পক্ষে উহা সহ্য হয় না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক রুটি বা লুচি আহার করিতে বাধ্য হন।

এদেশের উপযোগী আহার কি?

আমরা উপরে যেরূপ ব্যবস্থার কথা লিখিলাম তাহা স্বচ্ছল অবস্থারই উপযোগী, কিন্তু যাহাদের উহা জুটাইবার সঙ্গতি নাই, তাহাদের পক্ষে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত? আমরা প্রতিনিয়তই চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই যে, দরিদ্র গৃহস্থ এবং মুটেমজুর, কৃষক প্রভৃতির আহার কেবলমাত্র ভাত ও ডাইল—তরী তরকারী না হইলেও চলে, মৎস্য, ঘৃত বা দুগ্ধের কথা ত ধর্ত্তব্যই নহে! কিন্তু তথাপি উহাদের শরীর, সামর্থ রক্ষণোপযোগী শক্তি আহরণ করে কোথা হইতে? পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ডাইলে নাইট্রোজেনস্ পদার্থ, মাংস অপেক্ষাও অধিক আছে, কিন্তু চর্ব্বিময় পদার্থ স্বল্পতর থাকা নিবন্ধন উহাতে ঘৃত বা তৈল যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যথেষ্টভাবে

ডাইলের ব্যবহারই মাঁছ, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় পদার্থের অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

অজীর্ণরোগীর পক্ষে কিন্তু ডাইলের ব্যবহার স্বল্পভাবেই হওয়া কর্ত্তব্য; একারণ দরিদ্রের অজীর্ণরোগ দেখা যাইলে বড়ই গোলের কথা! কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ পীড়া ধনী বা অভাবপক্ষে মধ্যবিত্তের গৃহে ভিন্ন দেখা যায় না!!

জীবনের অবস্থাভেদেও আহারের তারতম্য হওয়া উচিত, কারণ যে সময়ে যাহা অধিক আবশ্যক, তাহাই পরিপূরণ করিবার নিমিত্ত, সেই জাতীয় আহার করাই ব্যবস্থা জানিবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, শিশুগণকে বর্দ্ধণের সময় খনিজ অর্থাৎ লবণজাতীয় খাদ্যই অধিক দেওয়া প্রয়োজন এবং দন্ত নির্গমনের পূর্ব্বে তাহাকে কোন শ্বেতসারীয় খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এখন দেখা যাউক পরবর্ত্তি অবস্থাভেদে আহারের ব্যবস্থা কি প্রকারের করা কর্ত্তব্য। ৯ বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাকে দুগ্ধ ও শ্বেতসারীয় পদার্থই অধিক দিবে; কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত, ছাত্রজীবনে শরীরের বর্দ্ধণ এবং পরিপোষণ ক্রিয়া দ্রুত সাধিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং এই সময়ে তন্তু নির্ম্মাপক (tissue building) খাদ্যই অধিক প্রয়োজনীয়। মধ্য যৌবন হইতে প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত নিত্য সচেষ্ট (active) কার্য্য করিবার সময়, শক্তি energy উৎপাদক খাদ্যই প্রধাণভাবে প্রয়োজন, সুতরাং মাখন-জাতীয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য এইকালে যথেষ্ট পরিমাণে আহার

বয়সভেদে
আহারের তারতম্য।

করা কর্ত্তব্য কারণ (ইহা প্রধাণতঃ শক্তিই উৎপাদন করে)।
বার্দ্ধক্য অর্থাৎ জীবনের শেষাবস্থায়, যখন সমুদয় সচেষ্টভাব লোপ পাইতে থাকে, তখন অনুত্তেজনীয় non-stimulating শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্যই প্রধাণভাবে আহার করা কর্ত্তব্য।

বয়সভেদে আহারের তারতম্য যে প্রকারের হওয়া উচিত এখানে তাহাই বলা হইল মাত্র। ইহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে একমাত্র উহাই কেবল আহার করিতে হইবে এবং অন্য কিছু আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

মনুষ্যের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে, শুষ্ক বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা, স্থূলদণ্ডে নির্ণীত খাদ্যবিচার করিলেই চলিবে না—দেশকাল, বংশ, পাত্র প্রভৃতির বিষয়ও আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং ইতর জীবজন্তুর ন্যায় কেবলমাত্র শরীরপোষণ এবং শক্তি ও তাপ উৎপাদক যে কোন খাদ্যই হউক না কেন, মনুষ্যের জন্য ব্যবস্থা করিলে ত চলিবেনা? "রুচি" বলিয়া মনুষ্যের নিজস্ব একটা জিনিষ আছে এবং তাহার জন্যই অন্যান্য জীবজন্তু অপেক্ষা মনুষ্য জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদিগের খাদ্য বিচারের সময়, এই রুচি জিনিষটা বাদ দেওয়া

রুচিভেদে আহার

যাইতে পারে না, সুতরাং খাদ্যে কতটা নাইট্রোজেন আছে জানিতে পারিলেই যে চরম সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। "আপ রুচি খানা" বলিয়া আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিত আছে, বোধ

হয় সকলেই জানেন, সুতরাং কেহ কাহারও জন্য কোন খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারেন না। কারণ হয়ত তাহা যাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার রুচিকর নহে, কাজেই গণ্ডির মধ্যে খাদ্যবিচারের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। ব্যবস্থাপক এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন যে, আমাদের শরীরপোষণ ও সংরক্ষণের জন্য এই এই দ্রব্য আহার করা প্রয়োজন এবং সম্ভবমতঃ একটী তালিকা প্রস্তত করিয়াও দিতে পারেন (অধিকাংশ স্থলে তাহাও নিজ রুচি অনুযায়ীক হইয়াই পড়ে)। যদি উহা কাহারও রুচি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিয়া, নিজেই তিনি সেই সেই জাতীয় খাদ্য উপাদানবিশিষ্ট নিজের মনোমত খাদ্য ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন।

শরীরের ক্ষয় নিবারণ, তাপজনন, শক্তি সংরক্ষণ এবং সম্পূষণের জন্যই যে আহারের প্রধাণ আবশ্যকতা এবং তাহার পরিমাণ কি হওয়া উচিত তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। ২৪ ঘণ্টায় পূর্ণদেহীর শরীর হইতে
যে পরিমাণ পদার্থ নির্গত হইয়া যায় শরীরের আয় ব্যয়
তাহাও দেখান হইয়াছে ; সুতরাং মোটা-
মুটি হিসাবে, আয ও ব্যয় হইতে আমরা প্রকৃত লাভবান কি ভাবে হইয়া থাকি; তাহা উপসংহারে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সুপরীক্ষায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশান্তে, শরীরের ওজন প্রায় সমভাবে থাকিতে দেখা যাইলেও, প্রকৃত পক্ষে ভিতরে আমরা লাভ-

বান হইয়াই থাকি। নিম্নলিখিত হিসাবটি দেখিলেই উহা সহজে সকলের উপলব্ধি হইতে পারিবে।

আয়			ব্যয়		
(খাদ্য পদার্থ ইত্যাদি হইতে)			(মল, মূত্র ও বাহ্যনিঃসৃত পদার্থ দ্বারা)		
নাইট্রোজেন	২০	গ্রাম	নাইট্রোজেন	২০	গ্রাম
কার্ব্বণ	৩১৫	"	কার্ব্বণ	২৭৪	"
জল	২০০০	"	জল	২০০০	"
লাবনিক পদার্থ	২৪	"	লাবণিকপদার্থ	"	২৪০
অক্সিজেন	৭০৯	"	অক্‌সিজেন	"	৫৮২
	৩০৬৮			২৯০০	

৩০৬৮—২৯০০=১৬৮ গ্রাম পরিমাণ দ্রব্য শরীরে থাকিয়া যায়।

এই ১৬৮ গ্রাম পদার্থ—যাহা ২৪ ঘণ্টার হিসাব নিকাশান্তে শরীরে রহিয়া যায়—দ্বারাই প্রত্যহ আমাদের, শরীর সম্পুষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। আয়ব্যয়ের হিসাব সমানভাবে থাকিয়া যাইলে, এই সম্পুষ্টির আশা মোটেই থাকিত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমিষ ও নিরামিষ-আহার !

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আহারকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, যথা, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে দ্রব্য ভোজন করিলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা সাত্বিক, যাহা ভোজন করিলে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা রাজসিক এবং যাহা ভক্ষণ করিলে তমোগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা তামসিক আহার বলিয়া পরিগণিত। আমিষ আহার তামসিক আহারের মধ্যেই গণ্য; এই আহারে অভ্যস্ত হইলে, লোকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্যক সাধিত হয় না এবং পাশবিক প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়।
এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ মোক্ষকামী নিরামিষ পক্ষের মত
ব্যক্তি মাত্রকেই রাজসিক ও তামসিক
আহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এবং সুধীবর্গও আজকাল সাত্বিক আহারের উপকারিতা ও তামসিক আহারের অপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন দেখা যাইতেছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক ব্যক্তি, আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ডাক্তার এব্রামোউস্কি (Dr. O. L. M. Abramowski M.D Ph.D. M. O.H.) বলেন যে,

মানুষ কেবল সুপক্ক শুষ্ক ফল মূল খাইয়াই সুস্থ ও সবল দেহ ধারণ করিতে পারে। অগ্নিতে অন্নপাক করিয়া খাইলে, অন্নের অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য বিনষ্ট হয়, (পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, ধান ভানিবার husking সময় চাউলের পুষ্টিকর পদার্থ এক অষ্টমাংশ নষ্ট হয়; তার পর মাজাই করিবার polishing সময় উহার বাহ্য আবরণ—যাহাতে প্রধাণতঃ প্রোটিড্ পদার্থ থাকে—সহ এক চতুর্থ পুষ্টিকর অংশ আমরা ফেলিয়া দেই; সর্ব্বশেষে সিদ্ধ করিয়া ভাতের ফেণ ফেলিয়া দেও য়ায়, আরও এক অষ্টমাংশ পুষ্টিকর পদার্থ আমরা পরিবর্জ্জন করিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোটের উপর প্রত্যহ আমরা চাউলের অর্দ্ধ ভাগ পুষ্টিকর পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিয়া থাকি।) এই জন্য শুধু ভাত খাইলে, আমাদের শরীর পোষণ হইতে পারে না—কাজেই উহার সহিত নাইট্রোজেনস্ পদার্থ সম্বলিত খাদ্য ভোজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া যে, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদিই একান্ত আবশ্যক তাহা নহে! মৎস্য মাংস না খাইয়াও, লোকে পরিপোষণ ও দীর্ঘজীবন লাভ করে, অনাময় হয় এবং বহু কঠিন রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, বলিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ওল্ডফিল্ড (Dr. Joshua Oldfield D. C. L. M. A. M. R. C. S. L. R. C. P.) মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ স্থানের আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিড্নী বিয়ার্ড (Sidny. H. Beard) বলেন যে, মৎস্য, মাংস, খাইলে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ বিলম্বে সাধিত

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত

হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মলিন হয় এবং প্রকৃতি নির্দ্দয় হইয়া উঠে।

আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহার বিপরীতে মত প্রকাশ করিয়া, কোন কোন পণ্ডিত নিরামিষ আহারকে শরীর ধ্বংশের এক প্রকার কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, নিরামিষভোজীরা মানবদেহের যন্ত্রগত (organic) রোগ সমূহকে তত্টা প্রতিরোধ করিতে পারে না, কারণ দৈহিক বীর্য্য ও মানসিক সুচেষ্টতার জন্য যতটা রক্তোৎপাদক দ্রব্য (protied substance) আবশ্যক ততটা তাহারা আত্মসাৎ করিতে পারে না।
এই প্রকারের মতানুসরণকারী কলিকাতা আমিষ পক্ষের মত মেডিকাল কলেজের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক (Dr Mc. Cay ডাঃ ম্যাক্ কে, সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনেক গুলি পরীক্ষিত তথ্য হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাহারা কেবল ভাত খায়, সেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা—ইউরোপের যে সকল দেশ শারীরিক হিসাবে হীনাবস্থ, সেই সকল দেশের অধিবাসী অপেক্ষাও—শারীরিক হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট। জীবনবীমা কোম্পানীদিগের তথ্য তালিকা হইতেও প্রমাণ হয় যে, যাহারা অন্যান্য খাদ্যের সহিত মাংসাহার করে, সেই প্রবাসী ইংরাজদিগের অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের খাস অধিবাসীরা সত্বর মারা যায়। তাহাদের অর্থাৎ অন্নভোজীদিগের, শরীরে রক্তের অভাব হয় এবং তাহারা প্রায়ই মূত্রগ্রন্থী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। দেহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রক্তোৎপাদক শক্তি না থাকায়,

দৈহিক সূত্রগুলির টিকিয়া থাকিবার পর্য্যাপ্ত শক্তি থাকে না। সেই কারণে ইংলণ্ড অপেক্ষা বঙ্গদেশে, লোকে বহুমুত্র, নিউ-মোনিয়া, ফুসফুস্ ব্রণ, নালী ঘা প্রভৃতি রোগের কবলে পতিত হয়। এই সব কারণে Dr. Mc. Cay. নিরামিষ ভোজনের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি নিরামিষ আহারে শরীরে রক্তের অভাব হয়, সুতরাং জীবনীশক্তিরও হ্রাস হয় এবং ঐরূপ শরীরে জীবানুরা (microbe) বংশবৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়।

আমাদেরই দেশীয় কৃতবিদ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম্, এ, এম্, ডি, মহাশয়ও "ছাত্রজীবনের আহার" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "জান্তব খাদ্য এক প্রকার প্রোটিড্ পুষ্টিকর পদার্থের সারবিশেষ; ইহা অতি সহজে পরিপাক পায় এবং শরীরে মিলিত হইয়া পড়ে; কিন্তু মূল্যের আধিক্য ও বৃথা বধ করার অপ্রবৃত্তি জন্যই, ইহা খাইতে লোকে আপত্য করিয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। Spencer সাহেব তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকেও এই বিষয় প্রসিদ্ধ মতাবলম্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; অপিচ ডাঃ সাদার-ল্যাণ্ড (Sutherland) তাঁহার 'পথ্য বিষয়ক' পুস্তকে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বর্দ্ধণ সময়ে যে, মাংসাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ দেখা যায় না; কিন্তু জীবনের ধ্বংশমুখীন সময়ে উহার ব্যবহার কম বা লোপ করান কর্ত্তব্য। পুরুষানুক্রমিক রীতিমত

প্রোটিড্ পদার্থ অনাহারে, আমাদের দেশীয় ছাত্রগণের জীবন ক্রমশঃই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং তাহাদিগের নিত্য আহারের মধ্যে কোন প্রকার জান্তব মাংস থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রোটিড্ পদার্থের অভাববিশিষ্ট আমাদের ডাল-ভাত ইত্যাদি ভারী খাদ্য জিনিষ ভোজনের জন্যই আমাদিগের দেশীয় ব্যক্তিগণ সাংসারিক জীবনে নিশ্চেষ্ট ও স্ব স্ব জীবনের উন্নতি সাধনে বিরত হইয়া পড়িয়াছেন !!"

মাংসে নাইট্রোজেনস্ পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় এবং ফল ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যে নাইট্রোজনের ভাগ অতি সামান্য মাত্রায় থাকায় আজকাল, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহার নিত্য ব্যবহার শরীর বর্দ্ধণ ও পোষণের জন্য একান্ত আবশ্যক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Yale University) অধ্যাপক চিটেন্ডেন্ (Chittenden) সাহেব বলেন যে, "যাহারা মাংসাহার করে, তাহারা প্রায়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত নাইট্রোজেনস্ খাদ্য ভোজন করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং উহা শরীর পোষণের সহায়তা না করিয়া অসুস্থতা এবং রোগের সৃষ্টির কারণ হইয়া পড়ে।" তিনি আরও বলেন যে, অতিরিক্ত মাংসাহার ও নাইট্রোজেনস খাদ্যাহার জন্য, শরীরে fermentation অর্থাৎ গাঁজলান ভাব সত্বর আরম্ভ হয়, এবং উহা খাদ্য পরিপাক ও শরীর পোষণের সাহায্য না করিয়া, খাদ্যপদার্থকে বিকৃত করিয়া দেয়। সুতরাং পরিপাকের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার পচনক্রিয়া অন্ত্রমধ্যে আরম্ভ হইতে দেখা যায়। অন্ত্রমধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র

কীটাণু (germs) এবং মাংসাদি আহার্য্য পদার্থ সহ, শরীরাভ্যন্তরে নীত কীটাণুগণের কার্য্য বাহুল্য হেতুই ঐ fermentation ক্রিয়া আরম্ভ হয় জানিতে পারা গিয়াছে। ডাঃ অস্‌লার (Osler) বলেন যে এই fermentation ক্রিয়া মনুষ্যদেহের পক্ষে বিশেষ হানিজনক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, (plague) প্লেগ বহু শতাব্দী যাবৎ চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য জাতীর মধ্যেই অধিকভাবে হইতে দেখা যাইতেছে। এই সমুদয় জাতি বিশেষ প্রকারে অন্নভোজী ; মাংসের দুর্ম্মূল্যতা এবং কতক বা ধর্ম্মবিশ্বাস জন্যও, অতি স্বল্পমাত্রায় উহারা ইহা আহার করিয়া থাকে, সুতরাং মাংসাহার না করাই যে, উহাদের মধ্যে প্লেগ্ আক্রমণের আধিক্যের বিশেষ কারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁরা বলেন যে, মাংস আহার করিলে শরীরে রোগপ্রবণতা বাধা প্রাপ্ত হয়, কাজেই প্লেগ্ অথবা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধি আসিয়া দেহ আক্রমণ করিতে পারে না! আমেরিকা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ নিয়োজিত ডাঃ ব্লু (Blue) সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যে, প্লেগের আক্রমণ সম্বন্ধে তথ্য নিরূপণ কালে,কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের অনুমিতির ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন! তিনি বলেন যে, মাংসাহার এ রোগের প্রতিবন্ধক নহে!! অধিকন্তু ডাঃ কেলগ (Dr. Kellog) বলেন যে, প্লেগ বস্তুতঃ মাংসহারীগণেরই পীড়া ; কারণ ইন্দুর মাংসাহারী. সর্ব্বপ্রথমে এই রোগে সেই আক্রান্ত হয় ; তার পর flea

মাংসাহারের দোষ

(এক প্রকার মাছি) মাংসাহারী না হইলেও রক্তশোষক ; ইন্দুর হইতে পীড়া ইহার নিজ শরীরে সংক্রামিত করিয়া,মনুষ্যদেহে বহন করিয়া দেয়। যাহারা মাংস আহার না করে, তাহারা এ রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না, বটে, কিন্তু যাহারা মাংসাহারী তাহারাই যে সহজে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উঠে,তাহার প্রমাণ বহু দেখাইতে পারা যায়। ইহার কারণ এই যে, মাংসভোজী অপেক্ষা নিরামিষভোজীরা ক্লান্তি দমনে বিশেষ পটু বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং রোগপ্রবণতার প্রতিবিধানে নিরামিষভোজীরাই যে অপেক্ষাকৃত সমর্থবান ইহা জানা যাইতেছে।

এ বিষয়ে আরও বিশেষ প্রমাণ দেখাইবার জন্য আমরা Popular Science shifting পত্রে A. wagner সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—আমেরিকাবাসীরা দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বল ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে মাংসভোজী অপেক্ষা উদ্ভিজ্জভোজীরাই শ্রেষ্ঠ ; বীরত্ব, সাহস বা ক্লেশসহিষ্ণুতা ও দীর্ঘজীবন লাভ, কোনটিই মাংসভোজীর একচেটীয়া monopoly নহে, উপরন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমের জন্য শর্করাজাতীয় খাদ্য, মাংস বা প্রোটিড্ জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সৈন্যগণের বহুদূর গতির long-march সময় পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যাহারা শর্করাজাতীয় খাদ্য ভোজন করে, তাহারাই অক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারে ; মাংসভোজীরা

২।৪ জন্য ব্যতীত কেহই তেমন পারে না। মস্তপায়ীর ত কথাই নাই!

ব্যবহারঘটিত প্রত্যক্ষ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অপেক্ষা কি শারীরতত্ত্বঘটিত কতকগুলি কারণের গুরুত্ব অধিক প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? সভ্যজগতের সমস্ত নিরামিষভোজীর অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসেই Dr. Mc. Cay প্রভৃতি মাংসভোজন পক্ষপাতীগণের বিষম ভ্রম উপলব্ধি হইবে। নিরামিষভোজীদিগের শরীর রোগপ্রবণ হওয়া দূরে থাক্, আমিষভোজীদিগের অপেক্ষা তাহারা অধিক রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসুখ অধিক মাত্রায় উপভোগ করিয়া থাকে। ভারত, জাপান, চীন, তুর্ক প্রভৃতি দেশের নিরামিষাশী শ্রমজীবিগণের দৈহিক উপযোগীতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই ইহার সত্যাসত্য সহজেই অবগত হইতে পারা যাইবে।

আমিষ ও নিরামিষের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া দিয়া একবার ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে, প্রকৃতি মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি প্রকার স্থির করিয়া দিয়াছেন? মেট্‌চিনকফ, ফষ্টার, গটিয়ার Gautier চিটেন্‌ডেন্, ক্লেচার প্রভৃতি মনীষিগণ জগতের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, খাদ্য সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, (১) বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যের প্রকৃতি নির্দ্দেশিত আহার্য্য কি? (২) কোন্ আহার্য্য পদার্থ মনুষ্যের পরিপাক যন্ত্রের বিশেষ উপযোগী হইয়া, তাহার শারীরিক অভাব পরিপূরণ করিতে সমর্থ হইবে? (৩) কি

দ্রব্য আহার করিলে, তাহার অধিকাংশ সারভাগে পরিণত হইয়া, স্বল্প অসাড়রূপে বহির্নির্গত হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের নিরূপণ লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত, সুতরাং আমিষ-নিরামিষ লইয়া বিবাদে তাঁহারা রাজী নহেন!! আহার্য্য পদার্থ যাহাই কেন হউক না, কোন প্রকারে শরীরের অনিষ্ট সাধন না করিয়া, উহার পুষ্টি-সাধন কার্য্য সমাধা করিলেই যথেষ্ট।

মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্যাহার

এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না; সুতরাং যাহাতে রোগের উৎপত্তির সম্ভাবনা এমন খাদ্য অবশ্যই বর্জ্জনীয়! মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার্য্য পদার্থ যে কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, উহা দুই ভাবে করা যাইতে পারে, যথা।—(১) অন্যান্য জন্তুর সহিত তুলনায় কোন্ জাতীর সহিত ইহার অধিক সাদৃশ্য তাহা দেখিতে হইবে (২) নানাপ্রকার খাদ্যপদার্থের গুণাগুণ তুলনায় কোন্‌টি বিশেষ উপযোগী তাহা স্থির করিতে হইবে। খাদ্যপদার্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জন্তু সমুদয়কে ৪ শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়, যেমন, (১) হার্ব্বিভোরা Herbivora অর্থাৎ যাহারা ঘাস পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে—গরু, ছাগল ইত্যাদি প্রকৃত উদ্ভিদ্‌ভোজী জীব। (২) কার্ণিভোরা Carnivora অর্থাৎ মাংসাশী—যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। (৩) অম্‌নিভোরা Omnivora অর্থাৎ মিশ্র (আমিষ ও নিরামিষ) পদার্থ ভোজী—যেমন শূকর ইত্যাদি (৪) ফ্রুগিভোরা Frogivora অর্থাৎ যাহারা ফল, মূল, শস্যাদি খাইয়া প্রাণধারণ করে—যেমন

সিম্পানীজ, বানর, আউরাংউটাং ইত্যাদি। এই চারি শ্রেণীর জীবের পরিপাকযন্ত্রীয় গঠনপ্রনালী বিশেষরূপে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের শরীরবিধানের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা শেষোক্ত প্রকারের সহিত বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত এবং অপর তিন প্রকারের সহিত বিভিন্ন। ফল এবং শস্যভোজী জীবের দন্তগঠন, উহার সাজান প্রণালী এবং দন্তের এনামেল্ (enamel) মনুষ্যের দন্তের সহিত একই প্রকারের; কিন্তু অন্য তিন প্রকারের জীবের সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না।

পরিপাকযন্ত্রীয় নলের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলেও দেখা যায় যে, কার্নিভোরায় উহা শরীরের দৈর্ঘ্যানুযায়ী ৩০ গুণ বৃহৎ (নাসিকার অগ্রভাগ হইতে মেরুদণ্ডের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত পরিমাপে), কার্নিভোরায় ৩ গুণ, অম্নিভোরায় ১৯ গুণ এবং ফ্রুগিভোরায় ১২ গুণ বৃহৎ দেখা যায়। মনুষ্যের পাকপথের নল পরিমাপেও দেখা গিয়াছে যে, উহা শরীর অপেক্ষা ১২ গুণ লম্বায় অধিক; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি মনুষ্যকে ফল ও শস্যভোজী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীর মধ্যে মাংস অতি সত্বরে বিকৃত হইয়া যায় বলিয়াই, প্রকৃতি মাংসভোজীগণের পাকপথের নল দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর করিয়া রাখিয়াছেন; কারণ যত সত্বর উহা শরীরবিধান হইতে বহির্গত করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। মনুষ্যের পাকপথের নল যে দেহ অপেক্ষা ১২ গুণ লম্বা, ইহা দেখিয়াই মনুষ্য যে প্রকৃতই মাংসভোজী নহে তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। মাংস

অন্ননলীর দৈর্ঘ্য সমালোচনা।

ভোজী অন্যান্য প্রাণীগণের শরীরে যে, নানাপ্রকার রোগের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণও এই জানিবে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক সময় শরীরবিধান মধ্যে মাংস থাকিতে বাধ্য হইয়া, সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য মাংস নহে এবং ফল মূল, শস্য, শাক-সব্‌জী ইত্যাদিই তাহার প্রকৃতি নির্দ্দেশিত খাদ্য। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য দুগ্ধ; প্রকৃতি শিশুর জন্য এই খাদ্য নিরূপণ করিয়াই, তাহার পাকপথের যন্ত্রাদি তদবস্থায়, সেই প্রকারের উপযোগী। করিয়া রাখেন। কিন্তু উহা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য নহে (ইহার কারণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ২১৮ পাতা দেখ)। ভাল খাঁটি দুগ্ধ প্রকৃতই উপকারী খাদ্য; ইহার গুণের সহিত মৃত জন্তু আদির বিকৃতভাবাপন্ন মাংসের কোন তুলনাই হয় না। মনুষ্যের খাদ্যাদি জন্য স্থিরীকৃত পদার্থাদি, যেমন ময়দা, ডাইল, চাউল, ফল মূল, ইত্যাদি হইতেছে শক্তি-সঞ্চয়কারী (energy storing) organism কিন্তু অন্যদিকে মাংস হইতেছে শক্তি-ক্ষয়কারী (energy-consuming) organism।

শক্তির এই consumption ক্ষয় (যাহা শরীরের অক্‌সিডেসনের oxidation ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে) সহিত এক প্রকার ছাই (ash) অথবা নষ্টীভূত (waste) পদার্থ গঠিত হইয়া থাকে; মাংসে ইহা (এই নষ্টীভূত পদার্থ)

Saturated বিগলিত অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে মনুষ্য এই পদার্থ ভোজন করিলে, উহা জীবন-যন্ত্রীয় (vital-machinary) কার্য্যে, বাধা প্রদান করিয়া, দেহস্থ ক্রিয়া সকল বিপর্য্যস্থ করিয়া দেয় ; ইহার ফলে গাউট (Gout), বাত, কিড্নী এবং হৃদ্রোগ সমুদয়, সংন্যাস ও অন্যান্য আরও নানাপ্রকার স্নায়বীয় গোলযোগ সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

মাংস রোগের উৎপত্তি কারণ কেন ?

প্রকৃতি নির্দ্দেশিত খাদ্যই আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সুস্থতা রক্ষা করিয়া, উপযুক্তভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে সম্পূর্ণ সক্ষম। পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের সমুদয় প্রাচীন জাতিই, স্ব স্ব সমুন্নতি সময়ে, নিরামিষাশী ছিলেন ; পরে যেমন বিলাসিতা, ধনশালীতা এবং আলস্যতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাহারা আপনাদের সাদাসিধে জীবন পরিত্যাগ করিয়া, মাংসাহার আরম্ভ করেন এবং তাহাতেই তাহাদিগের পূর্ব্বকালীন শারীরিক ও জাতীয় জীবনের হ্রাস হইতে লাগিল। অধুণা যে সমুদয় জাতি অত্যধিক মাংসভক্ষক, তাহারাই যে বিশেষ লক্ষিত রূপে শারীরিক অধঃপতন দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আমাদিগের এই কথার প্রমাণ স্বরূপ ইংলণ্ডের ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কমিটির রিপোর্ট, আমেরিকার শত-ব্যক্তির কমিটির রিপোর্ট এবং ফ্রান্স, জর্ম্মানি প্রভৃতি স্থানেরও ঐ প্রকার কমিটির রিপোর্ট আমরা সকলকে পাঠ করিতে

প্রাচীন জাতির সাক্ষ্য

অনুরোধ করি। সাদাসিধে স্বাভাবিক খাদ্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার আবশ্যক করে না, কারণ বিজ্ঞান এবং আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞানই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদা ঘোষণা করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন প্রকার বাদানুবাদের মধ্যে না যাইয়া, নিয়ত চক্ষের উপর যাহা দেখিতে পাইতেছি তাহাতে মাংসাহারের বিপক্ষেই মত ও প্রবৃত্তি যাওয়ার কথা। একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাজারে বিক্রীত কসাইখানার মাংস প্রায়ই সুস্থ জন্তুর পাওয়া যায় না; এবং আপাততঃ দেখিতে ঐ মাংস সুস্থ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা দোষশূন্য কি দোষযুক্ত তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই বলিলেও চলে। রোগদুষ্ট, বিষদুষ্ট, মৃত অথবা কৃশ জন্তুর মাংস আহারই যে, নানাপ্রকার দুসাধ্য ও ক্লেশদায়ক রোগের উৎপাত্ত কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের মত সমুদয় সভ্যজগতের স্বাস্থ্য পরীক্ষক মহোদয়েরা বৎসর বৎসর কাশিত রিপোর্টেও ইহার সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন দেখিতে পাইবে। কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত মাংসবিক্রেতারাও আবার, সুবিধা পাইলেই অপরাপর জন্তুর মাংস মিশাইয়া ব্যবসায়ে লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে দেখা গিয়াছে। দেশকাল পাত্রভেদে মনুষ্য যে সকল-প্রাণীর মাংসই তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের লোকের সহিত আমাদের এ প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা আমাদের

দেশীয়গণের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যেই যাহা বলা প্রয়োজন মনে করি তাহাই বলিতে চাহি।

আমিষ ও নিরামিষের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া বৃথা গ্রন্থ কলেবর আর বর্দ্ধিত করিতে চাহি না; তুলনায় যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে আমরা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না যে, নিরামিষ আহারে শরীরে বলসঞ্চয় হয় না বা মেধাশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। মাংসাহারে যে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহ রুক্ষ এবং উত্তেজিত হইয়া থাকে ইহার প্রমাণ হিন্দুর মধ্যেই শাক্ত ও বৈষ্ণবে বেশ লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবগণ প্রকৃতিতে নিরীহ বলিয়া যে, মানসিক বৃত্তি সমূহে শাক্ত অপেক্ষা অপকৃষ্ট তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের কথা অথবা তৎ-সাময়িক হরিভক্তিপরায়ণ মহানুভবগণের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলেও, আধুনিক সময়ের প্রভুপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মৃত বা জীবিত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণকে মানসিক বৃত্তিতে কাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিতে পারা যায়? মাংসভোজনে প্রকৃতির কর্কশতা উৎপন্ন হয় একথা যদি কেহ যুক্তি ও প্রত্যক্ষ দর্শন সত্ত্বেও মানিয়া লইতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য, আমরা ঐ সত্য বাক্যকে ভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করিতেও পারি,—যেমন কর্কশ ও রুক্ষ প্রকৃতির লোকই মাংসাদি ভোজনের উপযোগী! সকল মনুষ্যের প্রকৃতি কখনই এক প্রকারের হইতে পারে না, তাই বোধ হয় শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতাকেই লক্ষ্য করিয়া, হিন্দুসমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তভেদে, আমিষ আহারের

ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দু ব্যবস্থাকারক শুদ্ধমাত্র মাংস ভোজনের ব্যবস্থা মনুষ্য প্রকৃতি দেখিয়া করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই! পাছে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকার, রোগদুষ্ট, বিষদুষ্ট, কৃশ অথবা অভোজ্য বা অস্পৃশ্য জন্তুর মাংস লোকে খাইতে আরম্ভ করে, তাই বিধি করিয়া দিয়াছেন যে, "বৃথা মাংস" আহার না করিয়া, দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া তবে উহা আহার করিতে পার। দেবতার নিকট বলি দিতে হইলেই, উহা সবল, বলিষ্ঠ এবং নীরোগ দেখিয়া দিতে হইবে। পাটা, হরিণ এবং ভেড়া ব্যতীত অন্য জন্তুর মাংস হিন্দুর চারিবর্ণের কেহই স্পর্শও করে না দেখিতে পাইবে, সুতরাং যাহা তাহার মাংস হিন্দুর শাক্তগণও, জগতের অন্যান্য জাতির ন্যায় অবাধে ভোজন করেন না দেখিতে পাইবে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থিত "যজ্ঞার্থে পাশবো সৃষ্টঃ" যুক্তির বলে শাক্তগণ যে প্রত্যক্ষে আপনাদিগের উদর তৃপ্তির জন্য, অযথা প্রাণীনাশ করিয়া থাকেন তাহার প্রতিকূলেও আমরা যুক্তি দেখাইতে পারি। আদ্যাশক্তি জগৎজননীর তৃপ্ত্যর্থে, উপাসনার সময় আপনাপন দেহস্থ পশুরূপ ষড়রিপুর বলিপ্রদান করিবার ব্যবস্থাই সম্ভবতঃ শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত উদ্দেশ্য! কিন্তু মাংসাহারে ইচ্ছুক কোন মহানুভব কর্তৃক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে আধুনিক বিকৃত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" যে দেশের অবতারের মুখনিঃসৃত বাণী, সে দেশের নরনারীগণ পরোক্ষে দেবী প্রীত্যর্থে হইলেও, প্রত্যক্ষে আত্মতৃপ্তির জন্য যে অযথা

হিন্দুর মাংসাহার ব্যবস্থা

পশু বধ করিতে ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তবে জগতের ক্রমবিকাশ (evolution) থিয়রী অনুযায়ী বা দেশকাল পাত্রভেদে যে, প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে তাহা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং আধুনিক সময়ে, একেবারে নিরামিষ ভোজনই যে করিতে হইবে অথবা উহাই করা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। দ্রব্য বিশেষের গুণাগুণ জ্ঞাত থাকিয়া এবং স্বাস্থ্য রক্ষণোপযোগী নিয়মাবলী মানিয়া, প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনুষ্য নিজ নিজ আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। কবি বলিয়াছেন "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" সুতরাং সর্ব্ব-বাদী সম্মত রূপে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা হইতে পারে না।

রোগে মাংস পথ্য অব্যবস্থা।

আজকাল রোগীর পথ্যরূপে অনেকেই মাংসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অনেক সময় পথ্যের পরিবর্ত্তে অপথ্যের কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে জানিবে; কারণ মাংসের মধ্যে জন্তুদিগের শরীরজাত বিবিধ দূষিত পদার্থ(Excrementitious matter) অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উহাদিগকে পৃথক করিয়া মাংস-পথ্য প্রস্তুত-করণের কোন উপায় নাই। ইহা ব্যতীত টোমেন (Ptomain নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অনেক সময় মাংসের মধ্যে আপনা হইতে উৎপন্ন হয়। এরূপ মাংস বা মাংসের কাথ রোগীকে খাওয়াইলে পথ্যের পরিবর্ত্তে বিষের কার্য্যই করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই টোমেন বিষাক্ততা হইতে নিয়মিত

ভোজনকারীগণের মধ্যে অধিকাংশকেই, কলেরা বা সেই প্রকারের বিষম পীড়ায় আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপে একস্থানে এই প্রকারে ৩০০ শত ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া, বিশ্বদূত রয়টার (Reuter) সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রস্তুত করা পথ্যে ঐরূপ বিপদের কোন আশঙ্কাই থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে মাংসের ক্কাথ অতি সত্বর বিকৃত (decomposed) হইয়া যায়, সুতরাং উহা অধিক সময় যাবৎ রাখিয়া পথ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু আমাদের দেশস্থ অধিকাংশের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায়, অনেক সময়ে তাঁহারা ঐ বিকৃত ক্কাথই রোগীকে সেবন করাইয়া থাকেন; ইহাতে রোগীর উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসকেরও দুর্ণাম রটিয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি যে বাত, কার্ব্বঙ্কল, যকৃত স্ফোটক, কিডনীর পীড়া, ক্যান্সার, অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্, বহুমূত্র, প্রভৃতি পীড়া অতিরিক্ত মাংসাদি ভোজনে হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সেই জন্য ঐ সমুদয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মাংস পথ্য একেবারেই দেওয়া উচিত নহে। মাংসের যুষ না খাইলে শরীরে যে বলাধান হইতে পারে না একথা যথার্থ নহে। যদি একমাত্র মাংসই শক্তি সঞ্চয়ের উপযোগী হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বতন এবং আধুনিক মল্ল ও কুস্তীগীরগণ মাংস বর্জ্জন করিয়া ছোলা (সিদ্ধ ও ভিজা), মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, বাদাম, পেস্তা

প্রভৃতি মেওয়া ফল খাইত না! ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শীগণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে; বর্তমানে প্রফেসর রামমূর্ত্তি প্রভৃতি বিখ্যাত বলবানেরাও মাংসভোজন করেন না। তবে মাংসই যে শরীরে বলাধানে শ্রেষ্ঠ তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি! অন্যপক্ষে মাংসাহারে কোষ্ঠবদ্ধতার প্রবণতা দেখা যায়—রোগের সময়ে অথবা তাহা হইতে আরোগ্যের মুখে যদি কোষ্ঠপরিষ্কারই না হয় তবে ক্ষুধা হইবে কোথা হইতে? ক্ষুধা বোধ না হইলে আহারই বা করে কি প্রকারে? সুতরাং উহা বলাধানের কারণ না হইয়া, পরোক্ষে বলহানির কারণই হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে মাংস মানবের স্বাভাবিক খাদ্য নহে এবং এখন দেখাইতেছি যে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যুত্তম স্বাস্থ্যপ্রদায়ক খাদ্যও নহে। তবে রোগীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দৃষ্টে, সময়ে সময়ে (বিশেষ আপত্তিজনক স্থল ভিন্ন অন্যান্য স্থলে) সামান্য পরিমাণ মাংসের ঝোলের ব্যবস্থা চলিতে পারে। এইরূপ স্থলে আমরা অনেক সময় মাংসের ঝোলের পরিবর্ত্তে, ছোট ছোট মৎস্যের ঝোলই ব্যবস্থা করিয়া থাকি। (ইহার বিষয় পূর্ব্বে মৎস্য ও মাংসের গুণাগুণ বর্ণনা স্থলে বলিয়া আসিয়াছি)। অজীর্ণ রোগাক্রান্তের পক্ষে মাংস কখনই ব্যবস্থেয় নহে জানিবে।

যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, বিগত কাল অপেক্ষা অধুণা মাংসাহার পরিবর্জ্জন করার অনুকূলেই যুক্তি অধিক দৃষ্ট হয়; কারণ :—

১। রোগের প্রভাব :—জন্তু সকল নানা কারণে বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়; তাহাদের মাংস আহারে আমাদের শরীরেও রোগের বৃদ্ধিপ্রবণতা দেখা যাইতেছে এবং তাহাতেই অকাল মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

২। মাদকতার প্রভাব :—মাংস মাত্রেই অল্লাধিক মাত্রায় উত্তেজক; সুতরাং উহার ব্যবহারে সমাজে মাদকতার পরিবৃদ্ধি লক্ষিত হয়; মাংসাহারে রিপু সমুদয় বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় দেখিতে পাইবে।

৩। অতিরিক্ত আহারের প্রভাব :—মাংসাহারই ইহার প্রধাণ সহায়; সকলেই জানেন যে কতকগুলা নিরামিষ তরীতরকারী খাওয়া অপেক্ষা, আমিষযুক্ত খাদ্যাদিই অধিক মুখরোচক, সুতরাং ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হওয়া সত্বেও, লোকে খাইতে ভাল লাগিতেছে বলিয়া অধিক খাইয়া ফেলে।

৪। পাপ এবং চরিত্রহীনতার প্রভাব :—মাংস আহারই ইহার পরিসর বৃদ্ধিকল্পে প্রধাণ অবলম্বন জানিবে।

৫। হত্যা এবং উত্তেজনার প্রভাব :—পশুহনন এবং তাহার মাংস ভক্ষণ করায়, মানবের অন্তঃকরণ কঠিন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, উহাতে তাহাদের উন্নত (Finer) মনোভাব (Sensibilitis) সকল বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং তাহাতেই পাপানুচরণ ও হত্যানুষ্ঠানাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তনা আনাইয়া দেয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অজীর্ণ রোগীর প্রতি উপদেশ।

অজীর্ণতা অথবা ডিস্পেপ্‌সিয়া অধুনা সহর বাসীগণের (মফঃস্বলেও) মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, এ বিষয়টির উপর যাহাতে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহা চিকিৎসকমাত্রেরই করা আবশ্যক। ঔষধ অপেক্ষা পথ্য ও আনুষঙ্গিক কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম পালনই ইহার প্রধান প্রতিকারের উপায় বলিয়া আমরা পরীক্ষায় জানিতে পারিয়াছি।

নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টি পালন করিলে, (অবশ্য যথাযথ-ভাবে) অজীর্ণরোগী মাত্রেই অচিরে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন :—

১। **ধীরে ধীরে খাইবে** ;—আহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে চর্ব্বিত হয় সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবে, এমন কি সুস্থাবস্থায় যেরূ প্রয়োজন তদপেক্ষাও (সম্ভব হইলে) অধিক চর্ব্বণ করিবে। যে জিনিষে চর্ব্বণ তেমন প্রয়োজন হয় না, তাহা সাধ্যমত পরিত্যাগ করিবে বা অধিক খাইবে না। খাদ্যপদার্থ মুখগহ্বরে যত অধিক সময় থাকিবে, পাকস্থলীতে যাইয়া হজম হইতে উহার ততই অল্প সময় লাগিবে।

২। **আহারের সময় জল খাইবে না** ;—খাদ্য

পদার্থ যদি বিশেষ কঠিন প্রকারের হয়, তাহা হইলে ভোজন শেষ করিয়া ২।১ ঢোক খাইতে পার, অথবা আহারের অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পরে, পূর্ণ এক গ্লাস জল খাইতে পার।

৩। সাধারণতঃ অজীর্ণরোগীর পাকস্থলীতে, অধিক তরল পদার্থ মিশ্রিত খাদ্য অপেক্ষা কঠিন খাদ্যপদার্থ সহজে হজম হইয়া যায়।

৪। আহার্য্য পদার্থ যেন অত্যধিক গরম বা অত্যধিক শীতল না হয়;—শরীরের সম উত্তাপবিশিষ্ট খাদ্যপদার্থই খাওয়া কর্ত্তব্য। আহারের পরই শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইবে না (আমাদের দেশে শীতকালে)।

৫। প্রয়োজনাধিক আহার করিবে না;—পরিপাকশক্তি স্বল্প হইলে সময়ে সময়ে প্রয়োজনাপেক্ষা কম খাইবে। অধিক আহার করিলেই যে, বলবান্ হইতে পারিবে তাহা মনে করিও না, যে টুকু পরিপাক হইবে তাহাতেই বলাধান হয় জানিবে!

৬। দিবা রাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক আহার করিবে না এবং রাত্রির আহার অপেক্ষাকৃত কম করিবে। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে এই দুইবার আহারই যথেষ্ট।

৭। নির্দ্দিষ্ট দুইবার আহারের মধ্যে সামান্য পরিমাণেও কোন জিনিষ খাইবে না।

৮। আহারের ঠিক পূর্ব্বে বা পরে কোন প্রকার তীব্র মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করিবে না। আহারের পরই নিদ্রা যাওয়াও কর্ত্তব্য নহে, অন্ততঃ এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা গল্পগুজব বা চিত্তাকর্ষক গল্পের পুস্তকাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কখনও আহার করিবে না।

১০। কোন প্রকার মানসিক বিকার অবস্থায় (যেমন রাগ, দ্বেষ, কলহ, হিংসা বা গভীর চিন্তা) আহার করা উচিত নহে।

১১। যাহা সহজে পরিপাক হয় কেবলমাত্র তাহাই আহার করিবে; নানা দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত করা, যে দ্রব্য সহজ পরিপাচ্য নহে তাহা স্পর্শ করিবে না। এক সঙ্গে ৩।৪ প্রকারের জিনিষ ব্যতীত, নানা প্রকারের জিনিষও আহার করিবে না। লেবু প্রত্যহ খাইবে।

১২। কোন দ্রব্য আহার করা উচিত কিনা তাহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিবে; আহার করিতে বসিয়া এ বিষয়ের চিন্তা করিও না; আহারের সময় সর্ব্বদা যদি তোমার মনে থাকে যে, হয়ত ইহাতে আমার অসুখ করিতে পারে, তাহা হইলে জানিবে যে, উহা আহারে নিশ্চয়ই তোমার অসুখ করিবে। আহারের সময় ভবিষ্যৎ কাজের কথা মনে করিও না; প্রফুল্ল চিত্তে যাহাতে আহার করিতে পার তাহাই করিবে।

১৩। যে দ্রব্য আহার বিষয়ে মনে সন্দেহ হইবে তাহা আহারের পূর্ব্বেই পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

১৪। চিকিৎসক অপেক্ষা পথ্যই রোগ আরোগ্য করণে বিশেষ উপযোগী; পথ্য, বিশ্রাম এবং প্রফুল্লতাই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক জানিবে

১৫। আহারের সময় সাধ্যমত একটি নির্দ্দিষ্ট রাখিবে, কদাচ তাহার ব্যতিক্রম করিও না। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ব্যবস্থিত খাদ্য ভোজন করিবে, তাহা হইলে আর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে না।

১৬। যুক্তি এবং বিবেচনার শাসনে ক্ষুধাকে রাখিবে; যখনই ক্ষুধা পাইল তখনই খাইলাম" এরূপ করিলে অজীর্ণ রোগীর চলিবে না। ক্ষুধানিবৃত্তি করাই মনুষ্যের চরম উদ্দেশ্য নহে।

১৭। কোন্ আহার সহ্য হইবে, কোন্ আহার সহ্য হইবে না, ইহা কেহ কোন অজীর্ণরোগীকে বিশেষ ভাবে স্থির করিয়া দিতে পারে না; ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন রোগীতে বিভিন্ন জিনিষ সহ্য হয় না। একজনের যাহা সহ্য হয়, অন্যের হয়তঃ তাহা হয় না, সুতরাং আহার্য্য বিচার করার ভার নিজের উপর রাখিতে হইবে (অবশ্য দ্রব্যাদির গুণাগুণ অবগত থাকিয়া)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— এ বিষয়ে আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। অনেক অজীর্ণ রোগী, আহার করিয়া পাছে পরিণামে কষ্টভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে একরূপ সমুদয় খাদ্যপদার্থ পরিবর্জ্জন করিয়া, দুধবার্লি বা জলবার্লি খাইয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতেও রোগের হাত হইতে নিস্তার পান না!! অথচ সমুদয় খাদ্যাহার পরিত্যাগ করার ফলে এই হয় যে, রোগী আর কোন দ্রব্যই ভোজন করিতে পারেন না; আহার করিলেই অসুখ ভোগ করিতে (অজীর্ণরোগীর) হয়। ইহা দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, কোন প্রকার খাদ্যপদার্থই পরিত্যাগ করা

উচিত নহে; সকল জিনিষই খাইবে, তবে পরিমাণে অল্প করিয়া এবং উপযুক্ত সময়ে। ইহা করিতে পারিলেই দেখিবে যে, শরীরবিধানে (System) সমুদয় জিনিষই সহিয়া যাইবে এবং অজীর্ণতার জন্যও বিশেষ ভাবিতে হইবে না। যে জিনিষ ব্যবহারে সহ্য হইতেছে না দেখিবে, তখনকার মত তাহা বাদ দিয়া, আবার ৪।৫ দিন পরে উহা ব্যবহার করিয়া দেখিবে। এই প্রকার ২।১ বার করিলেই উহা সহ্য পাইয়া যাইবে। আমরা কয়েকটি অজীর্ণরোগে শয্যাশায়ী অবস্থা সম্পন্ন এবং বার্লি ব্যতিরেকে সমুদয় আহার্য্য পদার্থ বর্জ্জনকারী রোগীকে, এই ব্যবস্থায় রাখিয়া প্রায় সকল দ্রব্যই আহারে পুনরভ্যাস করাইতে পারিয়াছি।

১৮। আহারে বসিয়া যাহাতে সুস্থচিত্তে এবং প্রফুল্লমনে ভোজন করিতে পার তাহা করিবে; বিশেষ কারণ সত্ত্বেও দস্তুরমত রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না।

১৯। অত্যাচার এবং অনিয়ম হইতে সদা সাধ্যমত আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; মনে করিও না যে এক দিনের অনিয়মে কোন ক্ষতি হইবে না; শরীর সুস্থ থাকিলে অবশ্য উহা সামলাইয়া যাইতে পার, কিন্তু ভগ্নশরীরে উহা ক্ষতি করিবেই! যে দিন অনিয়ম বা অত্যাচার করিবে সেই দিনই যে অসুখ করে তাহা নহে; ২।৪ দিন পরেও উহার প্রতিফল ভোগের আশঙ্কা থাকে জানিবে।

২০। উপরে যে যে নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে লেখা হইল, উহার কারণ এবং যুক্তি অনুসন্ধান করিতে হইলে পুস্তক খানি একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। যথাস্থানে উক্ত সমুদয় বিষয়েরেই বিস্তৃত ব্যবস্থা এবং যুক্তি দর্শান হইয়াছে দেখিতে পাইবে।

সমাপ্ত।